মাদক দ্রব্য

সাধারণ বিজ্ঞান

মাদক দ্রব্য

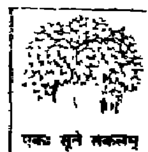
অনিল অগ্রবাল

ছবি

পবিত্র ঘোষ

অনুবাদ

প্রসূন চৌধুরী



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-3666-5

2001 (শক 1923)

Narcotic Drugs *(Bangla)*

মূল্য : 55.00 টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

যাঁরা আমাকে যুক্তিসম্মত ভাবে ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সবকিছু
বিচার ও চিন্তাভাবনা করতে শিখিয়েছেন—
আমার মাতৃদেবী কমলা, স্বর্গীয় পিতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র,
আমার শিক্ষক অধ্যাপক অ্যান্টনি বুস্যাৎল
ও আমার বন্ধুবব অধ্যাপক এস. কে. খান্না তাদেরকেই এই বইটি
উৎসর্গ করলাম।

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা

এই বইটি রচনা করতে যিনি আমাকে সর্বান্তকরণে উৎসাহ জুগিয়েছেন—লন্ডনের হীথ্‌রো বিমানবন্দরের কাস্টম্‌স্ দফতরের সার্ভেয়ার—শ্রী পি. কে. চক্রবর্তীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বইটিতে উল্লিখিত অত্যন্ত মূল্যবান কিছু তথ্যের তিনিই যোগানদার। লন্ডনে থাকাকালীন তাঁকে খুব কাছাকাছি পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মাদকদ্রব্য-নিয়ন্ত্রণে তাঁর অশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আমার অনেক কাজে লেগেছে।

'সায়েন্স রিপোর্টারে'র মুখ্য সম্পাদক শ্রী জি. পি. ফাঁড়কে-কেও জানাই আমার অশেষ ধন্যবাদ। তিনিও আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছেন। রচনার প্রাথমিক স্তরে, বহু বন্ধু ও বিদ্ধ-জনের সঙ্গে উদ্দীপক আলোচনার ফলও এ বইতে ছায়া ফেলেছে। এই সকল বন্ধুদের অন্যতম হলেন 'অল ইন্ডিয়া ইন্স্‌টিট্যুট অভ মেডিক্যাল সায়েন্স'-এর সহ অধ্যাপক ডঃ আর কে শর্মা, এবং গুরগাঁও জেনারেল হসপিটালের সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার ডঃ এস কে শর্মা। অন্যদিকে, প্রকাশনা জগতের সঙ্গে যুক্ত বন্ধুগণ বই লেখার সূক্ষ্ম দিকগুলি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। যখনই কোন অসুবিধে বোধ করেছি—তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অ্যাপ্লায়েড মিডিয়ার শ্রী সুধীর বনশল্, বার্টারওয়ার্থের শ্রী রবীন্দ্র সাক্সেনা, শ্রী রাজেন্দ্র সিনহা, শ্রীমতি মোহিনী ভার্মা, এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর শ্রী পল্লব বাগ্‌লা ও সায়েন্স রিপোর্টারের কোলেগালা শর্মা, বিজ্ঞান প্রগতির শ্রীমতি দীক্ষা বিস্ত্। বিদেশবাসী অনেক বন্ধু ও আত্মীয় পরিজনের সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হইনি। বিশেষ করে এডিনবার্গে আমার বোন রেওয়া বাসুদেব ও ভগ্নী কবিতা, বোম্বে বসবাসকারী আমার ভাই সুনীল ও ফ্লোরিডার ভিকি—আমার স্ত্রীর ভাই। পার্থ্ থেকে টনি, রিতু, অনিতা ও সঞ্জীব গুপ্তা অনেক চমকপ্রদ ও প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠিয়েছেন। দয়াল সিং কলেজের অধ্যাপক এস পি গুপ্তা হলেন আমার অন্যতম প্রেরণাদাতা অন্যান্য বন্ধু যেমন 'ওপাল অ্যাডভার্টাইজিং এন্ড মার্কেটিং-এর শ্রী অখিল জৈন, দয়াল সিং কলেজের শ্রী হন্‌স্‌রাজ শর্মা এবং দেশবন্ধু কলেজের ডঃ পি কে মুখার্জী—এদের অবদানও কম নয়।

এন. বি. টি-র সম্পাদিকা শ্রীমতি মঞ্জু গুপ্তাকে আমার সবিশেষ ধন্যবাদ।

বইটির সুদীর্ঘ রচনাকাল তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় নি। বইটি সম্পূর্ণ করতে আমার এত সময় লেগেছে যে অন্য কেউ হলে হয়ত আমায় শেষই করে ফেলতেন। যাই হোক, শ্রীমতি গুপ্তার সঙ্গে কাজ করার মজাই আলাদা।

কম্প্যুটারের নানা সমস্যা সমাধানে বেশকিছু কম্প্যুটার-বিশেষজ্ঞের সাহায্যে ভোলার নয়। বিশেষ করে ভৃগু সেলি, অরবিন্দ লাম্বা, বানীত পরিশ্চা এবং রাজা শাহী—এদের সাহায্য ছাড়া কম্প্যুটার ব্যবহার অসম্ভব ছিল।

ইউনাইটের নিউজপেপার নেটওয়ার্কের শ্রী ওয়াই. এস গিল এবং প্রদীপ ভট্টাচার্য পপি ক্যাপসুলের রঙিন স্বচ্ছ ছবি পাঠিয়েছেন—তাঁদের ধন্যবাদ। 'ডাকটিকিটে মাদকদ্রব্য'—ছবিটি পাঠিয়েছেন জি বি পন্থ হসপিটালের রেডিওলজির সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সতবীর সিং। শ্রীমতি সরবেশ গাঁজা-গাছের রঙিন ছবি পাঠিয়েছেন। ধন্যবাদ তাঁদেরও।

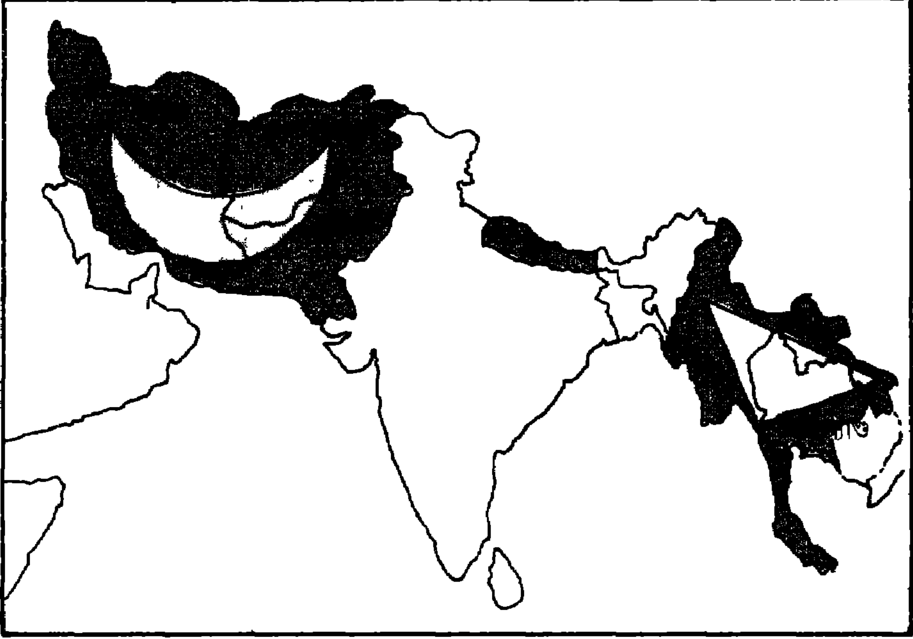
সবশেষে, আমার সহধর্মিনী অপর্ণা ও দশবছরের পুত্র তরুণের কথা উল্লেখ না করে পারছি না—বইটি রচনাকালীন তাদের যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। দুজনের কাছেই আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

অনিল অগ্রবাল

মুখবন্ধ

মাদকদ্রব্য বা 'নারকোটিক ড্রাগ্‌স' এযুগের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয়। কাস্টমস দপ্তরের অধিকর্তাদের হাতে মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হওয়ার খবর সংবাদপত্রে মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হয়। মাদকাসক্ত তরুণ-তরুণীর সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। একদিকে নেশাগ্রস্ত যুবসম্প্রদায় আর অন্যদিকে ড্রাগ চোরাচালানকারী চক্র—আধুনিক সমাজ আজ এক দ্বিমুখী যাঁতাকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের অবস্থান, সমগ্র পৃথিবীর নিষিদ্ধ ড্রাগ উৎপাদনকারী প্রধান উৎসগুলির, ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। সোনালী ত্রিভুজ (পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ—বর্মা, থাইল্যান্ড ও লাওস) ও সোনালী বাঁকা চাঁদের (নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের দেশ সমূহ—পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান) মাঝে চিড়েচ্যাপ্টা—আমাদের দেশের এই সুবিধা-জনক অবস্থান—সমস্যাটিকে জটিলতার করে তুলেছে। এই দুটি অঞ্চল মাদকদ্রব্যের চোরাকারবারীদের পীঠস্থান। তাই ভারত আজ চোরাচালানের গমনপথটিতে একটি প্রধান ঘাঁটি হিসেবে গণ্য হয়। (চিত্র - 1)

অধিকাংশ যুবক নিছক কৌতূহলের বশে মাদক দ্রব্য সেবন করতে শুরু করে। এরা ড্রাগের কু-প্রভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে না। ইংরাজিতে একটা প্রবচন আছে, অতিরিক্ত কৌতূহলে বেড়াল মারা পড়ে (Curiousity kills the cat)। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা খানিকটা তাই হয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটা প্রচলিত গল্পের কথাও মনে পড়ছে। এ গল্পে একটি মাছের কথা বলা হয়েছে, যেটি প্রায় প্রতিটি টোপেই কামড় বসাত আর শেষে একদিন এক মোক্ষম বঁড়শির ফলায় আটকা পড়ল। ড্রাগের খপ্পরে পড়া যুবকদের দশাও ঠিক এমনটাই হয়। কৌতূহল নিবারণ করার কি আর কোন গঠনমূলক উপায় নেই? মাদকদ্রব্যগুলি আদতে কি জিনিস? এগুলি আমাদের শরীরে কি ধরনের প্রভাব ফেলে? এগুলি সেবন করলে আমরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি? এগুলিতে কি এমন আছে যা মানুষকে যাঁতা কলে ফেলে? এদের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়? এই বইটিতে এই ধরনের নানা প্রশ্নের সমাধান তুলে ধরতে চেয়েছি। প্রত্যেকটি মাদক দ্রব্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে নানা বিচিত্র ইতিহাস। অদ্ভুত সব উপকথা, লোকাচার ও পৌরাণিক কাহিনী মাদকদ্রব্যগুলিকে রহস্যময় ধূম্রজালে আবৃত করে রেখেছে। কুয়াশাচ্ছন্ন এই জালটিকে ছিঁড়ে ফেলে সত্যের উন্মোচন করাই এই বইটির মূল উদ্দেশ্য। এই



চিত্র ।   সোনালী ত্রিভুজ, সোনালী বাঁকাচাঁদ আর নেপালের মাঝে ভারতবর্ষের চিঁড়েচ্যাপটা অবস্থান, যা ভারতকে ড্রাগ চালানের চোরাপথের প্রধান গন্তব্যস্থলে রূপান্তরিত করেছে।

সত্যান্বেষণে আমরা বহু বিচিত্র ও দুর্গম দেশে যাত্রা করব। এই দেশগুলিতেই মাদক দ্রব্য সেবনের অভ্যাস সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল। আকর্ষণীয়ভাবে, দুঃসাহসিক প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি যাতে ড্রাগ সম্পর্কে জানতে উৎসুক তরুণ পাঠকেরা বইটি পড়তে আগ্রহী হয়। এই সুযোগে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকেও পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করেছি।

যদি এই বইটি মাদক দ্রব্যের কু-প্রভাবগুলির সঠিক চিত্রটি যুবমানসে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়, আমার প্রয়াস সার্থক হবে। পাঠকদের গঠনমূলক সমালোচনার অপেক্ষায় রইলাম। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে আপনাদের মূল্যবান মতামত গুরুত্ব সহকারে সংযোজিত হবে।

অনিল অগ্রবাল

এক

গোড়ার কথা

'ড্রাগ' বা 'মাদকদ্রব্য' শব্দগুলো নানা মানুষের মনে নানা তাৎপর্য বহন করে। অনেকের কাছে যন্ত্রণা উপশমের বড়িগুলো ড্রাগ মনে হয় কিন্তু চোখে দেওয়ার ফোঁটাগুলো ড্রাগের গোত্রে পড়ে না। ঘা-ঘেউরি সারানোর জীবাণু প্রতিরোধক (অ্যান্টিবায়োটিক) মলমগুলোকে অনেকে ড্রাগ বলেন—আবার জীবাণু প্রতিরোধক ক্যাপসুলগুলোকে ড্রাগের দলে ফেলেন না। কেউ কেউ আবার সব ওষুধকেই ড্রাগ মনে করেন। তাহলে ড্রাগ বস্তুটি আসলে কি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) সংজ্ঞা অনুযায়ী, সেই বস্তুগুলোকেই ড্রাগ বলা যাবে—যেগুলো জীবদেহে প্রবেশ করলে জীবটির নানা ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তন ঘটে। তাহলে এই সংজ্ঞা অনুসরণ করলে অধিকাংশ বিশেষ করে উল্লিখিত বস্তুগুলো, ড্রাগ গণ্য হবে।

অর্থ

ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত 'নারকোটিক ড্রাগ' কথাটির অর্থ কি? চিকিৎসার সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষজনদের কাছে নারকোটিক ড্রাগ্‌স-এর অর্থ সেইসব ওষুধ যা শরীরকে অবশ করে আর নিদ্রার উদ্রেক করে। শব্দটির বুৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'নারকোটিকস' থেকে যার অর্থ 'অবশ করা'। এই শব্দটির উৎস আবার গ্রীক ভাষারই 'নারকে' শব্দটি। 'নারকে' কথাটির অর্থ 'অবশতা', 'অসাড়তা' বা 'জড়ত্ব',। একজন দুঁদে আইনপ্রণয়নকারী কর্তাব্যক্তির কাছে কিন্তু 'নারকোটিক ড্রাগস' কথাটি অন্যান্য সাধারণ ড্রাগের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে। ব্যাপারটা আরেকটু স্পষ্ট করে বোঝানো যাক।

ড্রাগ মানেই কিন্তু ওষুধ নয়। ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করা হয় না এমন ড্রাগগুলিকে চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যবহির্ভূত কাজে লাগালে তাদের আবার ড্রাগ বলা হবে। যেমন ধরুন মদ, গাঁজা, তামাক ও কোকেন। ওষুধ নয় এমন অধিকাংশ ড্রাগগুলি সেবন করলে মানসিক পরিবর্তন আসে। এই ড্রাগগুলি মস্তিষ্ক কোষে পৌঁছে অন্তর্বর্তী রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে উল্টে পাল্টে দেয়। তাই এগুলো মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কথা বলা ও নড়াচড়া করার ক্ষমতার ওলট পালট করে দেয়।

মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম ড্রাগগুলি মস্তিষ্ককে প্রধানত তিনভাবে প্রভাবিত করতে পারে : এরা কার্যক্ষমতাকে দ্রুততর করতে পারে (উত্তেজক বা উত্তোলক), কার্যক্ষমতার গতি হ্রাস করাতে পারে (উপশমকারক বা দমনকারী) অথবা মস্তিষ্কের কলকব্জাকে সম্পূর্ণভাবে বিকল করে দেয় (এরা মতিভ্রম ঘটায়-এদের হ্যালুসিনোজেন বলে)। হ্যালুসিনোজেন এমন একটি ভেষজ যা মানুষের মনে ভ্রম উৎপন্ন করে। তার চক্ষু-কর্ণ-স্পর্শের অনুভূতি অলীক বস্তুর উপস্থিতিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকে। যেমন এল এস ডি (LSD) সেবন করলে আরশোলা হাতির মত অতিকায় মনে হতে পারে। দীর্ঘ সময় কোকেনের নেশায় আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মনে হয় যেন সারা শরীরে পোকামাকড় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

যে সব ড্রাগগুলো মানসিক পরিবর্তন আনতে পারে, সেগুলি সেবন করলে সহজেই নেশা হয়। এরা দেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলো এমনভাবে পাল্টে দেয় যে দেহ আকুল হয়ে এদের 'আশায় বসে থাকে'। তখন এই দ্রব্যগুলো শরীরে না পড়লে নির্জীব ও ইচ্ছাশক্তি রহিত মনে হয়, শরীর আনচান করতে থাকে। যে মুহূর্তে দেহ ড্রাগটির সংস্পর্শে আসে সব প্রাণশক্তি ফিরে আসে কিন্তু কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে আবার সেই নির্জীবতা ফিরে আসে। অর্থাৎ ড্রাগটির প্রতি আসক্তি চলে আসে। নেশাগ্রস্ত বা ড্রাগের প্রতি আসক্ত সেই ব্যক্তিকে বলব যার দৈনিক ড্রাগের চাহিদা থাকে। সে যেন তেন প্রকারেণ প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ড্রাগ যোগাড় করবেই প্রয়োজন হলে চুরি, এমন কি খুন জখম করতেও পিছপা হবে না। অচিরে এই নেশায় আসক্ত ব্যক্তি তার নিজের চরম শত্রু আর সমাজের জঘন্য কলঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

যে সব ড্রাগ সেবন করলে আসক্তি আসে, সেগুলির আবার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। একবার ড্রাগ নেওয়া শুরু করলে ধাপে ধাপে মাত্রা না বাড়ালে প্রথম মাত্রার 'আমেজ' আসবে না। অর্থাৎ প্রথম মাত্রার অনুভূতি আনতে হলে ক্রমাগত একটু একটু করে পরিমাণ বাড়াতে হবে। একেই বলে 'সহ্যশক্তির সীমা'। এই কারণেই নেশাসক্ত মানুষের 'চাহিদা' ক্রমশ বেড়েই চলে আর সে নানা অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়তে থাকে। কখনো কখনো একটি বিশেষ

ড্রাগের 'সহ্যশক্তির সীমা' অন্য আরেকটি পৃথক ড্রাগের প্রতি সহ্যশক্তি গড়ে দেয়। আসক্ত ব্যক্তি তাই এই নতুন ড্রাগটি নেওয়ার সময় ও কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় না। একে বলে 'বিপরীত সহ্যসীমা'। উদাহরণ স্বরূপ—মরফিনের প্রতি আসক্ত হয়ে গেলে পেথিডিন গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা হয় না।

অবশ্য নেশাগ্রস্ত হওয়ার জন্য কেউ ড্রাগ নেয় না। তাহলে আসক্তিটা আসে কেমন করে? আসলে এর জন্য দায়ী থাকে ড্রাগ ব্যবহারকারীদের একটি ভ্রান্ত ধারণা। ভ্রমের বশে সে ভাবতে থাকে যে সে কখনই আসক্ত হবে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে আসক্তি এসে পড়ার আগেই সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে আর ড্রাগ নেওয়া বন্ধ করে দেবে। কিন্তু বাস্তবে এই ঘটনা ঘটে না কারণ ড্রাগ শরীরে প্রবেশ করার পর একটি বিচিত্র ক্রমবৃদ্ধিমান আবর্ত সৃষ্টি করে। মানসিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম ড্রাগ, মস্তিকে পৌঁছনোমাত্র মনে এক অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি এনে দেয়। কিন্তু ড্রাগটির প্রভাব ক্ষীণতর হওয়ার সাথে সাথে একটি 'প্রতিক্রিয়া' আরম্ভ হয়। যেমন অ্যাম্ফিটামাইনের মত উদ্দীপক গ্রহণ করলে প্রথমে খুব উত্তেজনা আসে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এর প্রভাব হ্রাস পায়—প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায় আর ক্লান্তি এসে ভর করে। তার পরেই আসে এক অদ্ভুত অস্বস্তি আর হতাশা। এই বিরক্তিকর 'প্রতিক্রিয়া' কাটাতে আবার বাধ্য হয়ে ড্রাগ নিতে হয়। এই ভাবেই একটি ক্রমবৃদ্ধিমান আবর্তের সৃষ্টি হয় আর মানুষ কখনই এই ঘূর্ণির মাঝ থেকে মুক্ত হতে পারে না। মানসিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম ড্রাগগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মস্তিষ্কের যাবতীয় রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তছনছ করে দেয় আর এর ফলে ক্রমাগত ড্রাগব্যবহারকারীর মস্তিষ্কের চাহিদা বেড়ে যায়। ব্যাকটেরিয়া নামক নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদদের জীবন-প্রণালী থেকে একটা সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যাক। বেশির ভাগ ব্যাকটেরিয়া, স্ট্রেপ্টোমাইসিন নামের একটি ভেষজের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল হয়। ব্যাকটেরিয়া সাধারণত একটি জায়গায় সংঘবদ্ধভাবে উপনিবেশ সৃষ্টি করে বসবাস করে। এই ধরনের কোন উপনিবেশে একফোঁটা স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেওয়া মাত্র ব্যাকটেরিয়াদের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণ স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সংস্পর্শে ব্যাকটেরিয়াগুলিকে প্রতিপালন করলে কয়েকটি নতুন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার উদয় হয়, যারা বৃদ্ধির জন্য স্ট্রেপ্টোমাইসিনের উপর 'নির্ভর' করতে থাকে! অর্থাৎ এরা স্ট্রেপ্টোমাইসিন-নির্ভর হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে যায় যে এই জীবানুপ্রতিরোধী ভেষজটি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন একটি জীবাণুপ্রতিরোধী বা অ্যান্টিবায়োটিক যা মূলত ব্যাকটেরিয়াদের ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হয়) না হলে এরা মারা পড়ে!

একজন ড্রাগ-আসক্ত ব্যক্তিকে তার চাহিদার মাদক-দ্রব্যটি না দিলে, সে তৎক্ষণাৎ মরে না বটে কিন্তু তার অবস্থা মৃত্যুর চেয়ে খুব একটা উন্নততর হয় না।

তার শরীরে কয়েকটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখা যায়, যাকে সাধারণভাবে 'উইথড্রয়াল সিম্পটম' বা 'প্রত্যাহরণের লক্ষণ' বলে। এই লক্ষণ দেখা দিলে হতাশা, বমি-বমি ভাব, জ্বর, কাঁপুনি ও দেহে নিয়ন্ত্রণের অতীত প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তিরা নেশার জন্মদায়ক তাবৎ বস্তুকে ড্রাগ মনে করেন; যার অন্তর্গত উদ্দীপক, অবদমক (ডিপ্রেসান্ট) ও হ্যালুসিনোজেন। চিকিৎসাক্ষেত্রের সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষদের কাছে সেই ড্রাগগুলিকেই নারকোটিক বা মাদক, যেগুলি নিদ্রার উদ্রেক করতে পারে। অবশ্য আইনপ্রণয়নকারীদের সংজ্ঞাটি এতটাই বহুলপ্রচলিত যে মাঝে মাঝে চিকিৎসকরাও, চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রচলিত সংজ্ঞাটি মাঝে মাঝে ভুলে যান। এরাও যাবতীয় মানসিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম ড্রাগগুলিকে নারকোটিকের শ্রেণীতে ফেলে দেন। তাই অনেক ডাক্তার 'সাইকোঅ্যাক্‌টিভ' বা 'মানসিকভাবে সক্ষম' উপাধি ব্যবহার করে যাবতীয় সংশয় দূর করেন। এই নামটি এককথায় সব ড্রাগের অর্থ বহন করে।

সব মানুষই অল্পবিস্তার ড্রাগের উপর নির্ভর করে। সমাজে এই নির্ভরতাকে সাধারণত অভ্যাস বলে এবং সবাই এই ধরনের অভ্যাসগুলিকে একরকম মেনে নেয়। যেমন প্রতিদিন বিকেলের দিকে এককাপ চা না পেলে অনেকেরই মনটা আনচান করতে থাকে। তবে কি বলব যে আমরা চায়ের অন্যতম উপাদান ক্যাফিনের (এটি উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এবং কফিতে অনেক বেশি পরিমাণে থাকে) প্রতি আসক্তি হয়ে পড়েছি? না, এটি একটি রোজকার সাধারণ অভ্যাসের অঙ্গমাত্র।

আসক্তি ও অভ্যাস

এই দুটি শব্দের মধ্যে খুব স্পষ্ট পার্থক্য আছে। আসক্তি হলে মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি ড্রাগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে আর ড্রাগ-নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। অভ্যাসের ব্যাপারটা এত মারত্মক হয় না। এক্ষেত্রে ড্রাগের প্রতি শুধু আকর্ষণ আসে—কোন বাধ্য-বাধকতা থাকে না। অর্থাৎ নির্ভরশীলতা নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকে। আরেকটা প্রধান পার্থক্য হল, আসক্তি এসে গেলে নেশার দ্রব্যটির মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলতে হয়, কিন্তু অভ্যাস হলে সেরকম কিছু হয় না। ধরুন আপনি বছর দশেক আগে প্রতিদিন বিকেলে এককাপ চা খাওয়া ধরেছিলেন—আজও কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময়ে সেই একই পরিমাণের চা আপনি খাচ্ছেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে কোন 'প্রত্যাহরণ লক্ষণ' থাকে না, চা ছেড়ে দিলে আপনার খুব একটা কষ্ট হবে না। যেমন ধরুন একদিন আপনি এই চা পেলেন না—আপনার কি বমি বা Convulsion আসবে? তার চেয়েও বড় কথা 'দৈনিক অভ্যাসে'র কোটা পূরণ করার জন্য (এক্ষেত্রে এক কাপ চা) কখনই খুন জখমের মত অপরাধে নামবেন

না! কিন্তু একজন নেশায় আসক্ত ব্যক্তি তার চাহিদা পূরণ করতে কোন অপরাধেই পিছপা হয় না। স্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারেরা এই শব্দ দুটিকে ব্যাপক অর্থে 'ড্রাগ-নির্ভরতা' বলে থাকেন। অনেকে আবার একে 'ড্রাগের অপব্যবহার' বলেন কারণ এক্ষেত্রে ড্রাগগুলিকে চিকিৎসা বহির্ভূত কাজেও ব্যবহার করা হয়।

ড্রাগ আসক্তির বিভিন্ন ধাপ

সাধারণত একজন ড্রাগ-আসক্ত ব্যক্তির নেশার চারটি ধাপ থাকে। প্রথম' ধাপটি নিছক কৌতূহলের বশে, স্রেফ নতুন ধরনের অনাস্বাদিত আনন্দ গ্রহণ করার ধাপ। এই ধাপটিতে ব্যক্তির মনে হয়, সে তার নেশা ইচ্ছামত 'দক্ষ হাতে' নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সাধারণত তরুণদের বা কিশোরের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে-তারা ভাবে যেন কোন অজানা অভিযানে বেরিয়েছে।

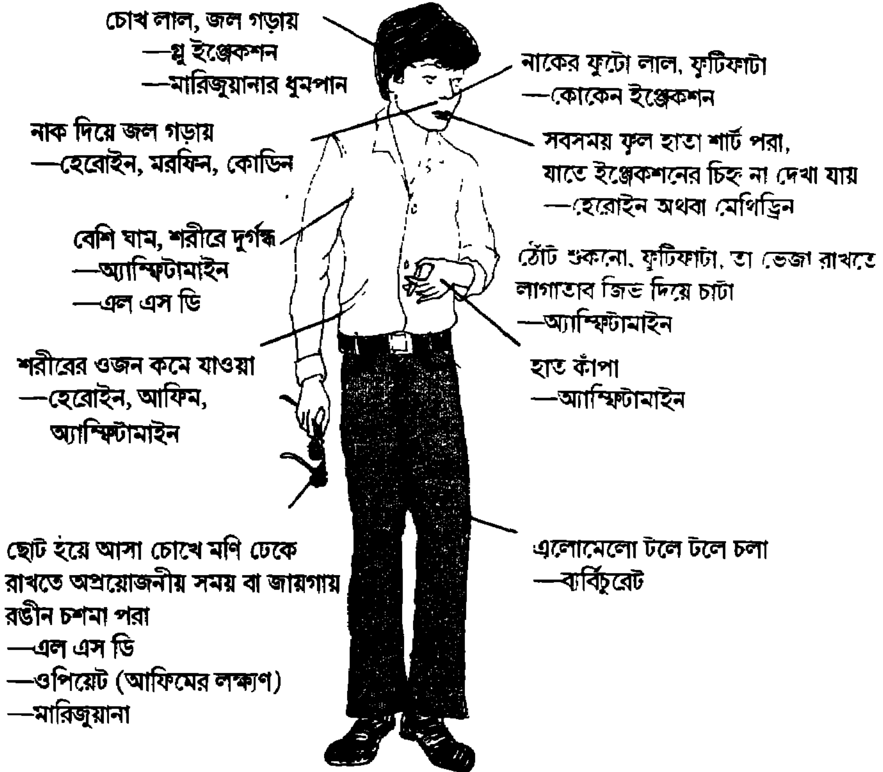
দ্বিতীয় ধাপটিতেও খুব একটা ভেবে-চিন্তে কেউ ড্রাগ নেয় না। দেখা গেছে এর পিছনে কাজ করে অদ্ভুত একটি কারণ। ড্রাগ গ্রহণের নবলব্ধ অভ্যাসটি বহু সমাজ-বিচ্ছিন্ন একাকিত্বে ভোগা মানুষজনের সামনে মেলামেশার একটি নতুন জগৎ খুলে দেয়। অনেকেই পার্টিতে মদ খায় কারণ নেশার চোটে তারা প্রগলভ হয়ে ওঠে আর খুব সহজেই সবার সাথে মিশতে পারে। সম-মানসিকতা সম্পন্ন মানুষজনের কাছ থেকে চাপ এলেও এই ঘটনা ঘটতে পারে। মানসিকতার মিল, পেশাগত বা বয়সগত হতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে চাপ এড়িয়ে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। গঠনমূলক কাজ কর্মের ব্যাপারে চাপ আসলে ফল খুব ইতিবাচক হয়। ওদিকে অনেক সময় এমন চাপও আসে যা মানুষকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়। চাপ দু'ধরনের হতে পারে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। পরোক্ষ চাপ মানুষকে অন্যের নকল করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে কখনই কেউ সরাসরি কোন কাজ করতে বলে না। প্রত্যক্ষ চাপ সরাসরি কোন কাজ করতে বাধ্য করে বা প্ররোচিত করে। ঠাট্টা, বিদ্রূপ, গালিগালাজ, বিরক্ত করে, হুমকি দিয়ে বা এমনকি একঘরে করে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হয়। ব্যক্তি তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয়ে এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করে।

পরোক্ষ চাপ আসে সাধারণত পার্টি বা অন্যান্য সামাজিক মিলনক্ষেত্রে। এখানে বন্ধু-বান্ধবেরা সরাসরি চাপ সৃষ্টি করে না কিন্তু আর পাঁচটি অতি পরিচিত মানুষকে নেশা করতে দেখে মানুষটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ড্রাগ নিতে থাকে যাতে সেও সহজেই দলে ভিড়ে যেতে পারে। প্রত্যক্ষ চাপ কিন্তু নানা কারণে আসতে পারে। নেশাগ্রস্ত বহু ব্যক্তি নিজেদের একাকিত্ব বা অন্যান্য দোষ ঢাকার জন্য অথবা বন্ধুমহলে ড্রাগ বেচে দু পয়সা কামাবার উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টি করে। এসব পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাসের সাথে না বলাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

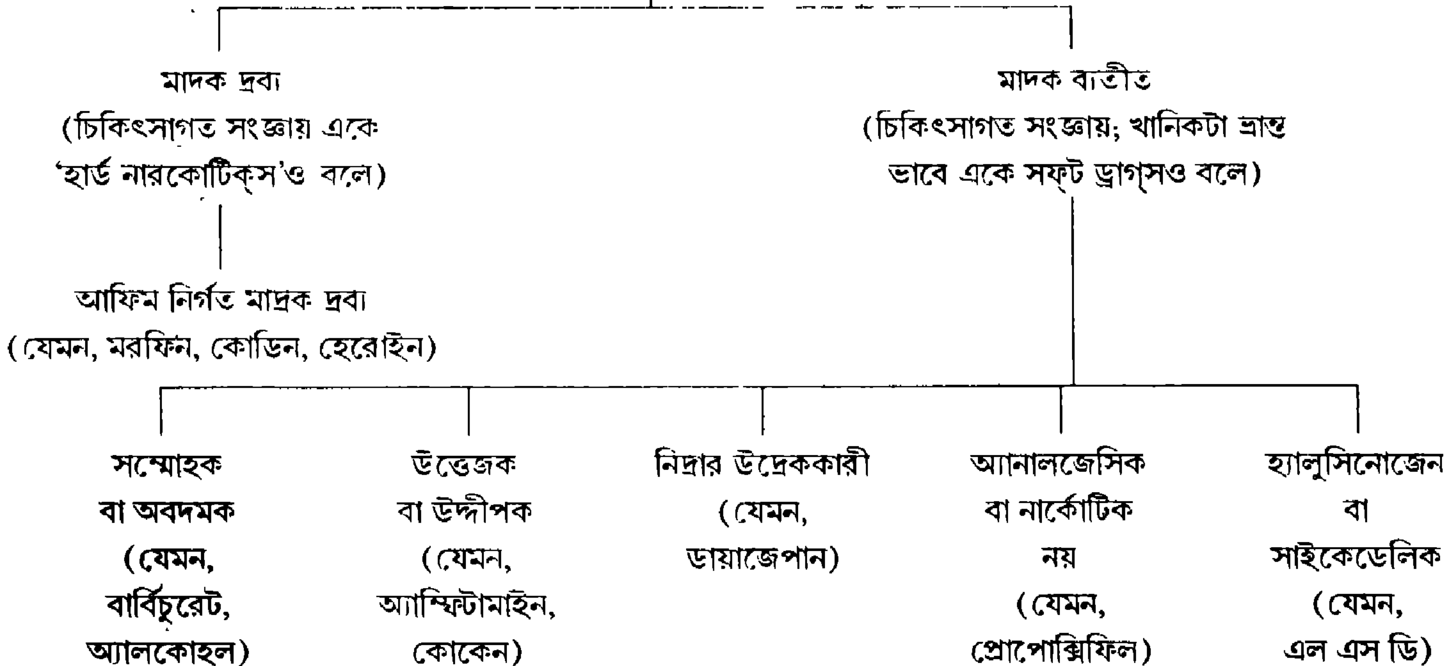
তৃতীয় ধাপটিতে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মনির্ভর হয়ে যায়। অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে ওঠে যে, সে নিয়মিত ড্রাগ না নিলে 'প্রত্যাহরণ লক্ষণের' (উইথড্রয়াল সিম্পটম্) অসহ্য কষ্ট তাকে কুরে কুরে খায়। তবে আশার কথা এই যে এ ধাপেও ড্রাগ ব্যবহারকারী ব্যক্তির পরিত্রাণের সম্ভাবনা থাকে কারণ সে চিকিৎসাগত সাহায্য নিতে অস্বীকার করতে পারে না।

চতুর্থ ধাপটিতে দুর্দশা চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছয়। এই ধাপে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি একেবারে অপাংক্তেয় হয়ে যায় এবং কোন চিকিৎসা গ্রহণ করতে চায় না। এই ধাপে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে তার চরম অবনতি ঘটে।

বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে পঞ্চম ধাপে খুব ক্ষীণ হলেও ড্রাগের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার একটা সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির আর্থিক অনটন ও পেশাগত অসুবিধা তাকে নেশার হাত থেকে নিস্তার পেতে সাহায্য করে। একবার আসক্তি চলে এলে ড্রাগটির প্রয়োগের ফলে মস্তিকে উৎপন্ন প্রতিক্রিয়াটি স্থায়ীভাবে



চিত্র 2. একটি আদর্শ নেশাখোর


মাদক দ্রব্য (আইনগতভাবে) বা মানসিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম ড্রাগ
মাদক দ্রব্য
(চিকিৎসাগত সংজ্ঞায় একে
'হার্ড নারকোটিক্স'ও বলে)
মাদক ব্যতীত
(চিকিৎসাগত সংজ্ঞায়; খানিকটা ভ্রান্ত
ভাবে একে সফ্‌ট ড্রাগ্‌সও বলে)
আফিম নির্গত মাদ্রক দ্রব্য
(যেমন, মরফিন, কোডিন, হেরোইন)
সম্মোহক
বা অবদমক
(যেমন,
বার্বিচুরেট,
অ্যালকোহল)
উত্তেজক
বা উদ্দীপক
(যেমন,
অ্যাম্ফিটামাইন,
কোকেন)
নিদ্রার উদ্রেককারী
(যেমন,
ডায়াজেপান)
অ্যানালজেসিক
বা নার্কোটিক
নয়
(যেমন,
প্রোপোক্সিফিল)
হ্যালুসিনোজেন
বা
সাইকেডেলিক
(যেমন,
এল এস ডি)

পাল্টে যায়। তাই ড্রাগের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলার পরও নেশাগ্রস্ত মানুষটি কখনই সম্পূর্ণভাবে নিরাময় লাভ করতে পারে না। ড্রাগের খপ্পর থেকে এই ধরনের 'আরোগ্যলাভের' প্রক্রিয়াটি খুব সহজে আসে না। পুনরায় ড্রাগে আসক্ত হওয়ার ঘটনাও খুব একটা বিরল নয়।

জাল ড্রাগ (ডিজাইনার্স ড্রাগ)

আজকাল একধরনের জাল ড্রাগ বেরিয়েছে যা আসল ড্রাগের মতই কাজ করতে পারে। এগুলি বেআইনিভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে তৈরি হয়। কখন কোন বাড়ির বেসমেন্টে বা গ্যারেজে বা কোন গোপন লেবরেটরিতে এই ধরনের ড্রাগ তৈরির আখড়া পাওয়া যায়। বহু কেমিস্ট (রসায়নবিদ্) হেরোইন, কোকেন ও পিসিপির রাসায়নিক গঠনের সামান্য রকম ফের ঘটিয়ে অদ্ভুত সব নকল ড্রাগ তৈরি করেন। কখনো কখনো এই মেকি ড্রাগগুলি মূল ড্রাগের চেয়েও কয়েকশো গুণ বেশি শক্তিশালী হয়। হেরোইনের নকলে তৈরি হয় চায়না হোয়াইট, এক্সট্যাসি তৈরি হয় অ্যাম্ফিটামাইনের নকলে আর পিসিই, পিসিপির মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই ড্রাগগুলি নেওয়ার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে।

মাদক দ্রব্যের শ্রেণীবিভাজন

বাজারে যেসব ড্রাগ পাওয়া যায়, সেগুলির সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে একটি সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

যেসব ড্রাগগুলি সম্মোহন বা মানসিকভাবে দমিয়ে দিতে পারে সেগুলি নিদ্রারও উদ্রেক করে। কিন্তু এগুলি শরীরকে অবশ করতে পারে না এবং আফিমের তুলনায় দুর্বলতর। তাই এগুলিকে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত নারকোটিক্স-এর সবগোত্রে ফেলা হয় না। অধিকাংশ ঘুমের ওষুধে নিদ্রা উদ্রেককারী বারবিচুরেট থাকে। উত্তেজকগুলি ঘুম তাড়াতে ওস্তাদ। পরীক্ষার সময়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী অ্যাম্ফিটামাইন খেয়ে সারারাত জেগে পড়াশুনো করে থাকে। এটি কিন্তু একটি মারাত্মক বদভ্যাস। এ যেন অবসন্ন ঘোড়াকে ক্রমাগত চাবুক মেরে দৌড়তে বাধ্য করার চেষ্টা। অ্যাম্ফিটামাইনের প্রভাব কমে গেলে কিন্তু আবার বিশ্বের ক্লান্তি এসে ভিড় করে। নারকোটিক শ্রেণী বহির্ভূত যন্ত্রণা নিরোধক ওষুধ (অ্যানালজেসিক), যেমন প্রোপোক্সিফিল খুবই জোরালো ওষুধ আর ডাক্তাররা হাড়-গোড় ভাঙলে এই ওষুধ দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণার উপশম করান। ডায়াজেপামের (কামপোজ) মত ওষুধ রুগীদের মনে প্রশান্তি নিয়ে আসে। চিকিৎসার কাজে হ্যালুসিনোজেনের প্রয়োগ আছে বলে জানা নেই।

দুই

আফিমের গল্প

আফিমকে বলা হয় 'মাদক দ্রব্যের রাজা'। সম্ভবত আর কোন মাদকদ্রব্য এর মত জনপ্রিয় নয়। হেরোইনের মত কড়া ড্রাগগুলি আফিম থেকেই তৈরি হয়। যাকে একবার আফিমের নেশা ধরে, সে যে ভাবেই হোক তার প্রয়োজনীয় মাদকটি যোগাড় করবেই। প্রয়োজন হলে চুরি-চামারি, রাহাজানি বা খুন করতেও পিছপা হবে না। তাই আফিম ও তার সমগোত্রীয় মাদকদ্রব্যগুলিকে চিকিৎসাবহির্ভূত কাজে লাগানোর ব্যাপারে বহু দেশে যথেষ্ট বিধিনিষেধ আছে।

কাঁচা আফিম গাঢ় বাদামী থকথকে একটি পদার্থ যার গন্ধ খুব কড়া হয় আর স্বাদও খুব তেতো হয়। এটি খেলে অদ্ভুত এক ভালো লাগার অনুভূতি আসে। ছোট ছোট মাত্রায়, প্রায় 50 মিলিগ্রাম পরিমাণ খেলে খুব আনন্দের আমেজ আসে। কিন্তু বেশি মাত্রায় খেলে ঘুম চলে আসে। এর চেয়েও বেশি মাত্রায় (প্রায় 2 গ্রাম) খেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

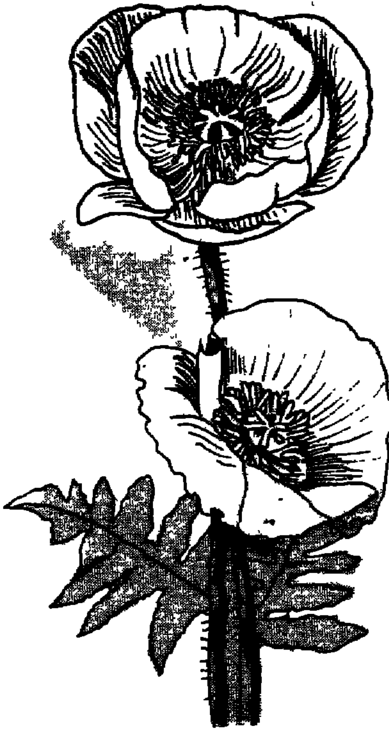
পপি গাছ

আফিম পাওয়া যায় পপি গাছ থেকে। উদ্ভিদবিদের কাছে পপিগাছ প্যাপাভার সোমনিফেরাম নামে পরিচিত। এটি একটি দ্বিবীজপত্রী (এর বীজের দুটি পত্রের মত ভাগ থাকে) উদ্ভিদ। এটি প্যাপাভেরাসি গোত্রের প্রাণী। এই গোত্রটি ক্রুসিফেরি গোত্রের নিকটসম্বন্ধী। বাঁধাকপি ক্রুসিফেরি গোত্রের সদস্য। গ্রীক শব্দ প্যাপাভারের অর্থ পপি। সোমনিফেরাম একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ 'ঘুম এনে দিই'। যেহেতু আফিম ঘুমকে ডেকে আনে, এই নামটি খুবই উপযুক্ত।

পপিগাছের উৎপত্তি এবং নেশাখোরদের উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে একটা দারুণ উপকথা প্রচলিত আছে। বহু যুগ আগে গঙ্গার ধারে এক ঋষি থাকতেন। তার সাথে এক্টা ইঁদুর থাকত। ইঁদুরটা সর্বদাই বেড়ালের ভয়ে ভীত হয়ে থাকত। একদিন সে ঋষিকে অনুরোধ করল যাতে তিনি সেটিকে বেড়ালে রূপান্তরিত

করেন। তার কথামত ঋষি তার যোগবলে ইঁদুরটিকে বেড়াল বানিয়ে দিলেন। এবার কিন্তু তাকে কুকুরেরা বিরক্ত করতে লাগল। সে ঋষিকে কুকুর হওয়ার আর্জি জানাল। ঋষি এবারো তার মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। সে এতেও সন্তুষ্ট হল না। এরপর ঋষি তাকে ক্রমে ক্রমে বাঁদর, শুয়োর, হাতি ও শেষমেশ এক সুন্দরী নারী করে দিলেন। পোস্তমণি নাম্নী এই সুন্দরী এক রাজার পাণিগ্রহণ করল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে একদিন একটি কুয়োয় পড়ে গিয়ে মারা গেল। শোকবিধ্বস্ত রাজা তার স্ত্রীর মৃতদেহ নিয়ে ঋষির কাছে ছুটে গেলেন আর কাতর হয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা করলেন। ঋষি রাজাকে কথা দিলেন যে রাণী পোস্তামণিকে তিনি অমর করে দেবেন। এই বলে তিনি পোস্তামণির মৃতদেহটি পোস্ত বা পপিগাছে রূপান্তরিত করলেন। ঋষি বললেন, "এই গাছটি থেকে তৈরি হবে আফিম — যা মানুষ লোভে পড়ে খাবে। যে আফিম খাবে তাকেই পোস্তমণি যে ধাপগুলো অতিক্রম করে রাণী হয়েছিল, সেই ধাপগুলো পেরিয়ে আসতে হবে। সে ইঁদুরের মত ক্ষতিকর, বেড়ালের মত দুধের ভক্ত, কুকুরের মত কুঁদুলে, বানরের মত নোংরা, শুয়োরের মত জংলি, হাতির মত শক্তিশালী আর রাণীর মত প্রাণোচ্ছল হবে।"

উজ্জ্বল সূর্যালোকে সমভূমি বা উপত্যকার ছোট ছোট ক্ষেতে পপিগাছের চাষ করা হয়। গ্রীস, ভারত, তুরস্ক, চীন, ইরান, অধুনা যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগারিয়াতে এই গাছের চাষ হয়। দূরপ্রাচ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে, বনে বাদাড়ে পপিগাছ দেখা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পৃথিবীর তিনটি বিশেষ অঞ্চলে। এই অঞ্চলগুলি হল সোনালী ত্রিভুজ, সোনালী বাঁকা-চাঁদ (দ্রঃ চিত্র 1) এবং মেক্সিকো। পপি চাষ করা হয় দুটি প্রধান ফসলের (যেমন ভুট্টা, তামাক) মধ্যবর্তী সময়টিতে। সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি, ধাপে-ধাপে এই চাষ করা হয় যাতে খরা, তুষার ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফসলের ধ্বংসের কারণ না হয়। চারাগুলির মাঝে অন্তত 25 সেমি ব্যবধান রেখে লাগানো হয়। জমির সামান্য উপর থেকে চারাগুলির শাখা বেরোয় আর সেগুলির উচ্চতা 60-150 সেমি পর্যন্ত পৌঁছয়।

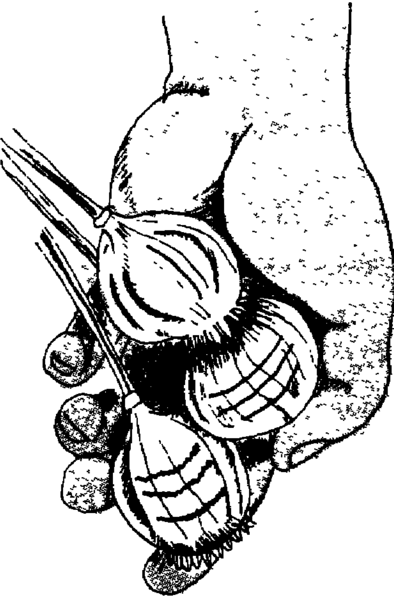


চিত্র 3: পপি উদ্ভিদ ও তার ফুল।

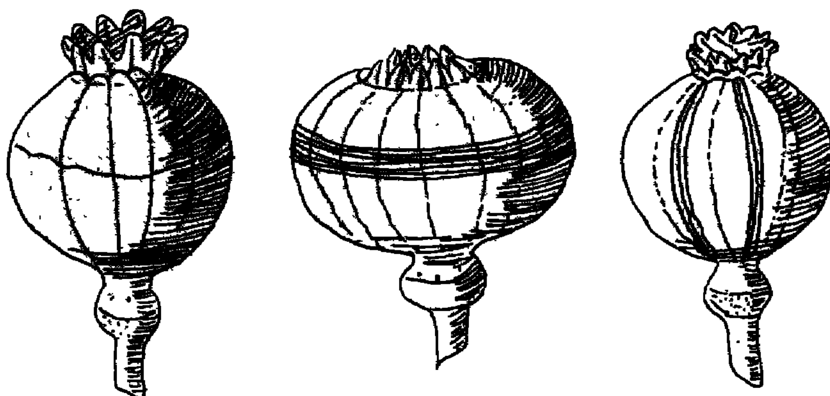
মে মাসের শেষে বা জুনের প্রথমে পপিগাছে ফুল আসে। ফুলগুলি রঙিন আর সুন্দর হয়। সাধারণত ফুলের রঙ সাদা বা বেগুনি হয় আর তাতে লাল বা কমলা রঙের ছোপ থাকে। ফুলগুলির ব্যাসার্ধ প্রায় 10 সেমি হয় আর দুটি বৃতি অংশের মধ্যে চারটি পাপড়ি সাজানো থাকে। বুজে থাকা কুঁড়িগুলো বৃতির ঢাকনা খুলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। নিষেকের (ডিম্বকের গর্ভাধীন) পরে পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে আর পপির গোলাকার খোলটি বেরিয়ে পড়ে। এর আকার ও আকৃতি প্রায় ডালিম ফলের মত হয়। একটি পপিগাছ এই ধরনের প্রায় পাঁচ থেকে আটটি পপি খোল উৎপন্ন করে।

আফিম সংগ্রহের পদ্ধতি

পপি খোল থেকে আফিম সংগ্রহের পদ্ধতিটি ভারি অদ্ভুত। খোলগুলি যখন কাঁচা (বা সামান্য হলুদের ছোঁয়া লাগে) থাকে, খুব আলতো করে খোলের উপরটা চিরে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিটিকে বলে 'ছেদন'। পপিখোলের ভিতরের অংশটি ফাঁপা হয় আর এতে অনেকগুলি ছোট ছোট খোপ বা প্রকোষ্ঠ থাকে। এই প্রকোষ্ঠগুলিতে হাজার হাজার ক্ষুদ্র কিডনির (বৃক্ক) আকৃতির বীজ থাকে যাকে খুশ-খুশ বলে। তাই খুব সাবধানে 'ছেদন' প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন না করলে প্রকোষ্ঠগুলি ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। এই ছেদগুলি পপিখোলের তরু-ক্ষীর (উদ্ভিদ উৎপন্ন বর্জ্য রস, যেমন রবার) নালিকা ভেদ করে আর ফোঁটা ফোঁটা রস বা তরুক্ষীর বেরোতে থাকে। ইংরাজি শব্দ 'ওপিয়াম' এসেছে গ্রীক শব্দ 'ওপোস' থেকে। যার অর্থ 'উদ্ভিদের রস'। এই শব্দটির থেকেই 'ওপিওম' শব্দটি এসেছিল যার অর্থ 'পপি রস'। সাধারণত দুপুরের দিকে খোলের গা ছেদ করা হয় আর নিঃসরিত রস ছুরি বা অন্য কোন অস্ত্রের সাহায্যে পরের দিন সকালে চেঁছে নেওয়া হয়। এই ছেদন প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা হয়। তা না হলে বৃষ্টি, জোরালো বাতাস বা শিশির রসটিকে নষ্ট করে দিতে পারে। পপিখোলের গা থেকে সংগৃহীত এই রসকে অনেকে 'পপির অশ্রুবিন্দু'—বলেন। এদেশে ছেদ করার কাজে 'নস্তর' নামের একটি তিন বা



চিত্র 4: ফালা ফালা দাগ কাটা পপি খোল।



চিত্র 5 ফালা ফালা দাগ নানাভাবে দেওয়া হয়

চার ফলা বিশিষ্ট অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই অস্ত্রটিতে ফলাগুলি প্রায় 3 মি.মি. ব্যবধানে লাগানো থাকে। ছেদ করার সময় নিচ থেকে উপরের দিকে খাড়াভাবে তিন-চারটি চিড় খাওয়ানো হয়। দু তিন দিন ছাড়া ছাড়া আরো তিন থেকে চারবার এই অপারেশনটি করা হয়। এভাবে 5000 বর্গমিটার বিশিষ্ট পপিক্ষেত থেকে প্রায় 4-6 কেজি কাঁচা আফিম পাওয়া যেতে পারে।

আফিমের উপক্ষার

উদ্ভিদের আরেকটি বর্জ্য পদার্থ উপক্ষার, যা ভেষজ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। কাঁচা আফিম থেকে এ ধরনের বহু উপক্ষার পাওয়া যায়। উপক্ষারগুলি সাধারণত খুব তেতো হয়। উপক্ষারের অনুগুলি চক্রাকার হয় আর প্রতিটি চক্রে একটি করে নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে। সব উপক্ষারই বিষাক্ত হয় কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে নিলে এগুলি ওষুধের কাজ করতে পারে। উপক্ষার অন্যান্য বহু উদ্ভিদেও পাওয়া যায়। এদের নামের শেষে 'ইন' কথাটি থাকে বলে এদের চিনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। তামাক গাছের উপক্ষার নিকোটিনের নাম খুবই পরিচিত। এই ধরনের আরো কয়েকটি উপক্ষার হচ্ছে নাক্সভমিকা উদ্ভিদের স্ট্রিকনিন, ধুতরার অ্যাট্রোপিন ও অ্যাকোনাইট গাছের অ্যাকোনিটিন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপক্ষার হল কোকেন যার সম্পর্কে পরের অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কেউ বলতে পারে না কেন প্রকৃতি কয়েকটি বিশেষ উদ্ভিদে উপক্ষারের মত তেতো রাসায়নিক দেয়। এই তিক্ততা অবশ্য জন্তু জানোয়ারকে উদ্ভিদগুলি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই দেখা যাচ্ছে এই উপক্ষারগুলি প্রতিরক্ষার কাজও করে।

কাঁচা আফিম থেকে গোটা পঁচিশেক উপক্ষার পাওয়া যায়, যার ওজন মোট

আফিমের অন্তত এক চতুর্থাংশ হয়। আফিমের প্রধান উপক্ষারটি হল মরফিন যা কাঁচা আফিমের 10-20% অংশ।

মরফিন ব্যথা বেদনার উপশম করে—বিশেষ করে হৃদ্‌রোগের ফলে যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তার উপশমে মরফিন অত্যন্ত কার্যকর হয়। এটি খুব দ্রুত ঘুম এনে দেয়। মরফিন নামটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক স্বপ্নের দেবতা মরফিয়াসের নাম থেকে। মরফিয়াসের সন্তানের নাম হিপনোস—ইনি আবার 'ঘুমের দেবতা।' হিপনোস শব্দটি থেকেই হিপনোসিস কথাটি এসেছে। হিপনোস আবার মৃত্যুর দেবতা থানাটাসের আপন ভাই। তাই মৃত্যু সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিদ্যাকে থানাটোলজি বলে। মরফিন যেমন ঘুম এনে দিতে পারে তেমনি বেশি মাত্রায় এই রাসায়নিকটি খেলে মৃত্যুও হতে পারে। প্রায় 200 মিলিগ্রাম মরফিন অবধারিতভাবে মৃত্যু এনে দেয়। তাই দেখা যাচ্ছে মরফিন তিন তিনটি গ্রীক দেবতার নামের সাথে যুক্ত।

মরফিন নিষ্কাশন

1805 সালে জার্মান ঔষধবিজ্ঞানী ফ্রেড্‌রিখ উইলহেল্‌ম অ্যাডাম সার্টার্নার (1783-1841) সর্বপ্রথম কাঁচা আফিম থেকে মরফিন পৃথক করেন। এটি আফিম নিঃসৃত প্রথম উপক্ষার তো বটেই, বস্তুতপক্ষে এটিই কোন উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত প্রথম উপক্ষার। যেমন স্যার হাম্‌ফ্রি ডেভি তার আবিষ্কৃত নাইট্রাস অক্‌সাইড বা লাফিং গ্যাস সর্বপ্রথম নিজের দেহেই প্রয়োগ করেন ঠিক সেভাবে সার্টার্নারও মরফিন তার নিজের শরীরে প্রথমে প্রয়োগ করেন। এরপর তিনি মরফিনের স্ফটিকাকার দানা ইঁদুরের খাবারে ব্যবহার করে তার গুদোমঘরের ইঁদুরগুলিকে শেষ করেছিলেন। কুকুরের খাবারে মিশিয়ে এলাকার অনেকগুলি রাস্তার কুকুরকে মেরে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে মরফিন প্রথমে এই জন্তুগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় এবং খানিক পরে মৃত্যুকে ডেকে আনে। মরফিন ও তার নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবিষ্কার সার্টার্নারকে প্রচুর সম্মান এনে দিয়েছিল। বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছিল। 'মানবজাতির হিতৈষী' আখ্যা দিয়ে তাকে দু'হাজার ফ্রাঁ মূল্যের একটি পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পরের দিকে এই কাজের জন্যই তাকে বিরূপ সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল—সম্ভবত শুধুমাত্র এই কারণে যে তিনি তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি একটি ঔষধ প্রস্তুতকারকের দোকানে করেছিলেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণালয়ে নয়। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সার্টার্নার আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ ও তার উন্নতিকল্পে তাঁর উর্বর মস্তিষ্ক প্রয়োগ করেছিলেন এবং এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি বাতের ব্যথায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন এবং তাঁর আবিষ্কৃত মরফিন

দিয়েই সেই ব্যথার উপশম করতেন।

মরফিন আবিষ্কারের মাত্র 18 বছরের মাথায়, রাসায়নিকটি মানুষ মারার কাজে লাগানো হয়। 1823 সালে এডমা কস্তেঁ নামের 27 বছর বয়স্ক এক ফরাসী ডাক্তার তাঁর বন্ধু অগস্ট ব্যালেকে মরফিন মেশানো মদ খাইয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। অগস্ট মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে প্যারিস স্কুল অভ মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর পেলাটনকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ডক্টর পেলাটন লক্ষ করেছিলেন যে অগস্টের চোখের মণিটি কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে একটি বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে। শরীরে মরফিন প্রবেশ করলে নিশ্চিতভাবে এই লক্ষণটি ফুটে ওঠে। অগস্ট মৃত্যুর পর ডক্টর পেলাটন তাঁর মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়েছিলেন। এই তদন্তে দেহে মরফিনের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল এবং কস্তেঁ দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। গিলোটিনে তার শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। মজার কথা হল এর পর থেকেই চিকিৎসাক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রায়ই নানা অপরাধে মরফিন প্রয়োগ করতে দেখা যায়। এদের পক্ষে হাতের কাছে মরফিন পাওয়া সহজ হয় বলেই এই ঘটনা ঘন-ঘন ঘটে।



চিত্র 6 জার্মান ঔষধতত্ত্ববিদ ফ্রেডরিখ সার্টার্নার, ইনি সর্বপ্রথম কাঁচা আফিম থেকে মরফিন পৃথক করেন।

মরফিন বস্তুটি ঠাণ্ডা জলে সামান্য দ্রাব্য কিন্তু ফুটন্ত জলে বেশি দ্রাব্য—এই ধরুন পাঁচশো ভাগ ফুটন্ত জলে এক ভাগ দ্রাব্য হয়। আজকাল ফুটন্ত জলে কাঁচা আফিম ফেলে দিয়ে তার থেকে মরফিন নিষ্কাশিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে অদ্রাব্য আফিমের আঠা আলাদা করে নেওয়া হয় এবং তারপর দ্রবণটির প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। নিয়মমাফিক মরফিন 7·5 সেমি x 10 সেমি x 2·5 সেমি আকারের আয়তাকার খণ্ড হিসাবে প্রস্তুত করা হয়। এগুলির ওজন 300 থেকে 350 গ্রাম হয় এবং প্রায়শই এর গায়ে '999' বা 'AAA' ছাপ মারা থাকে। 1 কেজি মরফিন তৈরী করতে প্রায় 10 কেজি কাঁচা আফিম লাগে। শুনলে অবাক লাগবে যে পপির খোল যত পাকতে থাকে মরফিনের পরিমাণ তত কমতে থাকে। শুকনো ও পাকা খোল থেকে খুব সামান্য মরফিন পাওয়া যায় (শতকরা 0·1ভাগ)। শুকনো পপি ফল

সেদ্ধ করে বহু গ্রামের মানুষ সেটিকে ঘুমের ওষুধ, সেঁক দেওয়া ও পুলটিস হিসাবে ব্যবহার করে।

আফিম থেকে প্রাপ্ত আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপক্ষারের নাম নারকোটিন। কাঁচা আফিমে শতকরা 2-8 ভাগ নারকোটিন থাকে। এর নামটিও সেই গ্রীক শব্দ 'নার্কে' থেকে এসেছে যার অর্থ 'অবশ' বা 'অসাড়'। এছাড়া 0·3-4 শতাংশ হারে কোডিনও আফিম থেকে পাওয়া যায়। কোডিন এসেছে গ্রীক শব্দ 'কোডিয়া' থেকে। এর অর্থ 'পপির মাথা'। সর্দিকাশির উপশম করতে পারে বলে অধিকাংশ কাশির ওষুধে কোডিন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পাওয়া যায় শতকরা 1 ভাগ প্যাপাভেরিন ও শতকরা 0·2-0·5 ভাগ থিবাইন। প্যাপাভেরিন নামটির উৎপত্তি আবার সেই গ্রীক শব্দ প্যাপাভার (অর্থ পপি) আর থিবাইন তার নাম পেয়েছে প্রাচীন মিশরীয় রাজধানী থিবিসের নাম থেকে। এই শহরটিতে কাঁচা আফিমের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। উল্লিখিত এই পাঁচটি উপক্ষার কাঁচা আফিমের 24 শতাংশ দখল করে থাকে। বাকি 0·1 শতাংশে থাকে কম করে 20 টি উপক্ষার—খুব অল্প-অল্প পরিমাণে। আশ্চর্যের কথা, ভারতে খুশ খুশ নামের যে পপি বীজ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়, তার কোন কুফল নেই আর না আছে কোন উপক্ষার। এগুলি পপিগাছের অংশ বটে কিন্তু এতে একটাও উপক্ষার পাবেন না। এতে বিষ তো নেই-ই উপরন্তু এটিকে খাবার-দাবারে সুগন্ধী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলির রঙ সাদা আর খেতে অনেকটা বাদামের মত সুস্বাদু। এগুলি মিষ্টি খাবারের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। খুশ খুশে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং এটি থেকে নিঃসৃত তেল, 'খুশ খুশ কা তেল' নামে পরিচিত। রন্ধনশিল্পে এই তেলটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শ্যাম্পু-সাবানে ও সুগন্ধীর গন্ধকে আরো বেশি সুবাসিত করার জন্য এর ব্যবহার প্রচলিত আছে।

আফিম, নানা যুগে

আফিমের গল্পটি খুব পুরানো আর মজার। শুধু ইতিহাসেই নয়, নানা প্রেমের উপাখ্যান ও অপরাধের গল্পেও আফিমের উল্লেখ পাওয়া গেছে। ঐশ্বর্য ও সম্পদের সাথে এই মাদক দ্রব্যটির যেমন সম্পর্ক ঠিক তেমনই এটি বহু চরম বিপর্যয়ের ঘটনার সাথে যুক্ত। আফিমের জন্য খুন, যুদ্ধ, মন-কষাকষি, শাস্তি-সাজা — কি হয়নি! একদিকে এটি যেমন মানুষের ব্যথা-বেদনার উপশম ঘটিয়েছে, অন্যদিকে মানুষকে পাশবিক আচরণেও উদ্বুদ্ধ করেছে।

পপিচাষ ও আফিম-প্রস্তুতি সংক্রান্ত প্রাচীনতম নিদর্শনটি পাওয়া গেছে পাঁচহাজার খ্রীস্ট পূর্বাব্দের একটি সুমেরীয় মাটির ফলকে। সুমেরীয় লিপিতে পপির ভাবলেখ (ভাবনির্দেশক রেখা) ছিল 'হালগিল' (অর্থাৎ আনন্দদায়ক উদ্ভিদ)।

আসিরীয় চিকিৎসাফলকগুলিতে আফিমকে 'আরৎ পা পা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে প্রায় একই সময়ে ইউরোপেও পপিফুলের আফিম ব্যবহৃত হত। সুইজারল্যান্ডের হ্রদে পপিফুলের খোল পাওয়া গেছে। এই খোলগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এগুলি প্রাচীন প্রজাতির প্যাপাভার সেটিগেরামের খোল নয়, রীতিমত কৃষিজাত পপির খোল। অবশ্য এটি নির্ধারণ করা যায়নি যে সেই উদ্ভিদগুলি তেলের জন্যে না মাদক রসের জন্য চাষ করা হয়েছিল।

শিশুদের দাঁত ওঠার সময়ে যে সব রোগভোগ হয়, মিশরে তার চিকিৎসার জন্য সেই 2000 খ্রীস্টপূর্বাব্দে আফিম ব্যবহৃত হত। মিশরীয়রা শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্যেও এই মাদকটিকে কাজে লাগাত। রোমান লেখক প্রসপাস অ্যালপিনাসের মতে মিশরীয়রা পাক্কা আফিমখোর ছিল আর এই বস্তুটির জন্য তারা পাগল হয়ে উঠত। এটি থেকে তারা 'ক্রেটিক মদ' তৈরী করে পান করত। সেই পানীয়কে সুস্বাদু করার জন্য গোলমরিচ আর কিছু সুগন্ধী যোগ করত। ওল্ড টেস্টামেন্টের কয়েকটি অংশ থেকে জানা যায় যে প্রাচীন হিব্রু জাতির মানুষেরাও আফিমের কথা জানত। এই পুরাতন গ্রন্থটিতে সম্ভবত 'রোশ' (অর্থ 'মাথা') বলতে পপির মাথাকে আর 'মেরোশ' মানে পপিরসকে বুঝিয়েছে।

বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসাবিষয়ক নিদর্শন 'এবার্স প্যাপিরাসেও' আফিমের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দলিলটি নীল নদের পূর্বতীরে অবস্থিত লুক্সর নগরের একটি কবরখানা থেকে উদ্ধার করা হয়। এটি একটি মমির পায়ের কাছে সযত্নে রাখা ছিল। আনুমানিকভাবে এটি 1550 খ্রীস্ট পূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল। এই দলিলটিকে 'এবার্স প্যাপিরাস' বলা হয় কারণ অধ্যাপক এবার্স 1872 সালে এটিকে এক বিক্রয়মেলায় আবিষ্কার করেন। এই প্যাপিরাসটিতে ক্রন্দনরত শিশুকে শান্ত করার ঔষধ হিসাবে, আফিম ও আরেকটি রাসায়নিকের মিশ্রণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কিছুদিন আগেও মিশর, ভারত এমনকি ইউরোপেও শিশুকে শান্ত করার জন্য আফিম প্রয়োগ করা হত। মায়েরা তাদের স্তনবৃন্তে পপিরস লাগিয়ে, ছিঁচকাঁদুনে শিশুকে 'মাদক দুধ' খাইয়ে ঠাণ্ডা করতেন।

অন্য আরেকটি উদ্ভিদ থেকে পাওয়া বিখ্যাত মাদকটির নাম ভাঙ বা সিদ্ধি (ইংরাজিতে একে ক্যানাবিস বা হ্যাশিস বলে)। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে এই দ্রব্যটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব। একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে সম্ভবত এককালে লোকে আফিম আর গাঁজাকে গুলিয়ে ফেলত। খুশ খুশ (পপিবীজ) শব্দটিকে কখনও কখনও 'খাস খাস' বলা হয় আর সম্ভবত এই উচ্চারণের থেকে উৎপত্তি হয়েছে হ্যাশিস শব্দটির।

গ্রীক মহাকবি হোমার (খ্রীস্ট পূর্ব নবম শতাব্দী) আফিমের কথা জানতেন এবং

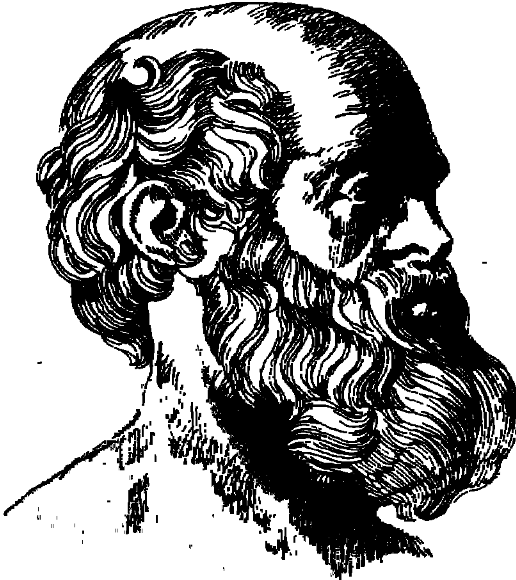
তার ইলিয়াড ও ওডিসি গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। হোমার যে সময় বেঁচেছিলেন সে সময়ে নেপেনথিস নামের একটি অদ্ভুত মাদকের ব্যবহার ছিল। এটিকে 'বিস্মৃতির মাদক'ও বলা হত। গ্রীসে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। নেপেনথিসের একটি প্রধান উপাদান ছিল আফিম। ট্রোজান যুদ্ধের এক প্রধান নায়ক টেলিমেকাস, স্পার্টায় মেলেনাসের সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে তিনি তার পিতা ওডিসিয়াসের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। টেলিমেকাসের এই দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য, মেলেনাসের স্ত্রী হেলেন তাকে নেপেনথিস খেতে দিয়েছিলেন—যাতে তিনি চিন্তামুক্ত হতে পারেন।

মনে হয় গ্রীক যোদ্ধারা যুদ্ধের আগে নিয়মিতভাবে নেপেনথিস খেতেন যাতে বিপদ-আপদের যাবতীয় ভয় মন থেকে দূর হয়ে যায়। সম্ভবত হেলেন নেপেনথিসের ক্বাথ এর পরেও বহু বার তৈরী করেছিলেন। এই দ্রবণ প্রস্তুতির উপায়টি তিনি মিশরীয় রাণী পলিডাম্‌নার কাছে শিখেছিলেন. ঘটনাটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য কারণ সে যুগে মিশরে প্রচুর পরিমাণে পপি ফুল ফুটত। বস্তুতপক্ষে সিসিয়ন নামের একটি মিশরীয় শহরে এমন ব্যাপক হারে পপির চাষ হত যে শহরটির নাম হয়েছিল 'মেকোন' অর্থাৎ 'পপিফুলের শহর।' গ্রীক ভাষায় মেকন শব্দটির অর্থ পপি। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে এই মেকন শব্দটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শব্দ মেকোনিয়নের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখে। সদ্যোজাত শিশুর প্রথম মলকে মেকোনিয়ন বলে। এই নামকরণের কারণ শিশুর মলের সাথে পপি-নিঃসৃত গাঢ় রসের অদ্ভুত মিল আছে। মেকোন শব্দটি মেকোনিক অ্যাসিডেও পাওয়া যায়। কাঁচা আফিমে প্রায় শতকরা 5 ভাগ এই অ্যাসিড থাকে ।

প্রাচীন ইটালির ভুট্টা বা কর্ণ-শস্যের দেবীর নাম ছিল সেরেস (সেরিয়াল কথাটি এই নামানুসারেই হয়েছে)। এই দেবী তার যন্ত্রণা উপশমের জন্য আফিম নিতেন, তাই তার মূর্তিতে হাতে পপিফুলের মাথা দেখতে পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন শিল্পকলায় পপিকে প্রাচীন ঘুমের প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। এটিকে ঘুমের দেবতা হিপনোসের মূর্তিতেও দেখা যায়, যেখানে শ্মশ্রুশোভিত একটি লোককে, একজন ঘুমন্ত মানুষের চোখের পাতায়, একটি পশু-শৃঙ্গ নির্মিত পাত্র থেকে পপি রস ঢালতে দেখা যায়। স্ক্রীবোনিয়স লার্জাস (খ্রীস্টাব্দ 40) পপি প্রস্তুতির একটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন এবং এও বলেছেন যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এই মাদক দ্রব্য, পপির খোল থেকেই পাওয়া সম্ভব, গাছটির অন্য কোন অংশ থেকে নয়। রোমক মুদ্রায় পপির চিহ্ন খোদিত ছিল। ইহুদি ইতিহাসে, জন হিরকানাসের ব্রোঞ্জ মুদ্রায় পপির চিহ্ন পাওয়া যায়। হিরকানাস ছিলেন একাধারে রাজপুত্র ও ম্যাকাবিশ জাতির প্রধান পুরোহিত (135-106 খ্রীস্ট পূর্ব)।

আফিম-নিঃসৃত পপির মূল উৎসস্থল সম্ভবত এশিয়া মাইনর (আধুনিক তুরস্ক)।

এখান থেকেই অন্যান্য অঞ্চলে আফিম ছড়িয়ে পড়েছিল। হিব্রুতে একে 'ওফিঅন' বলত আর আরবরা বলত, আফ-ইউন। দুটি নামই 'আফিম' শব্দ থেকে উদ্ভূত। চীনা ভাষার ও-ফিউউং এই আরবী শব্দেরই অপভ্রংশ।



চিত্র 7 গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটাস, ইনি মেকনের উল্লেখ করেন যা খুব সম্ভবত পপির রস।

গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটাসকে (460-377 খ্রীস্ট পূর্ব) চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক বলা হয়। সম্ভবত তিনিও পপি রসের কথা জানতেন কারণ তিনি মেকন নামের একটি রেচন-প্রতিরোধী রাসায়নিকের উল্লেখ করেছেন যা মাদক গুণসম্পন্নও বটে। তবে পপিরসের প্রথম প্রামাণিক উল্লেখ করেন গ্রীক উদ্ভিদবিজ্ঞানী থিওফ্র্যাসটাস (372-287 খ্রীস্ট পূর্ব) — মেকোনিয়ম নামে।

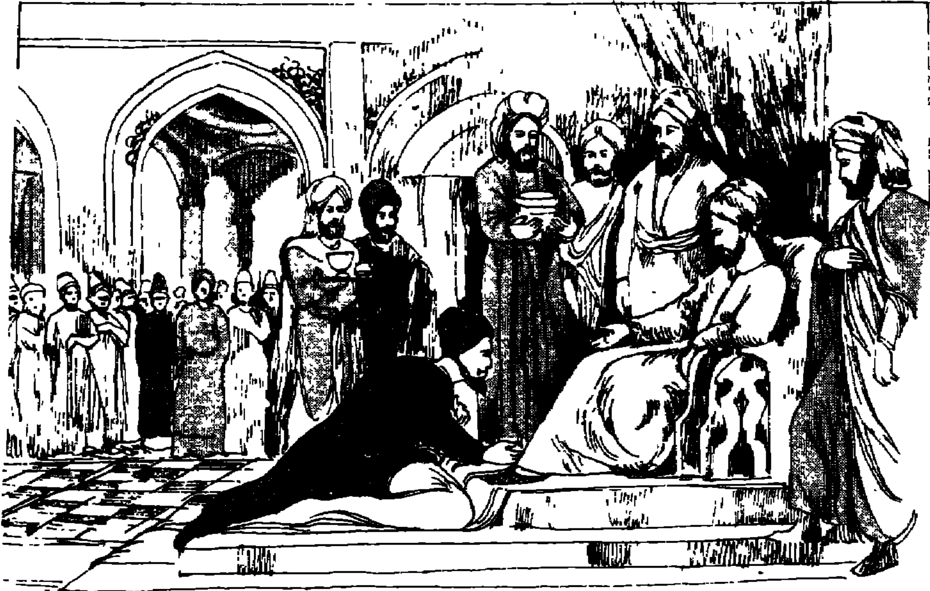
169-287 খ্রীস্টাব্দ সময় কালটিতে রোমের সবচেয়ে নামজাদা চিকিৎসকের নাম ছিল গ্যালেন। গ্যালেন আফিমের গুণাগুণ সম্বন্ধে জোরগলায় প্রচার করতে থাকেন আর তাই দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে আফিম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই মাদকদ্রব্যটি তখন রোমের সাধারণ দোকানদার ও হাতুড়েরাও খোলাখুলি বিক্রি করতেন। অবশ্য এটি সম্ভব হয় কারণ তৎকালীন রোমক সম্রাট সেবেরাস এই মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উপর যাবতীয় বিধিনিষেধ তুলে দেন।

আরব মুলুকের চিকিৎসকরা ব্যাপকভাবে আফিম ব্যবহার করতেন। সবার আগে উল্লেখ করতে হয় আভিসেন্নার (980-1037 খ্রীস্টাব্দ) কথা। আভিসেন্না আন্ত্রিক ও চোখের রোগে আফিম প্রয়োগ করার পরামর্শ দিতেন। কথিত আছে, তিনি নাকি অতিরিক্ত পরিমাণে আফিম সেবন করে মৃত্যুবরণ করেন। প্রায় এই সময়েই আরব সদাগররা প্রাচ্য দেশে আফিমের প্রচলন করেন। কোরানে মদ্যপান সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুসলমানেরা খুব স্বাভাবিকভাবে আফিমের নেশার প্রতি আকৃষ্ট হত। মোগল বাদশাহ বাবর আর হুমায়ুন দুজনেই ঘোর আফিমখোর ছিলেন।



চিত্র 8 রোমান চিকিৎসক গ্যালেন যিনি আফিমের গুণগান করেন।

আরব ব্যবসায়ীরাই চীন ও প্রাচ্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নবম শতাব্দী নাগাদ, আফিমের প্রচলন করেন। বহু বিদেশী পর্যটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আফিমের উল্লেখ পাওয়া যায়। 1511 সালে ভারত ভ্রমণ কালে, বারবোসা, মালাবার উপকূলে আফিমের প্রচলন দেখেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে এই মাদকটি একান্তই ভারতীয় উৎপাদন। 1546 সালে ফরাসী প্রকৃতিবিদ্ বেলোঁ, এশিয়া মাইনর ও মিশর ভ্রমণ করার সময় লক্ষ করেছিলেন তুর্কিরা কি পরিমাণে আফিমের প্রতি আসক্ত। এদের আসক্তি এতটাই তীব্র ছিল যে তারা শেষ কপর্দকটি ব্যয় করেও আফিম কিনে চলত।



চিত্র 9: আরবি চিকিৎসক আভিসেন্না (মেঝেতে বসে), রাজপুত্র আব্দাউলার দরবারে। ইনি আফিম খাইয়ে নানা রোগের চিকিৎসা করতেন।

আফিম খাওয়ার হিড়িক

পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁসের পরে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি আফিমের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। চিকিৎসকরা আফিমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন আর সাহিত্যের আঙিনায় এটি 'চিন্তা-উদ্দীপক' বস্তু হিসাবে প্রচার করা হয়। মানুষের শরীরে আফিম-নিঃসৃত উপক্ষারগুলি গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বলে, রেনেসাঁস পরবর্তী যুগে আফিম সর্বরোগহর ওষুধ হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আফিম শুধু যন্ত্রণা-দমনেই নয় কাশি ও পেট খারাপ সারানোর কাজেও আদর্শ ওষুধ হয়ে উঠেছিল। আফিমের অন্যতম উপাদানের নাম লডেনাম (ল্যাটিন শব্দ 'লডের' অর্থাৎ 'প্রশংসা করা' থেকে গৃহীত)! এই নামে আফিম সপ্তদশ শতাব্দীতে আমাশার অব্যর্থ ওষুধ হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। 'ইংরেজ হিপোক্রেটিস' নামে পরিচিত ব্রিটিশ চিকিৎসক টমাস সিডেনহাম (1624-1689) তো আফিমকে আমাশা ও অন্যান্য বহু রোগের ওষুধ হিসাবে বিধিগত স্বীকৃতি দিয়ে দেন। লডেনামকে অনেকে আফিমের আরক বলত কারণ এটি আফিম আর অ্যালকোহলের মিশ্রিত দ্রবণ ছিল। সাধারণত 100 ঘন সেমি আয়তন অ্যালকোহলের মধ্যে দশ শতাংশ আফিম বা 1 গ্রাম মরফিন মেশানো হত। সিডেনহাম আবার জাফরান, দারচিনি আর লবঙ্গের সুগন্ধী মিশিয়ে আরকটিকে আরো সুস্বাদু করেছিলেন। এই বিচিত্র আরকটি সমগ্র ইউরোপে 'সিডেনহামের আরক' নামে জনপ্রিয় ঔষধে পরিণত হয়েছিল। অনেকে আবার সিডেনহামকে 'ওপিওপাইলাস' বা 'আফিম-প্রেমিক' ছদ্মনামে ডাকতে শুরু করেছিলেন। 1680 সালে সিডেনহাম লিখেছিলেন, "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মানুষকে তার জ্বালা যন্ত্রণা দূর করতে যত ওষুধ দিয়েছিলেন তার মধ্যে আফিমই সবার সেরা আর সবচেয়ে বেশি কার্যকর।" তার ছাত্র টমাস ডোভার সুবিখ্যাত 'ডোভার্স-পাউডার' আবিষ্কার করেছিলেন। এই পাউডারে শতকরা 10 ভাগ



চিত্র 10: ব্রিটিশ চিকিৎসক, টমাস সিডেনহাম; ইনি আমাশার চিকিৎসায় আফিম ব্যবহার করার পরামর্শ দিতেন।

আফিম ছিল আর অচিরে এটিও যন্ত্রণা ও সর্দিকাশির জনপ্রিয় ওষুধ হয়ে উঠেছিল।

সিডেনহামের কার্যকালের প্রায় 100 বছর আগে সুইশ চিকিৎসক প্যারাসেলসাস (1493-1541)—এঁকে 'ঔষধশাস্ত্রের-লুথার' বলা হত— আফিমকে 'অমরত্বের প্রস্তর খণ্ড' নামে অভিহিত করেন। তিনি নিজেও একজন ঘোর আফিমখোর ছিলেন। তিনি একবার গর্ব করে বলেছিলেন, "আমি একটি গোপন ওষুধের কথা জানি যার নাম লডেনাম। এটি সবার সেরা ওষুধ।"



চিত্র 11. সুইশ চিকিৎসক প্যারাসেলসাস যিনি আফিমকে 'অমরত্বের প্রস্তরখণ্ড' নামে অভিহিত করেন।

তিন শতাব্দী পরে প্রখ্যাত মার্কিন চিকিৎসক অলিভার ওয়েন্ডেল হোমসও (1809-1894) আফিমের স্তুতি গাইতেন। তিনি বলেছিলেন। "আমার মনে হয় বিশ্বস্রষ্টা নিজেই মানুষকে আফিম খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা প্রায়শই তাঁর সৃষ্ট ভুট্টাখেতের আশেপাশে লাল টুক্‌টুকে পপি ফুল ফুটে থাকতে দেখি। আসলে স্রষ্টা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন, মানুষের ক্ষুধানিবৃত্তির যেমন প্রয়োজন আছে ঠিক তেমনই যন্ত্রণা নিবারণেরও ওষুধ চাই।" প্রখ্যাত ইঙ্গ-কানাডিয়ান চিকিৎসক উইলিয়াম অসলার (1849-1919) আবার এককাঠি এগিয়ে আফিমকে 'ঈশ্বরের নিজস্ব ওষুধ' আখ্যায় ভূষিত করেন।

আফিমের নেশায় যেসব সাহিত্যিকরা মশ্‌গুল ছিলেন, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে সুবিখ্যাত ব্রিটিশ কবি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের নাম উল্লেখ করতে হয়। কথিত আছে যে তাঁর সেরা কবিতা 'কুবলাই খান' (এটিই তাঁকে খ্যাতির চূড়ায় বসিয়েছিল) রচিত হয়েছিল আফিমের ঘোরে। মাঝে মধ্যে আফিমখোরদের আচরণ খুব বিচিত্র হয়। এদের আফিম খাওয়া থেকে নিবৃত্ত করলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে অথচ আফিম পাওয়া মাত্র এরা সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে আরম্ভ করে। বিংশ শতাব্দীর আগে মানুষ আফিমের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে



চিত্র 12. প্রখ্যাত মার্কিন চিকিৎসক ওলিভার ওয়েন্ডেল হোমস আফিমকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ মনে করতেন।

ওয়াকিবহাল ছিল না। এর আগে আফিমের নেশাকে লোকে ঘৃণার চক্ষে তো কখনই দেখত না বরঞ্চ এটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। 1797 সালের এক গ্রীষ্মের দিনে মহাকবি কোলরিজ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে তার খামারবাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁর ডাক্তার তাকে এমন একটি ওষুধ দেন, যার প্রধান উপাদান আফিম। ওষুধটি খাওয়ামাত্র তিনি তাঁর চেয়ারে বসে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েন। টানা তিন ঘণ্টা পরে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন এবং সেই ঘুমের মাঝেই স্বপ্ন হয়ে ফুটে উঠেছিল সম্পূর্ণ 'কুবলাই খান' কবিতাটি। ঘুম ভাঙা মাত্র কোলরিজ খাতা কলম টেনে নিয়ে কবিতাটি লিখতে বসে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জনৈক ব্যক্তি ঠিক সেই মুহূর্তে কোন বিশেষ প্রয়োজনে কোলরিজের কাছে এসে হাজির হয়। কবিকে ঘণ্টাখানেক তার সাথে বাক্যালাপ চালিয়ে যেতে হয়। লোকটি চলে যাওয়ার পর হতাশ হয়ে কোলরিজ তার সেই হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের স্মৃতি হাতড়াতে থাকেন। তার নিজের ভাষায় বর্ণনা করলে, "মনে হল শান্ত নদীর জলের উপর পড়া স্থির প্রতিচ্ছবিটাকে যেন কেউ ঢিল মেরে ভেঙে চুরমার করে দিল, সেই অপূর্ব ছবিটা আর খুঁজে পেলাম না।" শেষ জীবনে কোলরিজ একজন ওস্তাদ আফিমখোর হয়ে উঠেছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "লডেনাম আমাকে এক স্বর্গীয় বিশ্রামের অনুভূতি দেয়, ঘুম নয়; কিন্তু তোমরা বুঝবে না এই বিশ্রামে কি প্রশান্তি। বিশ্রামের সেই স্থলটি যে বালুকারাশির মাঝে ঝর্ণার তলায় সবুজ আর ফুলে ঘেরা একটি ছোট্ট স্থল।" ব্রিটিশ সমালোচক স্যার লেসলি স্টিফেন লিখেছিলেন, "আফিম-বিহীন কোলরিজের কথা যেন ঠিক প্রেতাত্মা বিহীন হ্যামলেটের উপাখ্যান।"

প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রবন্ধ লেখক টমাস ডি কুইন্সি (1785-1859) মাত্র 19 বছর বয়সে আফিমের স্বাদ গ্রহণ করেন। তিনি তার স্নায়ুশূলগত ব্যথার ওষুধ হিসাবে

আফিম প্রয়োগ করতেন। আফিমের জগতে তার প্রবেশ ও নেশাগ্রস্ততা বর্ণনা করে 1822 সালে তিনি রচনা করেন 'কনফেশন্‌স অভ অ্যান ইংলিশ ওপিয়ম ইটার' (এক ইংরেজ আফিমখোরের স্বীকারোক্তি)। বইটিতে তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে আফিম খাওয়ার একঘণ্টার মধ্যে কিভাবে তার স্নায়ুশূলের ব্যথা সেরে গিয়েছিল এবং তিনি অদ্ভুত এক কল্পনার সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলেন। তাঁর এই স্বপ্নবিলাস চলেছিল বহু বছর। তাঁর বইটিতে তিনি আবেগপ্রবণভাবে লিখেছিলেন,"হে রহস্যময় ও শক্তিমান আফিম! তোমার হাতেই আছে স্বর্গে যাওয়ার চাবিকাঠি।" তিনি দাবি করেছিলেন যে আর কোন মাদকদ্রব্য মানুষকে এতটা মাতাল করতে পারে না। মদের নেশার সাথে আফিমের নেশার তুলনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'মদ্যপান করলে আনন্দের অনুভূতি ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তা এক অদ্ভুত শূন্যতা সৃষ্টি করে হারিয়ে যায়, আর আফিমের নেশা একবার চড়লে প্রায় আট-দশ ঘণ্টা নিশ্চিন্ত—নেশা প্রায় একই জায়গায় স্থানু হয়ে থাকে; মদ যেন আগুনের এক ক্ষণস্থায়ী ঝলক আর আফিমের নেশা একটি নিশ্চল মৃদু দীপ্তির মত।" শেষকালে অবশ্য ডি কুইন্সি আফিমের ক্ষতিকর দিকটি চিনতে পারেন এবং তাঁর বইটির তৃতীয় অংশের শিরোনাম দেন "আফিম খাওয়ার জ্বালা-যন্ত্রণা।" (উদ্ধৃত উক্তিগুলো অবশ্য বইটির দ্বিতীয় অংশ থেকে নেওয়া যার শিরোনাম ছিল "আফিম খাওয়ার সুখানুভূতি"। বইটির তৃতীয়ভাগে তিনি নিজের নেশাকে দুঃস্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এই নেশার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার অসাধ্য সংগ্রামের কথা বর্ণনা করেছেন। ধাপে ধাপে মাত্রা কমিয়ে ফেলতে তাঁকে অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি এই নেশার খপ্পর থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রখ্যাত আরো কয়েকজন আফিমের নেশায় আসক্ত ব্যক্তি হলেন ইংরাজ কবি টমাস শ্যাডওয়েল (1642-1692) ও জর্জ ক্র্যাব (1754-1832), ফ্রান্সিস টমসন (1859-1907) এবং আর্থার সাইমন্স (1865-1945) ফরাসী সুরকার হেক্টর বারলিওজ (1803-1869), মার্কিন ছোটগল্পের লেখক এড্‌গার অ্যালেন পো (1809-1849) ও আমেরিকান অভিনেত্রী বারবারা লা মার (1896-1926)। আফিমের নেশার আনন্দময় অনুভূতির সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত, আফিমের কালো ধোঁয়া যেভাবে মানবদেহের হৃদ্‌যন্ত্রে ও মজ্জায় মজ্জায় আলোড়ন তোলে, আর কোন নেশার সে ক্ষমতা নেই।" ফরাসী লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা জাঁ ককতাউ (1889-1962) এমন আফিমখোর ছিলেন যে আফিম ছাড়া তিনি সাহিত্য রচনা বা চলচ্চিত্র-পরিচালনা কোনটাই করতে পারতেন না। একবার তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েন—আফিম খাওয়া তো দূরের কথা, বহুদিন ঘুমোতে বা খেতে পারেননি। কিন্তু আফিমের অভাবে তাঁর গলা শুকিয়ে আসে। শেষকালে

একজন তাঁর মুখে খানিকটা আফিমের ধোঁয়া দিয়েছিলেন আর তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিলেন—যেন ঠিক মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। এর ঠিক পরমুহূর্তেই তিনি নিদারুণ উৎসাহে, কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে ভরপুর একটি কবিতা রচনা করেন।

কিছু অদ্ভুত আচরণ

একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে আফিম যৌন-প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করে। এই বিশ্বাসে বহু যুবক নিয়মিতভাবে এই মাদকদ্রব্যটি সেবন করে। কখনো কখনো বেপরোয়া কাজকর্ম শুরু করার আগেও আফিম খাওয়ার প্রচলন আছে। কারণ এটি স্নায়ুকে স্থির রাখতে সাহায্য করে। কথিত আছে যে এককালে প্রয়াত স্বামীর চিতায় আরোহণের আগে সতীদের বলপূর্বক আফিমের নেশায় বুঁদ করে দেওয়া হত। রাজপুত সৈনিকরাও নাকি যুদ্ধযাত্রার আগে এই দ্রব্যটি খেয়ে নিত। 1546 সালে ফরাসী প্রকৃতিবিদ্ বেলোঁ লিখেছিলেন, "তুর্কিরা আফিম সেবন করে কারণ তারা মনে করে যে এই বস্তুটি তাদের দুঃসাহসী ও নির্ভীক করে তোলে। তারা যুদ্ধের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে না। তাই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আফিম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়।"

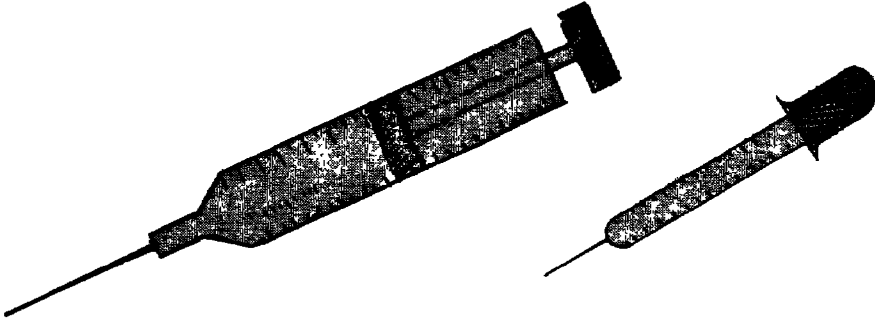
তিন

মাদক দ্রব্যের রাজা আফিম

আফিম সেবনের হাজারো পদ্ধতি আছে। গত শতাব্দী অবধি বহু লোক চিবিয়েই আফিমের পাতা খেত। সার্টার্নার সাহেব আফিমের প্রধান উপাদান 'মরফিন' আবিষ্কারের পর লোকে আফিম খাওয়ার পদ্ধতি পাল্টে ফেলে। এর পর একে একে আফিমের উপক্ষারগুলি আবিষ্কৃত হতে থাকে। লোকে তাদের পছন্দসই উপক্ষারগুলি পৃথক-পৃথক ভাবে খেতে শুরু করে। 1817 সালে ফরাসী রসায়নবিদ পিয়ের জাঁ রোবিকেট (1780-1840) আফিম থেকে নেস্কোপিন বিচ্ছিন্ন করেন আর 1832 সালে কোডিন নামের আরেকটি উপক্ষার পৃথক করেন।

1835 সালে পিয়ের জোসেফ পেলেটিয়ার (1788-1842) নামের ফরাসী রসায়নবিদ আফিম থেকে থিবাইন নামের একটি পদার্থ বিচ্ছিন্ন করেন। আফিম থেকে মরফিন পৃথকীকরণের পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকেই বিজ্ঞানীমহলে উপক্ষার সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সুদক্ষ রসায়নবিদ মাত্রই নানা উদ্ভিদ থেকে উপক্ষার পৃথক করার চেষ্টা করতেন। অবশ্য শুধুমাত্র আবিষ্কারের নেশাতে মেতে উঠে এরা আগ্রহী হন নি, বস্তুতপক্ষে উপক্ষারগুলি বহুমূল্য ভেষজও ছিল যা সম্পূর্ণ উদ্ভিদটির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হত। পেলেটিয়ার, আরো একজন ফরাসী ঔষধতত্ত্ববিদ, জোসেফ ক্যাভেনটাউএর (1795-1878) সহযোগিতায় 1818 থেকে 1820 সালের মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে একাধিক উপক্ষার বিচ্ছিন্ন করেন। সিঙ্কোনা থেকে কুইনিন, নাক্সভমিকা থেকে স্ট্রিকনিন্ আর ক্যাফিন থেকে কফি — এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভেষজ। 1848 সালে প্রখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ জর্জ মার্ক (1815-1888) কাঁচা আফিম থেকে প্যাপাভেরিন নিঃসৃত করেন।

1853 সালে ফরাসী চিকিৎসক চার্লস্ গ্যাব্রিয়েল প্রাভাজ (1791-1853) একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন। এটি হল ধাতব সিরিঞ্জের আবিষ্কার—যার অগ্রভাগে একটি ফাঁপা সূচ থাকত। এটি সেই হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ যার সাহায্যে ডাক্তাররা



চিত্র 13· ফরাসী চিকিৎসক প্রাভাজ প্রথম ব্যবহারযোগ্য ধাতব সিরিঞ্জ আবিষ্কার করেন।

(আসক্তরাও এটি ব্যবহার করত) সোজাসুজি ত্বকের নীচে রক্তবাহী নালিকাগুলিতে মরফিন প্রবেশ করাতেন। এতে ড্রাগের প্রভাব খুব দ্রুত হত যা কাঁচা আফিম খেলে কখনই হত না। সেই 1656 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী রেন (1623-1723) একটি ফাঁপা পালকের অগ্রভাগের সাহায্যে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাণীর মূত্রথলিতে সরাসরি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই পদ্ধতি কখনই জনপ্রিয় হয় নি। স্কটিশ চিকিৎসক আলেকজান্ডার উড (1817-1884) সর্বপ্রথম ত্বকের তলায় নবআবিষ্কৃত হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের সাহায্যে সরাসরি চামড়ার নীচে মরফিন প্রবেশ করান (প্রসঙ্গত এই পরীক্ষাটি তিনি সর্বপ্রথম তাঁর স্ত্রীর উপর করেন)। 1855 সালে এই আবিষ্কারের সংবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় আর সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এর কথা জানতে পারে। এই ঘটনার ঠিক পরেই আমেরিকার গৃহযুদ্ধে (1861) ব্যাপকভাবে মরফিন প্রয়োগ করা হয় — শুধু ব্যথা বেদনার উপশমের জন্য নয়, আমাশার ওষুধ হিসাবেও। এর ফলে বহু



চিত্র 14: ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার রেন প্রথম সিরিঞ্জ জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করেন।

যুদ্ধ ফেরত ব্যক্তি সাধারণ জীবনে ফিরে এসে এই ড্রাগের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। এদের অবস্থাকে লোকে "যোদ্ধাদের রোগ" বা "সেনাবাহিনীর ব্যাধি" নামে অভিহিত করত।

হেরোইন ঃ বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ

দুটি ব্যাপার নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্পষ্ট বোঝা গেছে : মরফিন একদিকে যেমন একটি অব্যর্থ যন্ত্রণাহরণকারী ওষুধ তেমন অপরদিকে একটি মাদকদ্রব্য। তাই দেখা যেত যখনই কোন রুগীর যন্ত্রণা দূর করার জন্য দীর্ঘদিন (ধরা যাক একমাস) মরফিন প্রয়োগ করা হত, রুগীরা এই দ্রব্যটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত। সুতরাং এই নেশা একটি প্রয়োজনীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিজ্ঞানীরা মরফিন অণুর গঠনে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল যে মরফিন অণুর একটি ভাগ যন্ত্রণা নিবারণ করে ও আরেকটি ভাগ নেশার জন্য দায়ী। তারা কি নেশাসৃষ্টিকারী অংশটিকে পালটাতে বা সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল? 1898 সালে জার্মান রসায়নবিদ্ হাইনরিখ ড্রেসার, মরফিনের সাথে একটি সস্তা ও সহজলভ্য রাসায়নিক — অ্যাসিটিক অ্যান্হাইড্রাইডের — বিক্রিয়া ঘটিয়ে ছিলেন। এর ফলে আরেকটি শক্তিশালী রাসায়নিকের সৃষ্টি হয়েছিল, যার নাম ডাইঅ্যাসিটাইল মরফিন। এই দ্রব্যটি ব্যবহার করলে মানুষের মনে একটি রাজকীয় অনুভূতি আসত আর সে নিজেকে হিরো বা হিরোইন মনে করত। তাই এর নাম হল হেরোইন (ইংরাজি বানান Heroine এর 'e' শব্দটি অবশ্য বাদ গেল)। আজকাল বেশির ভাগ মাদকাসক্ত এই হেরোইন নেয়।

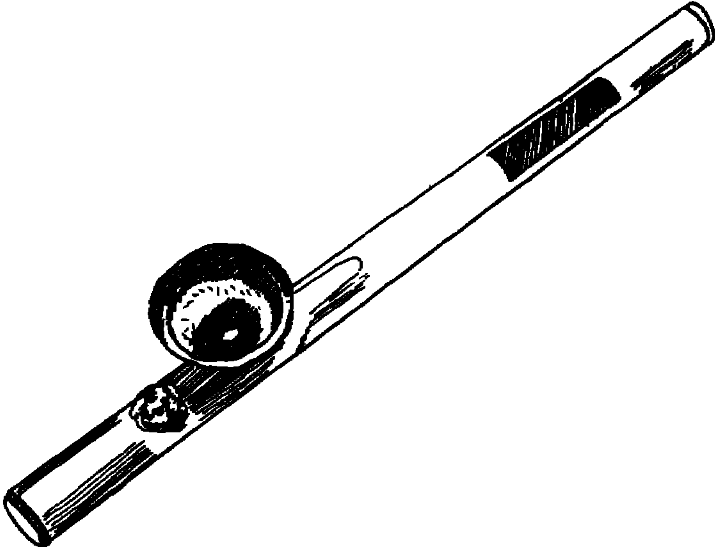
আবিষ্কারের পর পর অবশ্য হেরোইন নেশা ছাড়ানোর ওষুধ হিসাবে কাজে লাগানো হত। সমসাময়িক বিজ্ঞানীরাও একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে ড্রেসার আবিষ্কৃত হেরোইন এমন একটি যন্ত্রণা নিবারক ওষুধ যার প্রতি কখনই নেশা আসতে পারে না। কিন্তু সকলকে হতাশ করে, হেরোইন মরফিনের চেয়েও ভয়ঙ্কর মাদক দ্রব্যে পরিণত হয়। এর প্রতি লোকের তীব্র নেশা হতে থাকে — নেশায় আসক্ত ব্যক্তি আকুল হয়ে হেরোইনের আশায় বসে থাকে এবং এটি শিরায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত এরা মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। এটি পাওয়ামাত্র সে প্রবল উৎসাহে কাজে মেতে ওঠে। কোন কোন হেরোইনে আসক্ত ব্যক্তি এই অনুভূতিকে যৌন সম্ভোগের চরম আনন্দের সাথে তুলনা করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে হেরোইন কখনই শক্তি বর্ধক নয়। একজন সুস্থ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির দেহে হেরোইন প্রবেশ করালে সে কখনই বেশি কাজ করতে পারে না। কিন্তু মাদকাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি শক্তিবর্ধকের কাজ করে কারণ হেরোইন তার দেহে ইতিমধ্যেই একটি অদ্ভুত সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলে। আসক্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা কিন্তু একজন স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক কম হয়।

আফিমের ধূমপান

হাইপোডারমিক ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ আবিষ্কার হওয়ার আগে লোকে ধূমপানের মাধ্যমে আফিম সেবন করত (আজও বহু স্থানে লোকে এভাবেই আফিম সেবন করে)। এভাবে আফিম খাওয়ার পদ্ধতিকে চান্দু বা মাদ্দক বলা হত আর গ্রামে গঞ্জে লোকে খুব অদ্ভুত উপায়ে এটি তৈরী করত। একটি পাত্রে কাঁচা আফিম বা তার আঠা রেখে যথেষ্ট পরিমাণে জল মিশিয়ে তাতে ঢাকনা এঁটে দেওয়া হয়। এরপর আফিমকে জলে সেদ্ধ করে একটি দ্রবণ তৈরী করা হয়। এর পরে একটি সূক্ষ্ম ছাঁকনি দিয়ে ক্বাথটি ছেঁকে তরলটি থেকে আফিম গাছের ডালপালা আর মিশে থাকা নুড়ি ও আবর্জনা আলাদা করে ফেলা হয়। কোন কিছুই ফেলা যায় না। এগুলিকে আরো কয়েকবার সেদ্ধ করে আবার ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করে বাকি আফিমটুকু বের করে নেওয়া হয়। এইভাবে ছাঁকা অবিশুদ্ধ অংশটি থেকে আফিমের প্রায় প্রতিটি বিন্দু পৃথক করে দ্রবণটিকে মৃদু আঁচে বসিয়ে রাখা হয়। পুরো জলটা শুকিয়ে যাওয়ার পর একটি গাঢ় কালো আঠালো পদার্থ থেকে যায়। একে 'তৈরী আফিম' 'ধূমপানের আফিম','রান্না করা আফিম', 'চান্দু বা মাদ্দক' বলে। 100 গ্রাম কাঁচা আফিম থেকে প্রায় 75 গ্রাম 'তৈরী আফিম' পাওয়া যায়।

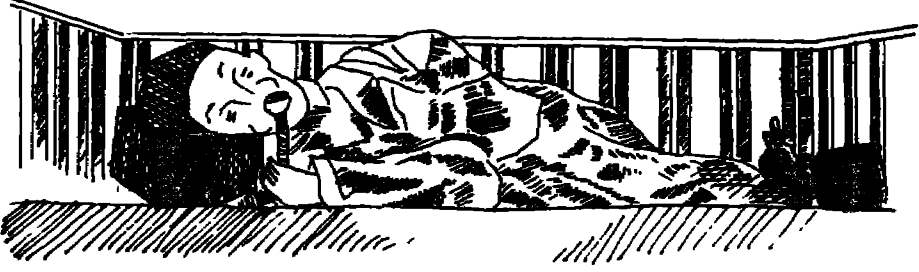
আফিম সেবনের নানা বিচিত্র আচারবিধি

বিশেষ ধরনের কাঠের নলের সাহায্যে 'চান্দু' ধূমপান করা হয়। নলটিতে একটি বাটি লাগানো থাকে যাতে চাপা আগুনে শিখাহীনভাবে জ্বলতে থাকে আর মৃদু ধোঁয়া নির্গত করতে থাকে। এই ধোঁয়াই লোকে আনন্দের সাথে সেবন করতে থাকে। প্রথম কয়েকটা টান দারুণ এক উত্তেজনার অনুভূতি এনে দেয়। চীনদেশে এবং পৃথিবীর অন্য কয়েকটি অঞ্চলে আফিমের আখড়া পাওয়া যায় যেখানে মানুষ দল বেঁধে এসে আফিম খায়। এই আফিমের আখড়াগুলি অনেকটা আধুনিক বারের মত — যেখানে মদের বদলে আফিম পরিবেশন করা হয়। আধুনিক কালে নেশাখোরেরা আফিম আর কাঠের নলের পরিবর্তে হেরোইন আর হাইপোডার্মিক সুচ বেছে নিয়েছে। আফিম ধূমপায়ীরা, নিজেদের, হেরোইনের নেশাসক্ত ব্যক্তিদের থেকে 'উন্নত স্তরের' মনে করে। আজও বহু লোক দলবেঁধে নিষ্ঠা সহকারে নলের সাহায্যে আফিমের ধূমপান করে। এই অনুষ্ঠানগুলির সভাপতিত্ব করেন একজন 'শেফ' বা রন্ধনবিশারদ। এই ব্যক্তি দক্ষ হাতে পাকিয়ে পাকিয়ে আফিমের বড়ি তৈরী করেন। এই ব্যক্তি এও জানেন যে কিভাবে নলটিকে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে হয়।



চিত্র 15 আফিম খাওয়ার বিশেষ কাঠের ফাঁপা নল।

এই ধরনের আনুষ্ঠানিক ধূমপান সবচেয়ে বেশি হয় চীনে। সেখানে বিচিত্র পদ্ধতিতে ধূমপায়ীরা পাশ ফিরে মেঝেতে শুয়ে থাকে আর একে অপরের দিকে নলটি বাড়িয়ে দেয়। আদর্শ অবস্থানটি এমন যাতে একজন ধূমপায়ীর মাথা আরেকজনের পেটের কাছে শোওয়ানো থাকে। প্রতিটি বড়ি (চীনা ভাষায় ইয়েন পোক) 30 সেকেন্ড থেকে 3 মিনিট পর্যন্ত চলে। একটি সাধারণ ধূমপায়ীর সন্তুষ্টি আসতে ছয় থেকে দশটি বড়ি লাগে। এই আফিমের আড্ডাগুলিতে লোকে নানা বাস্তবিক ও কাল্পনিক অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকে। বহু স্বভাবগত শান্তশিষ্ট ও স্বল্পবাক লোকেরাও মন প্রাণ খুলে গল্প ফাঁদে। জ্বলন্ত আফিম থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে নলের গায়ে আটকানো বাটির মধ্যে ঘন হয়ে জমতে থাকে। এই ধোঁয়া নলে এবং নলের গায়ে লাগানো ন্যাকড়াতেও গিয়ে পৌঁছয়। এই ন্যাকড়াটি নলের গায়ে এমনভাবে লাগানো থাকে যেন ঠিক ঘোড়ার পিঠে আটকানো জিন বা গদি। আফিম জ্বলে যাওয়ার পরে যে অংশটুকু ছাই হয়ে পড়ে থাকে, তাকে চীনারা 'ইয়েন শি' বা 'আফিমের-আবর্জনা' বলে। এই ছাই-এর মধ্যে উপক্ষারের কিছু অংশ থেকে যায়। ধূমপান শেষ হয়ে গেলে নল থেকে অবশিষ্টাংশ চেঁছে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া হয়। কখনো আফিমের আকাল পড়লে এই অবশিষ্টাংশ কাজে লেগে যায়। কখনো কখনো আফিমে এই আবর্জনা টাটকা আফিমে মেশানো হয়, কখনো বা মদে (বা ওই জাতীয় পানীয়ে) মিশিয়ে পান করা হয়। এর দ্রবণ তৈরী করে সরাসরি পান করা যায়, আবার ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শিরাতেও প্রবেশ করানো যায়। এই দ্রবণটিকে 'ইয়েন সি সুই' বলে। এটি প্রস্তুত



চিত্র 16: আফিম খাওয়ার বিচিত্র চীনা পদ্ধতি।

আফিমের অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর বিকল্প। নেহাত খুব অভাব না থাকলে আফিমখোরেরা এটি ব্যবহার করে না।

নেশা নিয়ন্ত্রণে আইনি ব্যবস্থা

এককালে আফিমের নেশা এদেশে দৈত্যাকার রূপ ধারণ করে। ফলে তৎকালীন গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল 1933 সালের জুন মাসে 'বেঙ্গল ওপিয়াম স্মোকিং অ্যাক্ট' নামের একটি আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন অনুযায়ী ধূমপায়ীদের নিজেদের নাম নথিভুক্ত করাতে হত এবং আবগারী দপ্তর থেকে অনুমতিপত্র যোগাড় করতে হত। অনুমতি ছাড়া কেউ ধূমপান করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হত। দোষ প্রমাণিত হলে ছ'মাসের কারাদণ্ড ও জরিমানা হত। আফিম অনুসন্ধান সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি মাত্র 3-4 গ্রাম আফিম কাছে রাখতে পারত। এর আগে এই সীমা 11 গ্রামে বাঁধা ছিল। একটু বেশি পরিমাণ (প্রায় 5 গ্রাম) কিনতে গেলে আবগারী দপ্তরের বিশেষ অনুমতি লাগত। এই অনুমতি পত্রগুলি ডাক্তারের সার্টিফিকেট না দেখালে পাওয়া যেত না। বিক্রেতারাও এটি ছাড়া কখনই 5 গ্রামের বেশি আফিম বেচতে পারত না। বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও এই আইন চালু করা হয়। বর্তমানে এই সব আইনগুলির স্থানে একটি বিস্তৃত আইন চালু আছে যা 'নারকোটিক ড্রাগ্স এন্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সের অ্যাক্ট' 1985 নামে পরিচিত। এই আইনটি শুধু আফিমই নয় অন্যান্য মাদক দ্রব্যের নেশাও নিয়ন্ত্রণ করে।

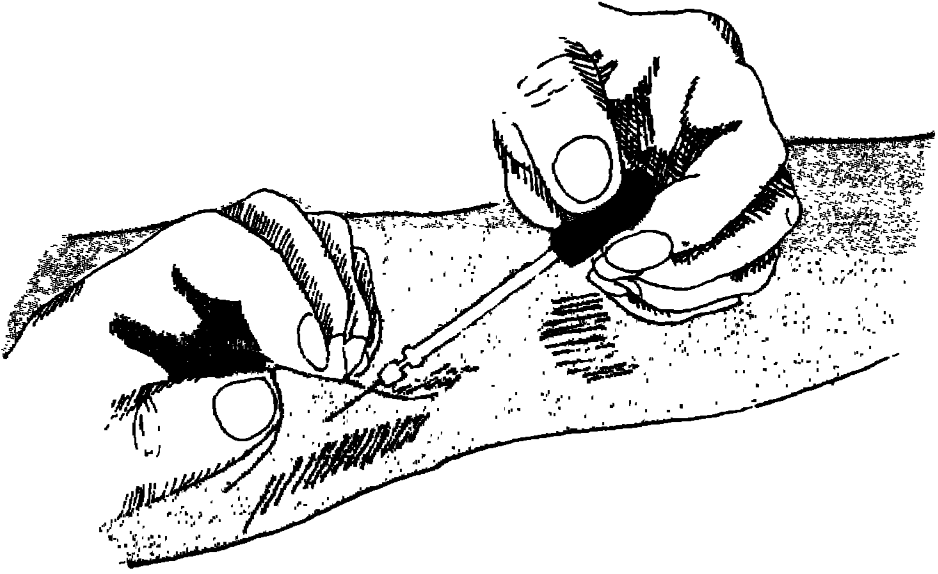
আজকাল নেশাখোরেরা খুব সহজে কাঁচা আফিম পায় না। হেরোইনের নেশায় আসক্ত লোকেরা কালোবাজারীদের কাছ থেকে ছোট ছোট 100 মিলিগ্রাম ওজনের প্লাস্টিকের হেরোইনের প্যাকেট কেনে। হেরোইন একটি সাদা কেলাসের পাউডার যা অনেকটা বেকিং সোডার (কেক বা রুটি ফোলাতে এই রাসায়নিক লাগে) মত দেখতে হয় কিন্তু স্বাদে তেতো হয়। এগুলি বেআইনি লেবরেটরিতে তৈরী হয়। প্রথমে এগুলি খুবই খাঁটি থাকে কিন্তু কালোবাজারীদের হাতে-হাতে ঘুরতে ঘুরতে

শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়। এই অসৎ ব্যবসায়ীরা বেশি লাভের আশায় ভেজাল মেশাতে থাকে। গুঁড়ো দুধ, গায়ে মাখার পাউডার আর কুইনিনের গুঁড়ো সাধারণত ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কুইনিন মেশানোর সুবিধা এই যে এটি শুধু দেখতেই হেরোইনের মত নয়, এর স্বাদটাও হেরোইনের মত তেতো। গুঁড়ো দুধ আর গায়ে মাখার পাউডার মেশালে ধরা পড়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা থেকে যায়। নেশাখোরেরা অবশ্য ভেজাল না খাঁটি, এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। কোন ব্যবসায়ী আবার হেরোইনে গুড় মিশিয়ে বিক্রি করে। এর থেকেই হেরোইনের চলতি নাম 'ব্রাউন সুগারের' উৎপত্তি। যাবতীয় ভেজাল মিশিয়ে নেশাখোরের কাছে পৌঁছয় এই 'ব্রাউন সুগার'। এই নামটি থেকেই বোঝা যায় যে দশ হাত ফেরত যে হেরোইন নেশাখোরের হাতে পৌঁছয়, তাতে আসল জিনিস থাকে মাত্র 3-5 শতাংশ। যত লোকের হাতে যায় প্রায় প্রত্যেকেই প্রায় সমপরিমাণে ভেজাল মিশিয়ে ছাড়ে। পদ্ধতিটি অনেকটা এই রকম—প্রথম ব্যবসায়ীর হাতে আসে 100 শতাংশ খাঁটি হেরোইন; এর প্রায় 28 গ্রামের সাথে 28 গ্রাম গুঁড়ো দুধ (বা অন্য কিছু) মেশানো হয়, যার ফলে 56 গ্রাম ওজনের 50 শতাংশ খাঁটি হেরোইন থেকে যায়; দ্বিতীয় ব্যবসায়ী 56 গ্রাম ভেজাল মিশিয়ে 112 গ্রাম 25 শতাংশ হেরোইন তৈরী করে। এইভাবে পাঁচ হাত ঘুরে, 896 গ্রাম গুঁড়োতে মাত্র 3 শতাংশ খাঁটি হেরোইন থাকে।

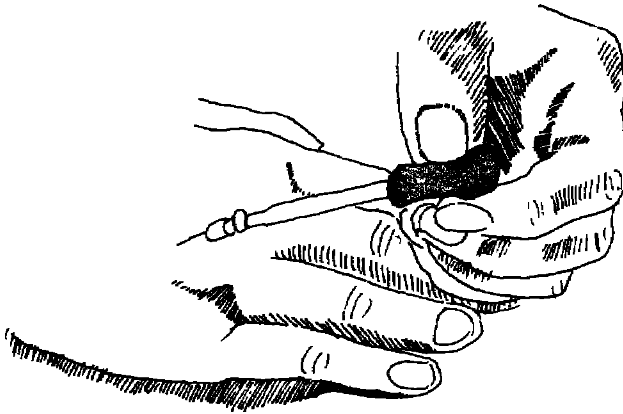
হেরোইন নেওয়ার নানা পদ্ধতি

নেশাখোরেরা নানা ভাবে নিজে নিজেই হেরোইন নিয়ে থাকে ঃ কেউ গিলে খায়, কেউ নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শোঁকে, কেউবা চামড়ার নীচে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে (অনেকে একে 'স্কিন পপিং' বলে কারণ এক্ষেত্রে চামড়াকে তুলে দিয়ে হেরোইন প্রবেশ করানো হয়) বা সরাসরি ইঞ্জেকশনের সাহায্যে শিরায় প্রবেশ করিয়ে দেয় (একে মেইনলাইন করা বলে কারণ সরাসরি মেইন লাইন বা প্রধান শাখার সাহায্যে যোগাযোগ ঘটানো হয়)। এদেশের বহু গরিব লোক ধূমপানের মাধ্যমে এই মাদক গ্রহণ করে থাকে—যাকে চলতি কথায় একে 'চেসিং দ্য ড্রাগন' বা 'ড্রাগনের পিছনে ধাওয়া করা' বোঝায়। ড্রাগন তাড়া করতে হলে সিগারেটের প্যাকেটের রাংতা লাগে। রাংতার উপর সরলরেখা বরাবর সাদা গুঁড়োকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আরেকটা রাংতার টুকরো দিয়ে নেশাড়ুরা কাগজের নল বা স্ট্র তৈরী করে। এরপর সাদা গুঁড়োর ঠিক তলায় (রাংতার নীচে) একটি জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির শিখা ধরে থাকে। এবার স্ট্রটা মুখে দিয়ে তার অপর প্রান্ত উত্তপ্ত গুঁড়োর কয়েক মিলিমিটার উঁচুতে ধরে থাকে। গুঁড়ো থেকে হেরোইনের ধোঁয়া উঠতে থাকে আর নেশাখোর স্ট্র দিয়ে তাতেই টান লাগায়। এইভাবে হেরোইনের গুঁড়োর তলায়, রাংতার নীচে — সরলরেখা বরাবর দেশলাইয়ে শিখাটিকে এগিয়ে পিছিয়ে নেওয়া হয়। নেশাখোর

কিন্তু সমানে উন্মত্তের মত স্ট্রয়ে টান মারতে থাকে। হেরোইন খাওয়ার এই উদ্ভট পদ্ধতিকেই বলে ড্রাগনকে তাড়া করা। ওস্তাদ নেশাড়ুরা আবার টান দেওয়ার সময় আট-আনার একটা পয়সা ঠোঁটে চেপে রাখে। এভাবে তারা ভেজাল বস্তুকে 'ছেঁকে নেয়। যখন নেশাড়ুর ড্রাগের ভাঁড়ার শূন্য হয়ে যায় তখন এই আট আনার মুদ্রা চেঁছে নিয়ে তার নেশা চালু রাখে।



চিত্র 17 (ক) স্কিন পপিং—চামড়া তুলে ঠিক তার নীচে মাদক দ্রব্য প্রবেশ করানো হয়।



চিত্র 17: (খ) মেইন লাইনিং—সরাসরি শিরায় ড্রাগ পাঠানো।

তবে হাইপোডার্মিক সুচের মাধ্যমে হেরোইন নেওয়ার পদ্ধতি অনেক বেশি জনপ্রিয়। ড্রাগ খেলে বা শুঁকে নিলে যে আমেজ আসে তার থেকে সরাসরি শিরায় প্রবেশ করানো বহু গুণ বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। এর কারণ পেটের ভিতরের পাচন রসগুলি ড্রাগের প্রভাবে খানিকটা নষ্ট করে দেয়। পেটের মধ্যে তো ড্রাগের বিশ্লেষণ ঘটেই, তাছাড়া এর পরের ধাপে লিভারে (যকৃত) পৌঁছে অবশিষ্ট ড্রাগের আরো ভাঙচুর হয়। এজন্য ডাক্তারেরা রুগীদের মরফিন দিতে হলে সরাসরি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেয়। প্রথম দিকে যে সব নেশাড়ুর ইঞ্জেকশনের সুচের প্রতি একটা ভয় থাকে তারাই হেরোইন খায় বা ঘ্রাণের মাধ্যমে নেয়। অবশ্য শেষকালে সবাই সুচ ব্যবহার করতে থাকে।

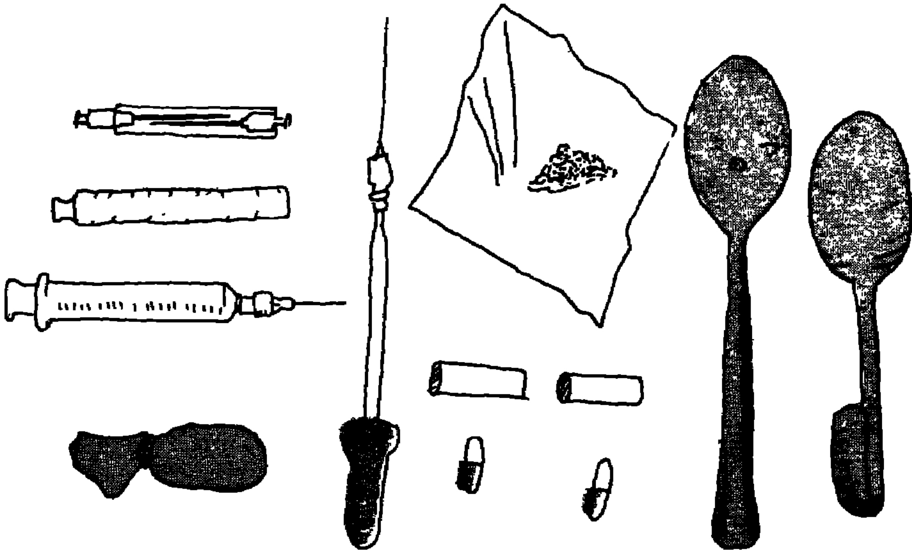
মেইন লাইনিং বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি

মেইন লাইনিং বা 'প্রত্যক্ষ পদ্ধতিই' ড্রাগ আসক্তির সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক। এ পদ্ধতিতে আসক্তরা নানা বিচিত্র সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করে। এই সরঞ্জামগুলিকে তারা 'সাজসজ্জা' 'কাজের জিনিস' 'খেলনাবাটি' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করে থাকে। এই সাজ-সরঞ্জামের অঙ্গ হল চামচ, মদের বোতলের ছিপি কিংবা 'কুকার' নামের একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রটি জলে মিশিয়ে হেরোইনকে উত্তপ্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কখনো চামচের হাতলটা বাঁকিয়ে দু'ফেরতা করে দেওয়া হয় যাতে সেটা টেবিলের বা মেঝের উপর সোজা করে রাখা যায়। সিরিঞ্জ বা ফাঁপা সুচ (চলতি ভাষায় স্পাইক) যেমন ব্যবসায়িকভাবে তৈরী করা হয় তেমনি চোখের ওষুধের ড্রপারের সাহায্যে বাড়িতেই তৈরী করা যায়। ড্রপারের ফাঁপা নলে সুচটা ফিট করে দেওয়া হয়। আঁটসাঁট ভাবে লাগানোর জন্য মাঝে মাঝে 'গ্যাসকেট' বা



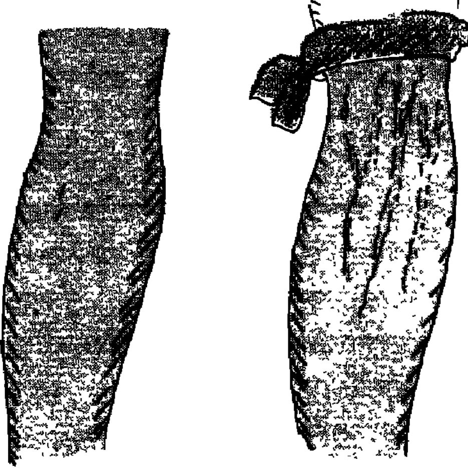
চিত্র 14. হেরোইন নেওয়ার বিচিত্র ভারতীয় পদ্ধতি।

'গ্যাফ' লাগানো হয়। এ কাজে কাগজ, সুতো, রবার কিংবা ফিতে ব্যবহার করা হয়। সব থেকে উপযুক্ত বস্তুটি হল আঁট করে জড়ানো টাকার নোট। এই নোট আংশিকভাবে জল-নিরোধক বলে খুব ভাল কাজে আসে। সুচটি যখন ব্যবহার করা হয় না তখন সেটিকে একটি আবরণী দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। সাধারণত দেশলাই বাক্সের কাগজের খোল গোল করে পাকিয়ে, গার্ডার বা রবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে, আবরণী তৈরী করা হয়। সাজসরঞ্জামের মধ্যে একটা ছোট্ট তুলোর একটা পিণ্ডও থাকে। এই তুলোর পিণ্ডটা হেরোইন পূর্ণ চামচ থেকে সিরিঞ্জের সাহায্যে টান লাগানোর সময়, ছাঁকনির কাজ করে। এইভাবে হেরোইনের থেকে 'বিষ' ছেঁকে আলাদা করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ছাঁকনিটিই নোংরা দ্রবণটিকে আরো দূষিত করে তোলে। আরো বিপদের কথা হল যে তুলোর পিণ্ড থেকে নোংরা রোঁয়া উঠে সিরিঞ্জে ঢুকে যায় আর নেশাড়ুর অজান্তে কখন সেগুলি শিরার মধ্যে চলে যায়। ফল হয় মারাত্মক, কারণ এই রোঁয়াগুলি শিরা বেয়ে শেষ পর্যন্ত ফুসফুসে গিয়ে হাজির হয়। এই তুলোর দলা বারবার ব্যবহার করা হয় আর ভাবতে খুবই অবাক লাগে কেন নেশাসক্তরা তবুও তুলোটাকে ছাঁকনি ভেবে আশ্বস্ত হয়। নেশাড়ুদের ড্রাগের ভাঁড়ারে টান পড়লে এই তুলোর দলাটাকেই জলে ভিজিয়ে সে একটা দ্রবণ তৈরী করে। এই তরলটিকে শিরায় চালান করে সে সাময়িক কাজ চালায়। বহু ব্যবহারের ফলে তুলোর পিণ্ডটার ওপর সত্যিই হেরোইনের একটা আস্তরণ পড়ে থাকে। এই সামান্য হেরোইন নেশাড়ুকে একটা ছোট্ট আমেজ এনে



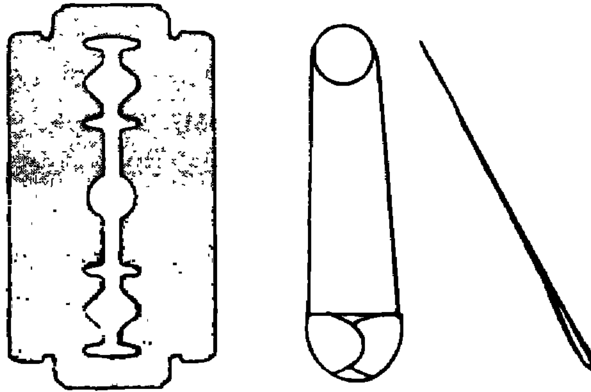
চিত্র 19 হেরোইন নেশাখোরের যন্ত্রপাতি।

দেয়। এই তলানি উজাড় করে নেশা করার পদ্ধতিকে আসক্তের ভাষায় "তুলোর টান মারা" বলে।



চিত্র 20 পাক-তাগা বা টুর্নিকেট : কষে বাঁধার পর শিরাগুলি ফুলে ওঠে।

পায়ে বা হাতে আষ্টেপৃষ্ঠে টাই, তোয়ালে, বেল্ট ইত্যাদি বেঁধে 'পাক-তাগা' বা শিরা-ধরার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে শিরাগুলো উঁচু ও স্পষ্ট হয়ে উঠিয়ে রাখা হয়। ডাক্তাররাও ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। কনুইয়ের সামান্য ওপরে পাক-তাগা বাঁধলে হাতের শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফুলে ওঠা শিরাতে ইঞ্জেকশনের সূচ ফোটানো খুব সহজ হয়। যারা হাইপোডার্মিক সূচ পায় না তারা সেফটি পিন, সেলাই করার সূচ—এমনকি দাড়ি কামানোর ব্লেডও ব্যবহার করে। এই ধারালো জিনিসগুলি দিয়ে শিরায় ছিদ্র করে চোখে ওষুধের ড্রপারের সাহায্যে মাদক দ্রব্য প্রবেশ করায়। বহু আসক্ত তাদের এই বিশেষ যন্ত্রপাতিগুলোকে একটি চামড়ার থলি বা ধাতুর-বাক্সে পুরে রাখে। এগুলি তাদের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। কিছু না পেলে মালমশলাগুলিকে একটা ফাঁকা সিগারেটের প্যাকেটে পুরে একটি

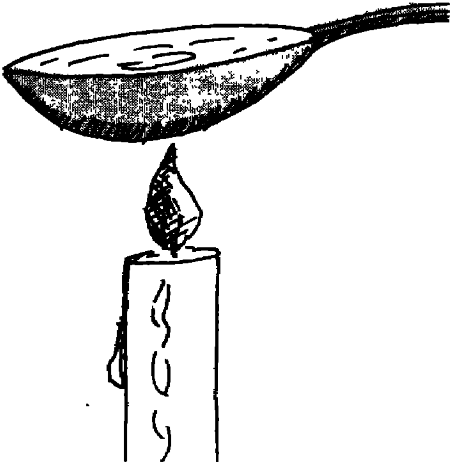


চিত্র 21. পাক্কা নেশাখোর হাতের কাছের যে কোন ধারালো জিনিস দিয়ে শিরায় ফুটো করে।

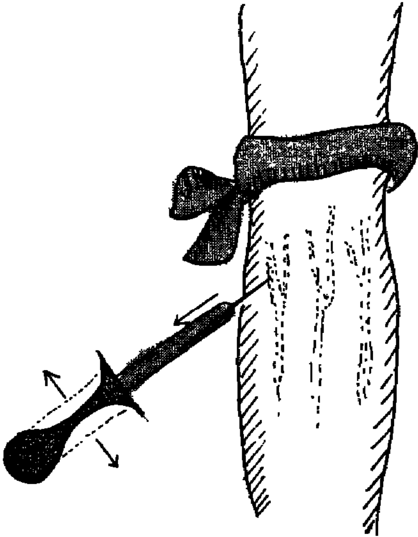
রবার ব্যান্ড দিয়ে এঁটে, নেশাড়ু তার বাড়ির সবচেয়ে অপরিচ্ছন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখে দেয়। লুকোবার সময় এরা নোংরা জায়গা বাছে কারণ বাড়ির কেউ সন্দেহ করলেও খোঁজার সময় খুব নোংরা জায়গাগুলিতে সাধারণত হাত দিতে চায় না।

ড্রাগ নেওয়ার উদ্ভট কৌশল

ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগে মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার কাগজের থলে বা স্যাশের (একে বেলুন বা বিন্ড্ল বলে) মালমশলা একটি 'কুকারে' ঢেলে দেয়। কুকারে জল ঢেলে মশলাটি গুলে তার নীচে একটি ছোট্ট আগুনের শিখা ধরতে হয়। বুদবুদ উঠতে থাকলে আগুনের উৎসটি সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর তরলটিকে একটু ঠাণ্ডা করে সিরিঞ্জের সাহায্যে তুলোর দলার মধ্যে দিয়ে টেনে নেওয়া হয়। এরপর কনুইয়ের উপর পাক-তাগা বেঁধে শিরার মধ্যে সুচ প্রবেশ করানো হয়। শিরাগুলোতে রক্তের ফোঁটা দেখা দেয় আর আস্তে আস্তে ড্রপারে উঠতে থাকে (রক্তের ফোঁটা দেখা দিলেই বোঝা যায় যে কাজ ঠিকঠাক এগোচ্ছে)। এইবার রক্তের ফোঁটাগুলিতে ড্রাগ মিশে গেলেই সেটাকে শিরার মধ্যে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাকা নেশাড়ু বারকয়েক শিরায় রক্ত পাঠিয়ে ভাল করে মাদকটি মিশিয়ে নেয় যাতে এক ফোঁটা ড্রাগও ড্রপারে পড়ে না থাকে। এ পদ্ধতিকে 'বুটিং' বলে। ইঞ্জেকশনের ফল হয় খুব দ্রুত ও তীব্র। আসক্তরা নানাভাবে এটির বর্ণনা দেয়। কেউ বলে যেন হাত বা পায়ের শিরাগুলি বেয়ে ছুটতে থাকে

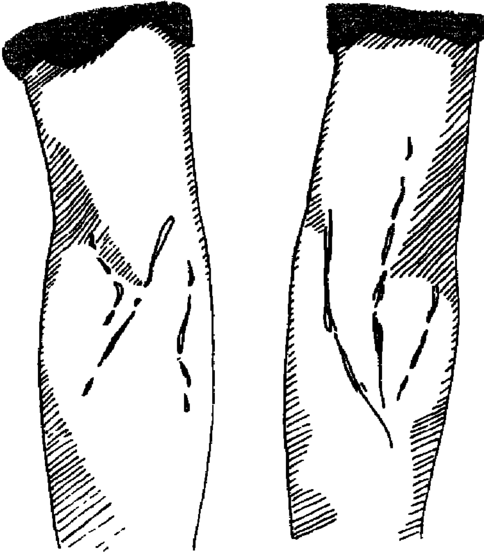


চিত্র 22 কুকার।



চিত্র 23: বুটিং : রক্ত সিরিঞ্জে টেনে আবার শিরায় পাঠানো হয়।

এক অদ্ভুত অনন্দময় শিহরণ যা পেটের কাছে গিয়ে স্থির হয়ে যায়। অনেকে একে যৌন উত্তেজনার চরম অনুভূতির সাথে তুলনা করে। এই অনুভূতি যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে তন্দ্রাচ্ছন্নতার জন্ম দেয়, কোন দায়-দায়িত্ব বা সমস্যার কথা মনে থাকে না। এই মানসিক অবস্থাই নেশাড়ুর একান্ত কাম্য বস্তু হয় আর সে চায় এই অবস্থা অনন্তকাল থাকুক।



চিত্র 24 নেশাখোরের কাটাছেঁড়া শিরা-উপশিরা।

প্রথমদিকে আসক্ত ব্যক্তি কনুইয়ের কাছের শিরায় ইঞ্জেকশনের সুচ ফোটাতে থাকে। বার-বার ইঞ্জেকশন দেওয়ার ফলে শিরাগুলি কুঁচকে যায় আর নেশাখোরকে নতুন শিরার সন্ধানে কনুইয়ের তলার দিকে অথবা হাতের উল্টোপিঠে সন্ধান করতে হয়। হাতের সব শিরা কুঁচকে উঠলে সে পায়ের দিকে ধাওয়া করে। পায়ের পাতা, হাঁটুর আশেপাশে, উরু ছাড়িয়ে শিরার খোঁজে সে শেষকালে কুঁচকির কাছাকাছি পৌঁছে যায়। পায়ের সব শিরা কুঁচকে উঠলে পর অনেক আসক্ত গলার শিরা, জিভ, এমন কি পুরুষাঙ্গের পৃষ্ঠের শিরায় ইঞ্জেকশন নেয়। একজন হেরোইন আসক্ত ব্যক্তিকে তার শিরা দেখলে সহজেই চেনা যায়। মহিলা নেশাড়ুরা প্রয়োজনে স্তনের তলায় ইঞ্জেকশন নিতেও ঘাবড়ায় না। যখন দেহের প্রায় প্রতিটি শিরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন সে এলোপাথাড়ি ভাবে বুকে, পেটে, নিতম্বে, উরুতে এমনকি আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ইঞ্জেকশন দিতে থাকে।

ক্ষেপণাস্ত্র

নেশাসক্তের হাতে কখনও কখনও এমন ভেজাল হেরোইন পৌঁছায় যাতে মারাত্মক বিষ স্ট্রিকনিন থেকে যায়। এই ভেজাল মাদক দ্রব্যকে 'হট শট' বা 'ক্ষেপণাস্ত্র' বলে কারণ এগুলি মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু ঘটাতে পারে। তিন থেকে পাঁচ শতাংশ বিশুদ্ধ



চিত্র 25: একসময়ে সম্পূর্ণ দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়।

হেরোইনে অভ্যস্ত ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ শুদ্ধ মাদক পৌছলেও কিন্তু আচমকা মৃত্যু ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে শতকরা একশো ভাগ বিশুদ্ধ মাদকের ধাক্কা সামলাতে না পেরে মৃত্যু ঘটে।

অভিজ্ঞ নেশাড়ু কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে ড্রাগের বিশুদ্ধতা পরখ করে নেয়। সে প্রথমে সামান্য পরিমাণ হেরোইন শিরায় প্রবেশ করিয়ে 'চেখে' নেয়। কোন অচেনা লোকের কাছ থেকে কেনার সময় বা নতুন ধরনের হেরোইন হলে সে অবশ্যই এভাবে যাচাই করে নেবে। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ মাদকাশসক্তও প্রত্যাহরণের অসহ্য কষ্টের মধ্যে থাকলে মরিয়া হয়ে হাতের কাছে যে ড্রাগ পায় তাই শিরায় ঢুকিয়ে নেয়। সে সময় তাদের খাঁটি ভেজাল যাচাই করার ধৈর্য থাকে না আর অনেক সময়ে এই অসাবধানতার জন্য 'ক্ষেপণাস্ত্রের' আঘাতে মারা যায়।

আফিমের ক্বাথ

গ্রামাঞ্চলে বহু লোক চায়ের পাতার মত আফিম ফুটিয়ে ক্বাথ তৈরী করে। এই ক্বাথটিকে 'কাসুম্বা' বা 'অমলপানি' বলে। এতে প্রায় 5 শতাংশ আফিম থাকে। পালা পার্বণে অনেক সময় অতিথি অভ্যাগতদের কাসুম্বা খেতে দেওয়া হয়। পাঞ্জাব ও জয়পুর সংলগ্ন রাজস্থানের কিছু অঞ্চলে পপি খোল ফুটিয়ে তরল তৈরী করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। কাঁচা খোলগুলিকে মাখন বা ঘিরে ভেজে 'ভুজরি' বানিয়ে নেশাখোর গ্রামের

মানুষরা খেয়ে থাকে। কাঁচা পপিখোল নিঃসৃত রস দিয়ে হালুয়া তৈরী করেও অনেকে খায়। এই ধরনের নেশার প্রচলন শুধু গ্রামাঞ্চলেই আছে কারণ এখানকার মানুষরা নেশার পূর্বোল্লিখিত সাজসরঞ্জামের ব্যাপারে খুব একটা ওয়াকিবহাল হতে পারে নি।

যেসব ওষুধে আফিম উপাদান হিসাবে থাকে তার মধ্যে বেশ কয়েকটি নেশার দ্রব্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুটি জনপ্রিয় এই ধরনের ওষুধ ছিল যা 'ব্ল্যাকড্রপ' ও 'প্যারেজোরিক' নামে পরিচিত। ব্ল্যাকড্রপের আবিষ্কার করেছিলেন অকল্যান্ড শহরের এডওয়ার্ড রানস্টল আর প্যারেজোরিকের আবিষ্কর্তার নাম লেমোর্ট (লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ক্লোরোডাইন নামের আরেকটি জনপ্রিয় ওষুধের প্রচলন হয়েছিল। এই ওষুধটিতে ক্লোরোফর্ম, ইথার, মরফিয়া ও ভারতীয় হেম্প (পাট জাতীয় উদ্ভিদ যার থেকে নানা মাদক দ্রব্য তৈরী হয়) ব্যবহার করা হত। উল্লিখিত এই তিনটে ওষুধই আমাশা আর ব্যথা বেদনার উপশমের জন্য ব্যবহার করা হত কিন্তু তিনটেই রুগীদের নেশাখোর বানিয়ে ছাড়ত। যারাই এই ওষুধগুলির শিকার হত তারাই মরফিনাইটিস বা পাক্কা মরফিন-আসক্তের মত আচরণ করত। শোনা গেছে যে এই ধরনের নেশায় আসক্ত মহিলারা তাদের স্বামীদের সম্পত্তি বিক্রি করে বা চুরি চামারি করে এই নেশার দ্রব্য যোগাড় করত। বিংশ শতাব্দীর অনেক আগে বাজার থেকে এই ড্রাগগুলি তুলে নেওয়া হয়েছিল।

মরফিনের প্রভাব

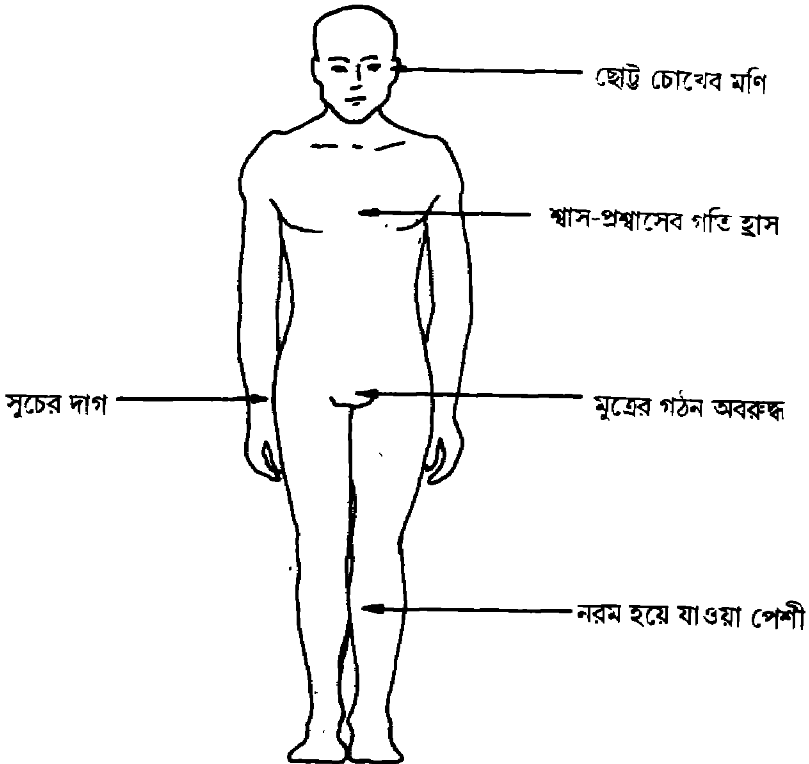
মরফিন নিলে এক অদ্ভুত আনন্দ ও তৃপ্তির অনুভূতি আসে যাকে ইংরাজিতে 'ইউফোরিয়া' বলে। এই মাত্রাছাড়া আনন্দের অনুভূতি আনে বলেই মরফিন ও তার সমগোত্রীয় মাদক-দ্রব্যগুলিকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করা হয়। মরফিন কখনই মনে ভীতি বা দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে না। এটি যন্ত্রণা ও কাশির দমককে চাপা দিয়ে রাখে। এছাড়া এটি মলদ্বারের মাংসপেশীর উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করে যার ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা যায়। মরফিন শ্বাস প্রশ্বাসের হারও স্তিমিত করে দেয়। নেশাসক্ত ব্যক্তি অধিক মাত্রায় মরফিন নিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার খুবই কমে যায় এবং প্রতি মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের ঘাত দুই থেকে তিনে এসে দাঁড়ায়। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে আঠারোটা ঘাত পড়ে। এর ফলে মানুষের মনে প্রশান্তি আসে কিন্তু বেড়াল বা ঘোড়ার উপর এই মাত্রা প্রয়োগ করলে তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অধিক মাত্রায় মরফিন রক্তের চাপ কমিয়ে দেয় আর একটি হরমোনের (অ্যান্টি ডাই ইউরেটিক হরমোন) মাত্রা কমিয়ে দেয় যা মূত্র উৎপাদনে সহায়ক হয়। মানুষের শরীরে এত রকমের প্রভাব ফেলতে পারে বলেই চিকিৎসাক্ষেত্রে

মরফিনের কদর বেশি।

যখন নেশাসক্ত ব্যক্তি একটি বিশেষ মাত্রায় আফিম (বা মরফিন বা হেরোইন বা অন্য কোন ড্রাগ) পায় না তার শরীরে অত্যন্ত কষ্টদায়ক প্রত্যাহরণের লক্ষণ দেখা যায়। এই লক্ষণগুলি সাধারণত তিন ধাপে আসে।

প্রথম ধাপটি শুরু হয় চার থেকে ছ ঘণ্টার মধ্যে। প্রথম দিকে এই অস্বস্তি শারীরিক স্তরে থাকে না, মানসিক স্তরে আবদ্ধ থাকে। আট থেকে চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে মারাত্মক অস্থিরতা, ঘাম, নাকে-চোখে জল, হাঁচি কাশি হতে থাকে। আপাতভাবে এগুলিকে সাধারণ সর্দি-কাশির বহির্লক্ষণ মনে হতে পারে। 14 থেকে 24 ঘণ্টার মধ্যে লক্ষণগুলি বেড়ে যায় আর ক্ষুধামান্দ্য, মৃদু কাঁপুনি হয় আর গায়ে কাঁটা দিতে থাকে।

দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয় 24 থেকে 36 ঘণ্টা পরে। আসক্ত ব্যক্তি অনিদ্রা, বমি-বমিভাব, পেট খারাপ, দুর্বলতা এবং হতাশার শিকার হয়। প্রথম ধাপের



চিত্র 26. মরফিন-নেশার নানা চিহ্ন ও উপসর্গ।

লক্ষণগুলিও আরো জাঁকিয়ে বসে।

তৃতীয় ধাপ শুরু হয় 48 থেকে 78 ঘণ্টার মধ্যে। এই সব লক্ষণগুলি পাকস্থলী ও মাংসপেশীতে অস্বাভাবিক টান সৃষ্টি করে আর চলতে থাকে মারাত্মক কাঁপুনি। দেহের তাপমাত্রা আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি দ্রুততর হয় আর শুরু হয় বমি আর পেটখারাপের দশা। পেশীর অনিচ্ছাকৃত সঙ্কোচন দারুণ বেড়ে যায় আর এ কারণেই নেশার এই লক্ষণটিকে ইংরাজিতে 'কিকিং দ্য হ্যাবিট' বলে। এইসব ধাপগুলি পেরিয়ে যাওয়ার পরে নেশাখোর বুঝতে পারে 'নরকযন্ত্রণা' কাকে বলে। তাই এই প্রত্যাহরণের লক্ষণগুলির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য আসক্ত ব্যক্তি ক্রমাগত মরফিনের নেশা বাড়িয়ে চলে।

গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্র

মরফিনের কার্যপ্রণালী কিছুদিন আগেও অজানা ছিল। মস্তিষ্কের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে অর্থাৎ গ্রাহক-স্নায়ুপ্রান্তে গিয়ে মরফিন যুক্ত হয় ও তার কাজ শুরু করে। এই গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রগুলি যেন একেকটি তালা যা নির্দিষ্ট চাবি না হলে খোলা যায় না। যখন সঠিক চাবিটি তালাতে প্রবেশ করে কলকব্জাগুলি খুলে যায় আর নানা লক্ষণ স্নায়ু-বেয়ে ছুটতে থাকে। এই গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত ক'রে নানা গ্রীক বর্ণমালা অনুযায়ী নামকরণও করে ফেলেছেন। এগুলির নাম মু, কাপ্পা ও ডেল্টা গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্র। নামগুলি দুর্বোধ্য মনে হতে পারে কিন্তু এদের নামের আড়ালে কিছু মজার ঘটনা লুকিয়ে আছে। আসলে এই গ্রাহক কেন্দ্রগুলিতে এসে আটকা পড়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাদক দ্রব্য। যেমন যে কেন্দ্রে মরফিন এসে আটকে যায় তাকে মরফিনের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী 'মু' নামে অভিষিক্ত করা হয়। গ্রীক বর্ণমালায় 'ম' এর সমকক্ষ μ, তাই একে মু গ্রাহককেন্দ্র বা মু রিসেপ্টর বলা হয়। (বিজ্ঞানের জগতে গ্রীক বর্ণমালা অনুযায়ী নামকরণের একটি রেওয়াজ আছে। সম্ভবত গ্রীক সংস্কৃতির প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যেই এই রীতি প্রচলিত হয়েছে। এই পুরাতন সংস্কৃতিকেই বিজ্ঞানের অগ্রদূত মনে করা হয়) এই ভাবেই কেটোসাইক্লা জোসিন ড্রাগের নামানুসারে কাপ্পা গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রের নাম হয়েছে। ইংরাজি 'k' অক্ষরের গ্রীক প্রতিনিধি কাপ্পা।

এই গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে একত্রে ওপিঅয়েড রিসেপ্টর বলা হয় যার অর্থ আফিম ধর্মী গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্র। এই নামকরণের কারণটি হল—মরফিন ছাড়াও আরো অনেক আফিম নিঃসৃত মাদক দ্রব্য এই সব রিসেপ্টরগুলিতে আটকা পড়ে।

রিসেপ্টরগুলিকে উত্তেজিত করার (যাকে আমরা তালা খুলে যাওয়ার রূপকল্পের সাথে তুলনা করছি) ফলে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। মরফিনের অণুগুলি সব রিসেপ্টরেই গিয়ে আটকে যেতে পারে অর্থাৎ মরফিন সবকটি তালা খুলে

ফেলতে পারে। তিনটির যে কোন একটি রিসেপ্টরে আটকে পড়ে ও সেগুলিকে উত্তেজিত করে বলে মরফিন যন্ত্রণার উপশম ঘটায় আর শ্বাস প্রশ্বাসে গতিও কমিয়ে দেয়। নির্দিষ্ট রিসেপ্টরে আবদ্ধ হওয়ার পর মরফিন ও মরফিনের সমগোত্রীয় যৌগগুলি আরো কয়েকটি লক্ষণ ফুটিয়ে তোলে। যেমন মু রিসেপ্টরে গিয়ে আটকালে শরীরে মাত্রাছাড়া আনন্দের অনুভূতি আসে আর আসক্তির একটা ভাব আসে। কাপ্পা গ্রাহককেন্দ্রে আটকা পড়লে মরফিন চোখের মণির সঙ্কোচন ঘটায় আর মনে এনে দেয় প্রশান্তি। ডেল্টা রিসেপ্টরে লাগলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রগুলির একাধিক সত্তা আছে। আসলে এদের দুটি পৃথক সত্তা অর্থাৎ দুটি বিভিন্ন রূপ আছে। এদেরকে μ_1 ও μ_2 গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্র নামে ডাকা হয়। μ_1 রিসেপ্টরটিকে উত্তেজিত করলে ব্যথা বেদনার উপশম হয় আবার μ_2 রিসেপ্টরটিকে উত্তেজিত করলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ধীর হয় আর কোষ্ঠবদ্ধতার উদ্রেক হয়। নিচের তালিকাটিতে বিভিন্ন রিসেপ্টরগুলিকে উত্তেজিত করার পদ্ধতি ও শরীরে উৎপন্ন বহির্লক্ষণগুলি দেওয়া হল।

সারণি 1 : আফিমধর্মী গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে উৎপন্ন উত্তেজনার বহির্লক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	μ (মু)	κ (কাপ্পা)	δ (ডেল্টা)
1.	যন্ত্রণার উপশম	যন্ত্রণার উপশম	যন্ত্রণার উপশম
2.	শ্বাস প্রশ্বাসের গতি হ্রাস	শ্বাস প্রশ্বাসের গতি হ্রাস	শ্বাস প্রশ্বাসের গতি হ্রাস
3.	মাত্রাছাড়া আনন্দের অনুভূতি	দুশ্চিন্তা ও ভয়ের উদ্রেক; কল্পনায় উদ্ভট বস্তু দেখা (হ্যালুসিনেশন)	আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া
4.	চোখের মণি কুঁচকে ওঠা	চোখের মণি কুঁচকে ওঠা	—
5.	কোষ্ঠবদ্ধতা	—	কোষ্ঠবদ্ধতা
6.	আসক্তি	আসক্তি	—

এবার একটা মজার ঘটনা বলি। এতক্ষণ বলেছি কিভাবে মরফিন ও তার সমগোত্রীয় মাদকদ্রব্যগুলি কিভাবে গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে নানা বিচিত্র উপসর্গ সৃষ্টি করে। এই ধরনের আরো অনেক ড্রাগ আছে যারা রিসেপ্টরগুলিতে আটকে যায় কিন্তু কোন লক্ষণ ফুটিয়ে তোলে না। আমাদের পূর্ব আলোচিত তালা চাবির রূপকের খেই ধরে বলা যেতে পারে যে এই ড্রাগগুলির হাতে চাবি থাকে বটে কিন্তু এই চাবিগুলি তালাগুলির ঠিক ঠিক খাপে বসতে পারে না আর এর ফলে তালাও খোলে না। এর ফলে ড্রাগগুলি কোন প্রভাবই ফেলতে পারে না, উপরন্তু এগুলি রিসেপ্টরগুলিকে কোন লক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে বাধা দেয়। ডাক্তারেরা এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়ে আফিমের বিষক্রিয়ার চিকিৎসা করেন। এবার এই ড্রাগগুলির পরিচয় দেওয়া যাক। প্রথমে উল্লেখ করা ড্রাগগুলিকে বলে 'অ্যাগোনিস্ট' যা একটি গ্রীক শব্দ (অর্থ 'আমি আন্দোলন করি') থেকে এসেছে। কল্পনা করা হয় যে এই মাদকদ্রব্যগুলি লক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে আন্দোলনমুখর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দলের ড্রাগগুলি রিসেপ্টরে আটকে যায় অথচ কোন লক্ষণই ফুটিয়ে তোলে না। এদের বলে 'অ্যান্টাগনিস্ট' যার গ্রীক অর্থ 'আমি প্রতিবাদ করি'। এগুলি লক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে বাধা দেয় বলে এই নামকরণ।

'প্রতিবাদী' ড্রাগ কিভাবে 'আন্দোলন মুখর'- ড্রাগের ক্রিয়া অকেজো করে? কল্পনা করুন কোন ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে মরফিন সেবন করেছে, যার ফলে তার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ধীর হয়ে গেছে। তার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। কি ঘটে চলেছে এই ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে? এই ব্যক্তির মস্তিকে রিসেপ্টরগুলিকে খালি চোখে দেখা গেলে, স্পষ্ট দেখতে পেতাম মরফিন অণুগুলি রিসেপ্টরে গিয়ে আটকেছে আর শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করছে। যদিও শরীরের প্রতিক্রিয়া মরফিনকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়, নতুন মরফিন অণু গিয়ে আবার গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু ঠিক এই অবস্থায় ন্যালোক্সোনের মত 'প্রতিবাদী' ড্রাগ প্রয়োগ করলে এই ড্রাগের অণুগুলি রিসেপ্টরে গিয়ে আটকায় যার ফলে কোন অপ্রীতিকর লক্ষণ ফুটে ওঠে না। শুধু তাই নয়, এই অণুগুলি রিসেপ্টরে সেঁটে যায় বলে মরফিনের আন্দোলন মুখর অণুগুলি গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রের নাগাল পায় না। তাই আসক্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে মরফিনের নেশার কবল থেকে মুক্ত হয়।

আরো কয়েকটি ড্রাগ আছে যাদের 'আংশিকভাবে প্রতিবাদী' তকমা দেওয়া যায়। এরা খুবই মৃদু লক্ষণ ফুটিয়ে তোলে। একটি বিশেষ ড্রাগ কোন রিসেপ্টরের প্রতি আন্দোলনমুখর হতে পারে আবার অন্য একটি রিসেপ্টরের ক্ষেত্রে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে। এই ড্রাগটিই আবার তৃতীয় একটি রিসেপ্টরের কাছে 'আংশিক প্রতিবাদী' মনে হয়। যেমন পেন্টাজোসাইন নামের ড্রাগটি (এটি শল্যচিকিৎসা, আগুনে পোড়া বা হাড় ভাঙার যন্ত্রণার উপশম ঘটায়) 'মু' রিসেপ্টরের কাছে

প্রতিবাদী অথচ কাপ্পা রিসেপ্টরের বেলায় আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু ডেল্টা রিসেপ্টরের কাছে এটি 'আংশিক প্রতিবাদী' ড্রাগ। এর অর্থ হল, পেন্টাজোসাইন সবকটি রিসেপ্টরের গায়েই লেপ্টে যেতে পারে কিন্তু মু রিসেপ্টরের ক্ষেত্রে কোন বহির্লক্ষণ দেখা যাবে না। কিন্তু ডেল্টা রিসেপ্টরে মৃদু লক্ষণ ফুটিয়ে তুলবে আর কাপ্পা রিসেপ্টরে সব লক্ষণ প্রকাশ করবে। এই ধরনের ভিন্ন আচরণধর্মী ড্রাগকে অ্যাগোনিস্ট-অ্যান্টাগোনিস্ট বলে (অর্থাৎ এরা প্রয়োজনে যেমন কারোর হয়ে আন্দোলন করে আবার প্রয়োজনে অন্যের আন্দোলনের প্রতিবাদও করতে পারে)। নিম্নলিখিত তালিকাটি মরফিন-ধর্মী নানা ড্রাগের ক্রিয়াগুলিকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবে

সারণি 2 : বিভিনন আফিমধর্মী রিসেপ্টরে মরফিন জাতীয় মাদক দ্রব্যের আচরণের বৈচিত্র্য

ক্রমিক সংখ্যা	মরফিন জাতীয় মাদক দ্রব্য	মু রিসেপ্টরে এদের আচরণ	কাপ্পা রিসেপ্টরে এদের আচরণ	ডেল্টা রিসেপ্টরে এদের আচরণ
1	মরফিন	আন্দোলনমুখর	আন্দোলনমুখর	আন্দোলনমুখর
2	ন্যালোরফিন	প্রতিবাদী	আংশিক আন্দোলনমুখর	আংশিক আন্দোলনমুখর
3.	পেন্টাজোসাইন	প্রতিবাদী	আন্দোলনমুখর	আংশিক আন্দোলনমুখর
4.	ন্যালবুফিন	প্রতিবাদী	আন্দোলনমুখর	আন্দোলনমুখর
5.	বুপ্রেনরফিন	আংশিক আন্দোলনমুখর	প্রতিবাদী	—
6.	বুর্টফেনল	প্রতিবাদী	আন্দোলনমুখর	আন্দোলনমুখর
7.	ন্যালোক্সোন	প্রতিবাদী	প্রতিবাদী	প্রতিবাদী

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মরফিনই হল একমাত্র ড্রাগ যা তিনটে রিসেপ্টরের ক্ষেত্রেই 'আন্দোলনমুখর' হয় আর ন্যালোক্সোন সেই ড্রাগ যা তিনটে রিসেপ্টরের বেলাতেই প্রতিবাদী আচরণ করে। এই জন্যেই মরফিনের বিষক্রিয়ার চিকিৎসায় ন্যালোক্সোন ব্যবহার করা হয়। এর আগে মরফিনের বিষক্রিয়া তাড়াতে ন্যালোর ফিন ব্যবহার করা হত কিন্তু তালিকা দেখলেই স্পষ্ট হবে কেন এখন তা আর প্রয়োগ করা হয় না।

গবেষকরা সম্প্রতি মস্তিকে চতুর্থ গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রের সন্ধান পেয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে সিগমা রিসেপ্টর। যেহেতু SKF 10047 ড্রাগটি এই রিসেপ্টরে গিয়ে আটকাত তাই এই রিসেপ্টরকে সিগমা রিসেপ্টর বলে। ইংরাজির 's' বর্ণমালার গ্রীক প্রতিভূ সিগমা। এই স্নায়ুকেন্দ্রটি উত্তেজিত হলে লোকে উদ্ভট কল্পনার জগতে পাড়ি দেয় যাকে হ্যালুসিনেশন বলা হয় (পূর্ব অধ্যায়ে এই অলীক মানসিক অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে)।

সিগমা গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রকে অবশ্য সঠিক অর্থে আফিম ধর্মী রিসেপ্টর বলা যাবে না কারণ মরফিন ও ন্যালোক্সোন উভয় ড্রাগের ক্ষেত্রেই এটি কোন কাজে আসে না। এর মানে হল যে মরফিন বা ন্যালোক্সোন কারোর হাতেই সিগমা রিসেপ্টরের তালার চাবি থাকে না। এ দুটির কাউকেই সিগমা তার গায়ে লেপটাতে দেয় না। কিন্তু মরফিন-ধর্মী পেন্টাজোসাইন আর বুর্টফেনল এই রিসেপ্টরগুলির গায়ে সেঁটে গিয়ে নানা অপ্রীতিকর লক্ষণ ফুটিয়ে তোলে। এর ফলে সিগমা রিসেপ্টরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এছাড়া PCP-র মত আরো কিছু ড্রাগ আছে যা এই রিসেপ্টরকে উত্তেজিত করতে পারে।

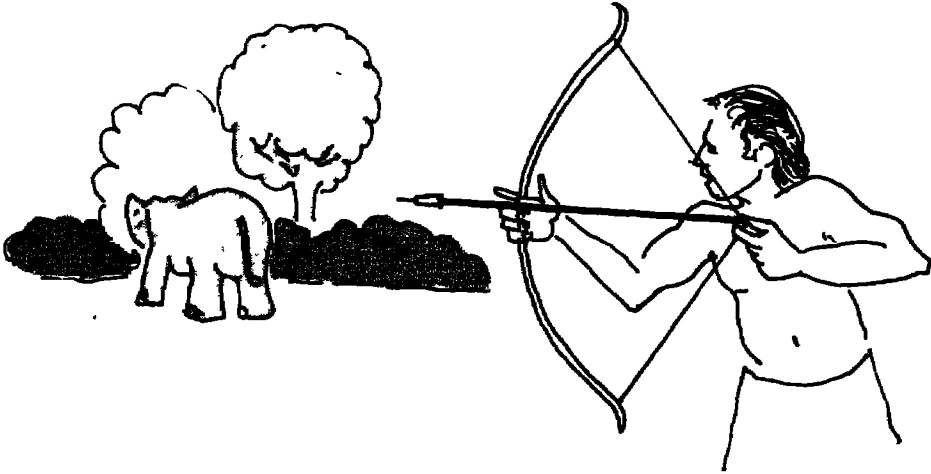
মানুষের দেহে মরফিন জাতীয় কিছু রাসায়নিক উৎপন্ন হয়। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই রাসায়নিকগুলি আবিষ্কৃত হয়। শরীরে তীব্র আঘাত লাগলে তিনটি বিভিন্ন রাসায়নিক গোষ্ঠী—এন্‌কেফালিন্স, এন্ডরফিন্‌স ও ডাইনোরফিন—সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই রাসায়নিকগুলি নিঃসৃত হয়ে সহজাত যন্ত্রণানিবারকের কাজ করতে থাকে। বিজ্ঞানীরা বহুদিন ভেবে পেতেন না—কেন যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক আহত সৈনিকরা যন্ত্রণায় সেভাবে কাতর হয় না, যেমনটা হওয়া উচিত। আজ এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আপনারা নিজেরাও নিশ্চয়ই নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যে মারাত্মক আঘাত লাগার কিছুক্ষণের মধ্যে যন্ত্রণা খানিকটা কমে যায় আর কিছুটা সহনীয় হয়ে ওঠে। এর কারণ হল স্বয়ংক্রিয় মরফিন-জাতীয় রাসায়নিকের ক্ষরণ।

মরফিনের আত্মীয়স্বজন

পূর্বে আমরা কোডিন, প্যাপাভেরিন আর হেরোইনের মত মরফিনের নানা আত্মীয়ের সাথে পরিচিত হয়েছি। এখন বিশেষভাবে উল্লেখ করব এটরফিন নামের একটি ড্রাগের যা 'সর্বোচ্চ যন্ত্রণা উপশমের ক্ষমতা ধারণকারী' ড্রাগ হিসাবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তার স্থান করে নিয়েছিল। এর যন্ত্রণা উপশম করার ক্ষমতা মরফিনের চেয়েও 10,000 গুণ বেশি। 1960 সালে এটি সর্বপ্রথম ওরিপাভাইন থেকে তৈরী হয়েছিল। এটি আফিম খোলে পাওয়া যায় না। এটি অবশ্য আফিম গোষ্ঠীরই প্যাপাভার ওরিয়েন্টেল আর প্যাপাভার ব্র্যাকটিটামে

পাওয়া যায়। এটি প্রধানত চিড়িয়াখানায় জন্তু জানোয়ারকে বাগে আনতে প্রয়োগ করা হয়। শিরায় ইঞ্জেকশন করে অথবা তীরের ফলায় এই ড্রাগ লাগিয়ে তা ছুঁড়ে হিংস্র জন্তুকে তীরবিদ্ধ করে জন্তুটিকে বাগে আনা হয়। ঘোড়া ও গবাদি পশুর চিকিৎসাতেও এই ড্রাগ কাজে লাগে।

এই জাতের আরেকটি ড্রাগ আবিষ্কার করেছিল জার্মানরা। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মরফিনের খুব আকাল দেখা গিয়েছিল। তাই জার্মানরা মিথাডন নামের একটি ড্রাগ আবিষ্কার করে আর অ্যাডল্ফ হিটলারের নামানুসারে এটির নাম দেয় ডোলোফিন। এটিই পৃথিবীর একমাত্র ড্রাগ যার নাম হয়েছে কোন ব্যক্তির নাম অনুসারে। এই ড্রাগটিকে আবার চলতি ভাষায় 'ডলিস' বলা হত। পরে এই ড্রাগটি হেরোইনের বিষক্রিয়া প্রশমিত করতে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিকে 'ডিটবিসফিকেশন' বা 'বিষ নামানো' বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেরোইনের পরেই নেশা করার জন্য নেশাড়ুরা মিথাডন (সংশ্লেষিত মাদকদ্রব্য) ব্যবহার করে থাকে। এই কৃত্রিম ড্রাগ আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় পাওয়া যায় আর এই আসক্তি আজ বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত হেরোইনে আসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সময়ে, প্রত্যাহরণ লক্ষণের অসহ্য কষ্ট কমাতে, মিথাডন ব্যবহার করা হয়।



চিত্র 27: ভয়ঙ্কর জন্তুদের বশে আনতে তীরের মাথায় এটরফিন লাগিয়ে পশুদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়।

চার

কোকেন ঃ ঈশ্বরের উপহার

বিখ্যাত মার্কিন অভিনেত্রী ট্যালুলা ব্যাঙ্কহেড (1903-1968) একবার বলেছিলেন, "বহু বছর ধরে আমি কোকেন নিচ্ছি। আমি জানি এটি খেলে কোন নেশা হয় না।" এই অদ্ভুত স্ববিরোধী বক্তব্যটি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় কিভাবে কোকেন মানুষকে বশ করে।

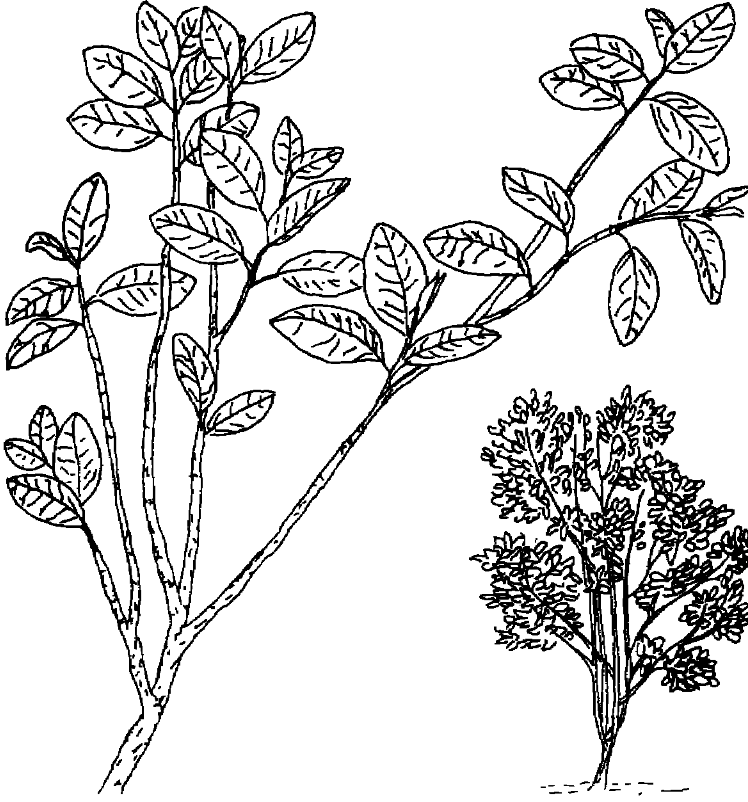
কোকেনের নেশাকে ময়ালের নাগপাশের সাথে তুলনা করা হয়। এই নেশার করালগ্রাসে মানুষ আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়ে যা ক্রমাগত মানুষকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে ফেলে ও অবশেষে মৃত্যু ঘটে। মানুষ একবার এই নেশার জালে জড়িয়ে পড়লে বেরিয়ে আসা খুব দুষ্কর হয়ে ওঠে।

মার্কিন মুলুকে আজ কোকেন একটি শখের মাদক দ্রব্য হয়ে উঠেছে। সমাজের উঁচুতলায় কোকেনের নেশা ঢুকে পড়েছে। আমেরিকায় আজ যত মাদকদ্রব্য আছে তার মধ্যে কোকেনই সর্বাধিক পরিমাণে নিষিদ্ধ আয়ের উৎস।

কোকা গাছ

কোকেন একটি সাদা স্ফটিকাকৃতির উপক্ষার যা পাওয়া যায় কোকা গাছের পাতায়। কোকেনের রাসায়নিক নামটি খুব বিচিত্র — বেঞ্জোইলমিথাইল একগোনিন। চিরহরিৎ কোকা গাছের (বিজ্ঞানভিত্তিক নাম এরিথ্রক্সাইলন কোকা) বাসভূমি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরু, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি ও কলম্বিয়া। এই কোকা গাছ থেকে কিন্তু চকোলেট তৈরী হয় না। কোকার বিজ্ঞানভিত্তিক নামের উৎস গ্রীক শব্দ 'এরিথ্রোস' (যার অর্থ লাল) আর 'জাইলন' (অর্থ কাঠ)। কোকাগাছের ছালের ভিতরের দিকটা রক্তাভ লাল বলেই এই নাম দেওয়া হয়েছে। আসলে এই গাছের কাষ্ঠাল অংশের রঙ হয় লাল বা হলুদ। কোকো গাছের জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা হলেও জাভা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে এটির চাষ করা হয়।

সাধারণত এরিথ্রক্সাইলন কোকাকে 'বলিভিয়ান কোকা' বলে। এছাড়া এরিথ্রক্সাইলন ট্রুক্সিলেন্স (প্রচলিত নাম পেরুভিয়ান কোকা) নামক একটি অন্য

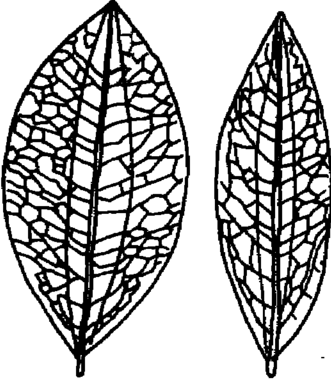


চিত্র 28: কোকা উদ্ভিদ।

প্রজাতির উদ্ভিদ থেকেও প্রচুর পরিমাণে কোকেন পাওয়া যায়। অবশ্য বলিভিয়ান প্রজাতিটি থেকেই বেশি পরিমাণে কোকেন পাওয়া যায়। কোকা গাছের ঝোপের উচ্চতা হয় 150-300 সেমি। এর দীর্ঘ প্রসারিত শাখা প্রশাখা সমন্বিত কাণ্ডের প্রান্তগুলিতে অসংখ্য পাতা থাকে। এই সবুজ পাতার কিনারা মসৃণ আর দৈর্ঘ্য 2 থেকে 8 সেমি হয়। এর গন্ধ অনেকটা চা পাতার মত হয়।

কোকা গাছের চাষ হয় পেরু আর বলিভিয়াতে। এ দুটি দেশে বহুকাল আগে এর চাষ আরম্ভ হয় আর এখন তো মাঠে-ঘাটে আগাছার মত কোকা গাছ গজিয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বা প্রায়-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালুতে বা উচ্চভূমির সমতল স্থানে কোকাগাছের চাষ করা হয়। এই গাছের জন্য বঁদ (হিউমাস) ও লৌহ পদার্থে পরিপূর্ণ কাদামাটির প্রয়োজন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ 300 থেকে 1800 মিটারের মধ্যে থাকে। তাপমাত্রা থাকে 68^0 থেকে 86^0 ফারেনহাইটের মধ্যে ($20\text{-}30^0$ সেলসিয়াস)। উচ্চভূমির উপত্যকায় ক্রমাগত বৃষ্টি ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে থাকার ফলে এই গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ গড়ে

প্রায় 40 বছর বেঁচে থাকে। কিন্তু বহু শতায়ু উদ্ভিদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।



ই. কোকা ই. ট্রুক্সিলেন্স
চিত্র 29 কোকা পাতা

কোকাগাছের চাষ

সাধারণত তিন বছর বা তার বেশি বয়সের উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ করে কোকা চাষ করা হয়। বীজগুলিকে একটি বিশেষ পাত্রে, নার্সারিতে কোন স্যাঁতসেঁতে স্থানে রেখে, অঙ্কুরিত করা হয়। অঙ্কুরিত বীজগুলিতে দিন পাঁচেক প্রচুর জল দেওয়া হয়। ফুলে ফেঁপে উঠলে বীজগুলিকে সমপরিমাণ বঁদ, বালি আর মাটির মিশ্রণে পুঁতে দেওয়া হয়। এবার চারাগুলিকে সূর্যের আলোর আড়ালে রেখে আবার প্রচুর জল খাওয়ানো হয়। সপ্তাহ দেড়েকের মধ্যে চারাগুলির পাতা ও কাণ্ড গজিয়ে ওঠে। মাস দুয়েকের মধ্যে এই চারাগুলিকে তুলে মূল জমিতে লাগানো হয়। গুটিকয় পাতাবিশিষ্ট এই ছোট্টগাছগুলি মাত্র 15 থেকে 25 সেমি উচ্চতার হয়। এগুলিকে ছোট্ট খোলা পরিখার মত ধারিতে একটু ফাঁক ফাঁক করে বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি বর্গমিটারে এক থেকে চারটি চারা রোপণ করা হয়।

চারা রোপণ করার আদর্শ সময় শীতকাল। শীত পেরিয়ে গেলে এগুলির আর কোন পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। স্যাঁতসেঁতে আর বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে সেচেরও কোন ব্যবস্থা লাগে না। চারা লাগানোর বছর খানেকের মধ্যে কোকা গাছ প্রথম 'ফসল' উৎপন্ন করে। এই উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হল যে এটি শুধু পাতার জন্য চাষ করা হয়—ফুল, ফল বা সজির জন্য নয়। কোকা গাছের ফুল ও ফল অত্যন্ত ছোট ও গুরুত্বহীন। এগুলি মানুষের কোন কাজে আসে না।

কোকা উদ্ভিদ সাধারণত বছরে চারটি ফসল দেয়। কিন্তু উপযুক্ত পরিচর্যা আর ঠিকঠাক সার পড়লে বছরে দশটা পর্যন্ত ফসল পাওয়া যায়। কোকা চাষকে লাভজনক করতে হলে 100 বর্গমিটারে কমপক্ষে 720 টি চারা লাগানো চাই এবং এগুলিকে অন্ততপক্ষে 30 বছর বাঁচিয়ে রাখতে হবে। 100 টি উদ্ভিদ প্রতি বছর প্রায় কেজি সাতেক পাতা উৎপন্ন করে। একটি কোকা পাতায় গড়ে 12 শতাংশ কোকেন থাকে। অবশ্য কোকেনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয় বায়ুমণ্ডলের অবস্থা, উদ্ভিদের বয়স, মাটির গুণ, প্রযুক্ত সারের গুণাগুণ, চার রোপণের ও ফসল তোলার সময়, পাতা শুকানোর পদ্ধতির মত নানা আনুষঙ্গিক ঘটনা। একজন কোকা চাষী চাইলে দিনে 30 কেজি পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করতে পারে।

পাতা শুকানোর পদ্ধতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাতা শুকোতে প্রায় দিন দুয়েক, অন্ততপক্ষে দৈনিক তিনঘণ্টার সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। শুকানোর সময় বার বার পাতাগুলিকে উল্টে পাল্টে দেওয়া হয়। বেশি শুকিয়ে ফেললে আবার পাতাগুলিকে ঠিকঠাক ব্যবসায়িক কাজে লাগানো যায় না। শুকানোর পর কোকা পাতার ওজন প্রায় শতকরা 75 ভাগ কমে যায়। পাতাগুলি শুকিয়ে গেলে চাপ দিয়ে পাকিয়ে 30 কেজি বা 50 কেজির গাঁটরি বানানো হয়।

বেআইনিভাবে কোকা পাতা থেকে কোকেন বের করার নানা পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতিতে শুকনো পাতাগুলি সালফিউরিক অ্যাসিডের মত কোন অ্যাসিডের দ্রবণে চোবানো হয়। এর ফলে কোকার আঠা তৈরী হয় যাতে প্রায় 70 শতাংশ কোকেন থাকে। এর পর অবশিষ্ট আঠাটিকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণে ফেলা হয় আর উৎপন্ন হয় কোকেন। হাইড্রোক্লোরাইড বলে একটি যৌগ। এই যৌগই রাস্তাঘাটে বিক্রি হয়। এই পদ্ধতিতে কোকেন বের করতে দীর্ঘ সময় (সপ্তাহ দুয়েক) লাগে। অন্য আরেকটি পদ্ধতিতে কোকাপাতাগুলিকে পটাশিয়াম কার্বনেট বা সোডিয়াম কার্বনেটের ক্ষারকীয় দ্রবণে ফেলা হয়। এর ফলেও সেই কোকার আঠা পাওয়া যায় যাকে একই ভাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণে ফেলা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি খুব কম সময়ে হয়। তাই বেআইনি কোকেন নির্মাতারা এটিই বেশি পছন্দ করে।

যুগে যুগে কোকেনের নেশা

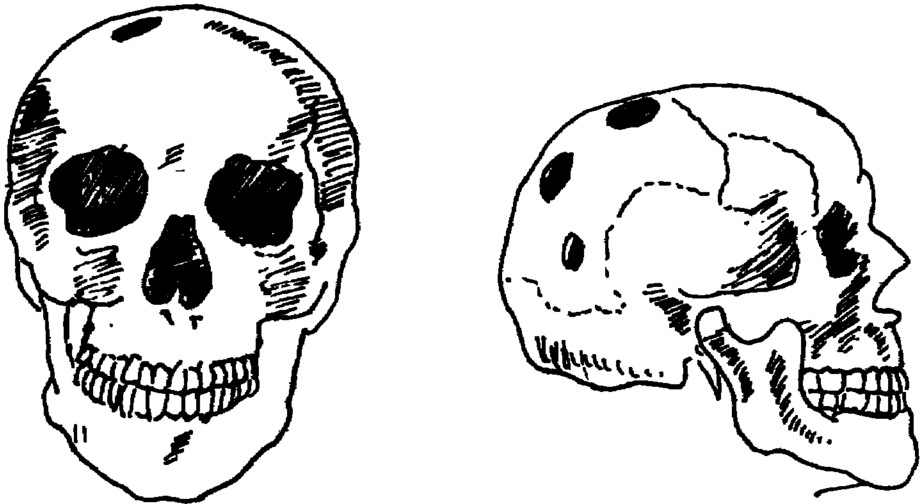
কোকেনের ইতিহাস খুবই প্রাচীন আর বৈচিত্র্যপূর্ণ। সম্প্রতি ইকুয়েডরে এমন কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে যার থেকে বোঝা যায় যে 5000 বছর আগেও



চিত্র 30: ইনকা মূর্তিগুলিতে কোকা পাতা চিবোবার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

কোকেনের নেশার প্রচলন ছিল। ইনকাদের সমাধিক্ষেত্রে কোকেনের পাতায় ভর্তি ছোট ছোট থলি পাওয়া গেছে। ইনকারা ছিল রহস্যময় এক উপজাতি। এরা দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, আন্দিস পাহাড়ের কুজকো উপত্যকায় বসবাস করত। বর্তমানে পেরু দেশটি এই অঞ্চলটি দখল করে আছে। এই উপজাতির একসময় খুব প্রতাপ ছিল কিন্তু 1530 সাল নাগাদ ফ্রান্সিসকো পিজারোর নেতৃত্বে গুটিকয় স্পেনীয় এদেরকে পরাভূত করে অঞ্চলটি দখল করে নেয়।

কোকেন ইনকা উপজাতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরা কোকা গাছকে 'স্বর্গীয় উদ্ভিদ' বলত। আমেরিকানরা যেমন হ্যাম্বার্গার ও দক্ষিণ ভারতীয়রা যেমন ধোসা খেতে ভালবাসে ইনকারাও তেমন কোকেন-ভক্ত ছিল। এদেশে যেমন লোকে চুন মিশিয়ে পানপাতা খায় ঠিক সেভাবে ইনকারাও কোকাপাতায় চুন মিশিয়ে হরদম খেত। অবশ্য পানপাতা চিবানোর সাথে কোকাপাতা চিবানোর সামান্য পার্থক্য আছে। ইনকারা প্রায় দশ গ্রামের মত শুকনো কোকাপাতা পাকিয়ে একটা গোল্লা বানাত। সেই গোল্লাটাকে একচিমটে চুনের সাথে মুখের ভিতর মাড়ির পাশে গুঁজে দিত। প্রায় ঘণ্টাখানেক মুখে রাখার পর বাকি অংশটুকু থুতু ফেলে বাইরে বের করে দিত। একেকজন দিনে তিন থেকে ছয়টি গোল্লা নিত। প্রতি গোল্লাতে গড়ে 2·5 গ্রাম করে খাঁটি কোকেন থাকত। কোকা পাতার তিতকুটে ভাবটা কাটানোর জন্য চুন মেশানোর রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া চুন দেওয়ার আরেকটা কারণ ছিল। চুন মেশালে পাতা মুখে সহজে গলে না আর মাদকটির শোষণেও সহায়ক হয়। 1530 খ্রীস্টাব্দে স্পেনীয় আক্রমণের সময়ে ইনকারা ব্যাপক পরিমাণে কোকেন সেবন করত। খিদে চাপা দেওয়া, সুদূর যাত্রাপথের ক্লান্তি দূর করা আর



চিত্র 31 ইনকারা কোকা পাতা চিবিয়ে সেই লালা লাগিয়ে (চেতনা নাশক) খুলির শল্যচিকিৎসা করত।

ধার্মিক অনুষ্ঠানাদিতে আধ্যাত্মিক কাজকর্মে মনঃসংযোগের জন্য কোকেনের ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। ইনকারা কিন্তু এটিকে ঈশ্বরের উপহার মনে করত আর তাই সমাজের উচ্চ শ্রেণী ও পুরোহিতদের মধ্যে এই নেশা আবদ্ধ ছিল। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সৈনিক, শ্রমিক ও দৌড়বাজদের কোকেন দেওয়া হত। বিনা কারণে কোকা পাতা চিবানো 'অপবিত্র কাজ' বলে গণ্য হত। ইনকা পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায় যে কোকেন আসলে সূর্যদেবতার সন্তান রাজপুত্র মানকো কেপাকের উপহার। আরেকটি উপকথা থেকে জানতে পারি যে দেবতা ইন্টি ইনকা উপজাতির ক্ষুধা তৃষ্ণা রোধ করার জন্য কোকা গাছ আবিষ্কার করেছিলেন। ইনকারা নিজেদের ঈশ্বরের বংশধর মনে করত। অনেকের মতে এসব গল্পকথা ইনকারা নিজেরাই বানিয়েছিল যাতে আর কেউ কোকাপাতা ব্যবহার না করে।

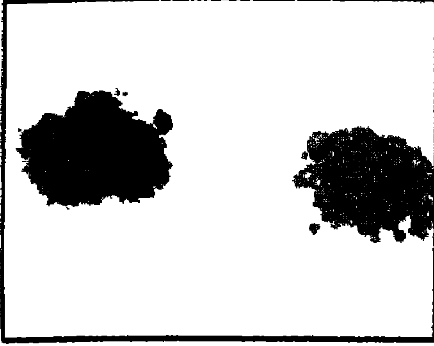
কোকাকে ইনকারা তাদের রাজকীয় প্রতীকেও স্থান করে দিয়েছিল। ইনকা রাণী নিজেকে 'মামা কুকা' (কোকেনের রাণী) নামে অভিহিত করতেন। সমসাময়িক ইনকা মূর্তিগুলির গালের এক পাশে কোকেনের দলা উঁচিয়ে থাকার চিহ্ন দেখা যায়। এটিকে স্বর্গীয় প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হত।

কোকা পাতা চিবোলে জিভ, তালু আর মুখের ভিতরে গালের অংশটি অবশ হয়ে যায়। এই কারণে ইনকারা অ্যানাস্থেসিয়া বা অবশ করার কাজে সেই দ্বাদশ শতাব্দী থেকে কোকেন পূর্ণ লালা লাগিয়ে মাথার খুলিতে অস্ত্রোপচার করত। ইনকারা প্রায়ই এই শল্যচিকিৎসা করত যাতে মাথা থেকে প্রেতাত্মাগুলি মুক্ত হতে পারে। এতে কিন্তু রোগীর উপকার হত কারণ ভিতরে জমাট বাঁধা রক্ত বেরিয়ে যেত আর সত্যি সত্যি কষ্টের উপশম ঘটত।

স্পেনীয় বিজেতারা স্বদেশে কোকাপাতা আমদানী করে আর ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ এটি কামোদ্দীপক হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। আজও এ ব্যাপারে কোকেনের খ্যাতি আছে। এখনো বহু বেশ্যা পাড়ায় পানওয়ালারা কোকেন মেশানো পান বিক্রি করে।

কোকেনের আবিষ্কার

অভিযাত্রী ও পরিব্রাজকদের হাত ধরে কোকেন ইউরোপে পৌঁছবার বেশ কয়েক যুগ পরে মাদক দ্রব্যটিকে কোকা পাতা থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছিল। জার্মান রসায়নবিদ্ ফ্রেডরিখ গ্যাডকে 1855 সালে সর্বপ্রথম কোকা পাতা থেকে কোকেন বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন। 1859 সালে গটিনজেন ইউনিভার্সিটির অ্যালবার্ট নিম্যান সর্বপ্রথম এই মাদকদ্রব্যটিকে রাসায়নিকভাবে চিহ্নিত করেন। নিম্যানই কোকেনের তেতো স্বাদ (উপক্ষারের বৈশিষ্ট্য) ও জিভকে অসাড় করার ক্ষমতার কথা প্রথম প্রচার করেন। 1880 সালে উর্জবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভ্রান্ত রাশিয়ান চিকিৎসক



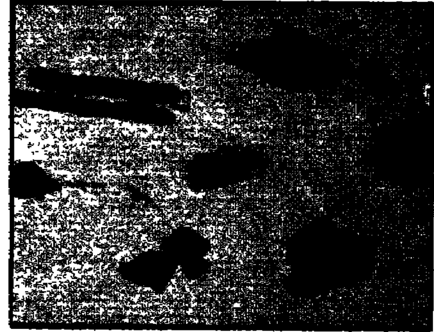
প্লেট 1: হেরোইন। একে ব্রাউন সুগারও বলে



প্লেট 2: বার্বিচুরেটস্



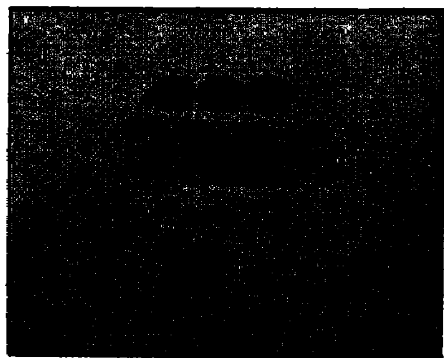
প্লেট 3: কোকেন



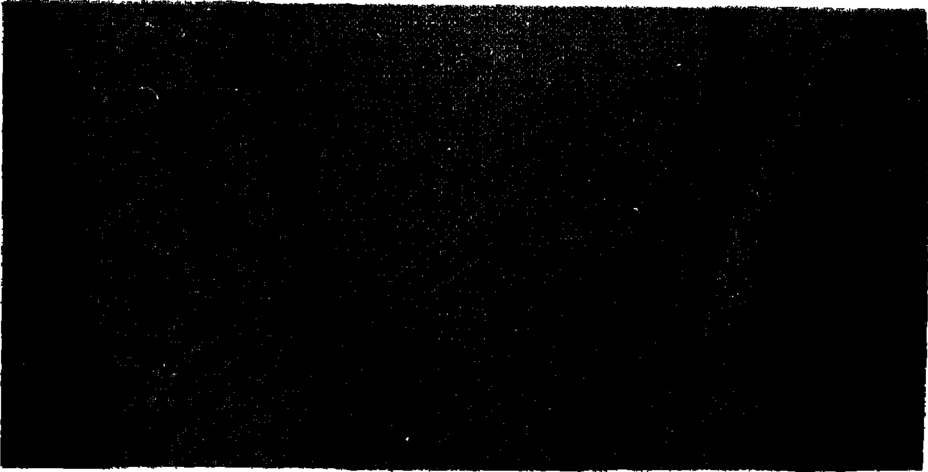
প্লেট 4: নানা রকমের ক্যানাবিস



প্লেট 5: অ্যাম্ফিটামাইন্‌স্



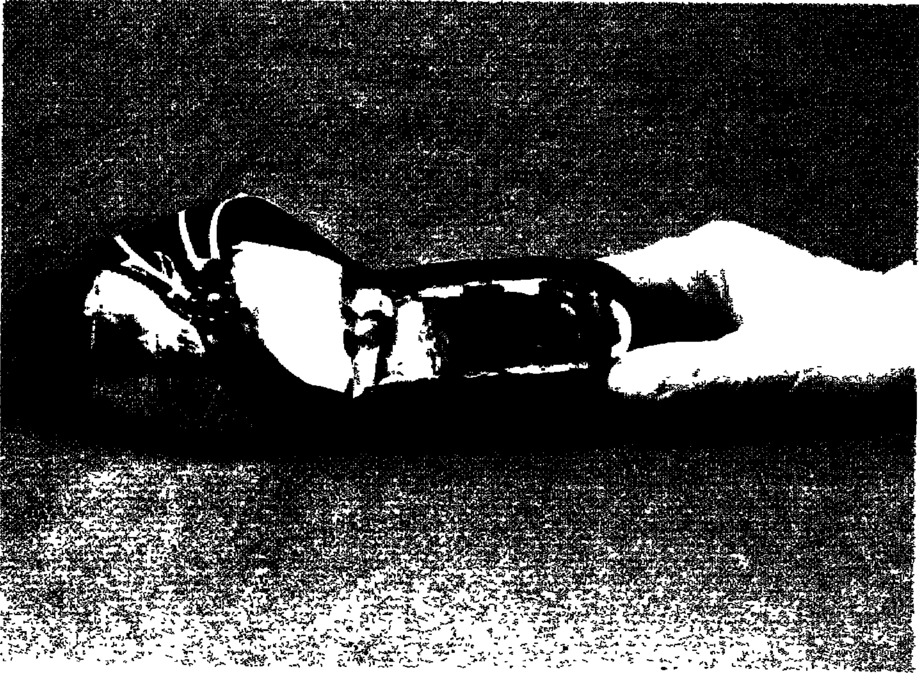
প্লেট 6: এল এস ডি



প্লেট 7: হেরোইন নেয়ায় সূঁচের দাগ



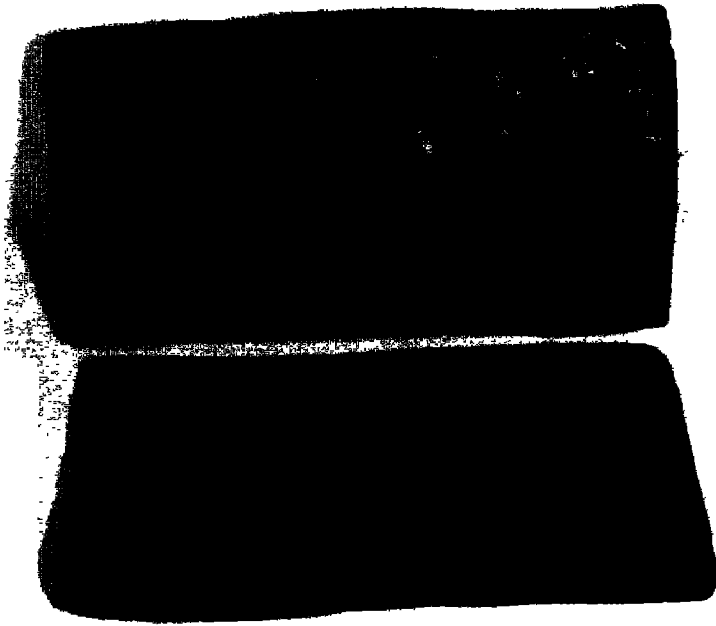
প্লেট 8: পায়ে সূঁচের দাগ



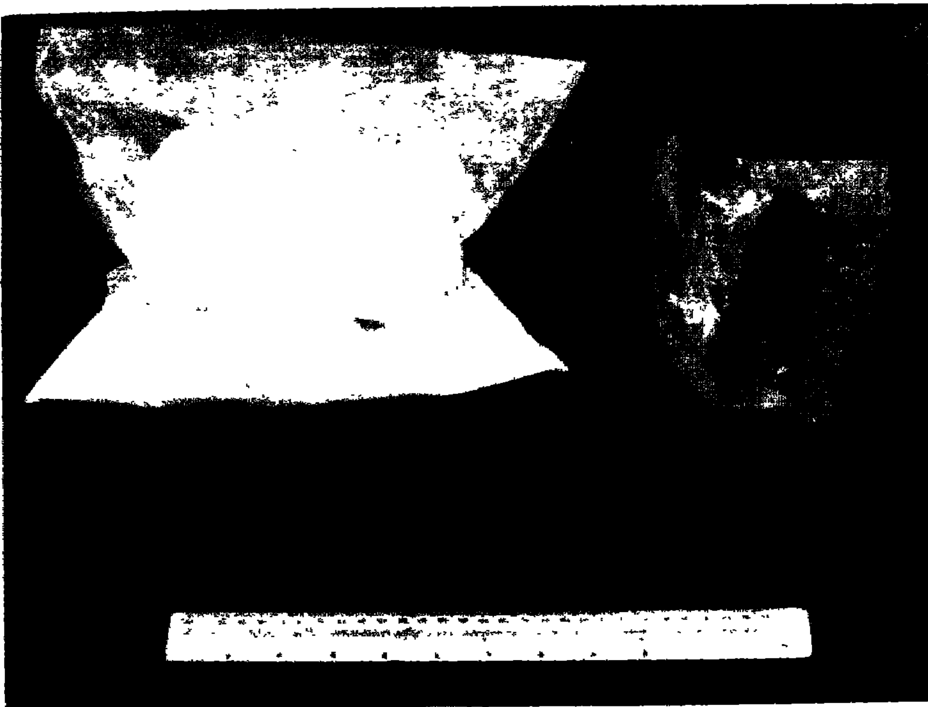
প্লেট 9: পাকিস্তান থেকে পাচার করা হেরোইন কাস্টমস্-এ ধরা পড়েছে



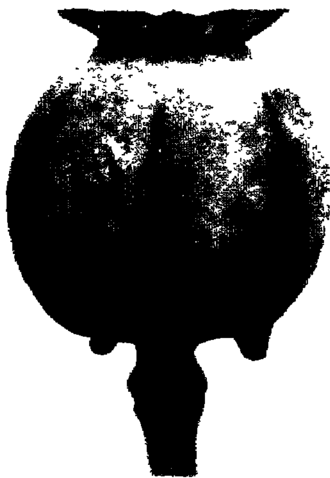
প্লেট 10: পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আসা ক্যানাবিসরে ইঁট



প্লেট 11: পাকিস্তান থেকে পাচার করা ক্যানাবিস



প্লেট 12: (ক) কলম্বিয়ার কোকেন



প্লেট 13: পপি ফুল থেকে কাঁচা আফিম গড়াচ্ছে। এ থেকেই হেরোইন তৈরি হয়।



প্লেট 14: পপি ফুল



প্লেট 15: উত্তর ভারতের ক্ষেতে পপি ফুল



প্লেট 16: হেরোইন নেবার বিচিত্র ভারতীয় পদ্ধতি



প্লেট 17: হেরোইন সরাসরি ধমনীতে ইঞ্জেক্ট করা যায়



প্লেট ১৪: মাদক দ্রব্য বিরোধী ডাক টিকিট। পপি ফুল হয়ে উঠেছে মাদক দ্রব্যের প্রতীক।



প্লেট 19: মাদক দ্রব্য বিরোধী ডাক টিকিট। মৃত্যুর পরোয়ানা।



চিত্র 32 সিগমুন্ড ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে কোকেন মরফিনের আসক্তি ছাড়াতে পারে।

ভ্যাসিলি ভন আনরেপ লক্ষ করেন যে চামড়ার তলায় কোকেন প্রবেশ করিয়ে পিন ফোটালে কোন যন্ত্রণা অনুভব করা যায় না। ওদিকে আমেরিকান চিকিৎসকরা লক্ষ করেন যে কোকেন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবদমনকারী ড্রাগগুলির ক্রিয়াশীল-তাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। তাই তারা এই মাদকটিকে মরফিন ও মদের নেশা ছাড়ানোর কাজে লাগানোর কথা ভাবতে থাকেন। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি বা সাইকো-অ্যানালিসিসের আবিষ্কর্তা প্রখ্যাত অস্ট্রীয় মনোরোগ চিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েড (1856-1939) বিশ্বাস করতেন যে কোকেন মরফিনের নেশা তাড়াতে পারে। ফ্রয়েড তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে মরফিনের নেশা ছাড়ানোর জন্য কোকেন খাওয়ার পরামর্শ দেন। এই বন্ধুটি হলেন, প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ ও পদার্থবিদ্ আর্নস্ট ভন ফ্লিশ্ল (1846-1891)। সত্যি কথা বলতে কি কোকেন মরফিনের নেশা ছাড়াতে তো পারেই না উপরন্তু রোগীকে কোকেনের নেশা ধরিয়ে দেয়। ফ্রয়েড নিজেই একজন কোকেনাসক্ত ছিলেন এবং সে কথা কখনই স্বীকার করতেন না। তিনি হতাশা দূর করার জন্য কোকেন সেবন করতেন। 1884 সালে তিনি কোকেনকে সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি এটিকে বদহজম, কৃশতা, মদের নেশা (মরফিনের নেশার পাশাপাশি) ও হাঁপানির ওষুধ হিসাবে অভিহিত করেন। শুধু তাই নয় তিনি এটিকে কামোদ্দীপক ও স্থানীয় অচেতক (অ্যানাস্থেটিক) হিসাবেও চিহ্নিত করেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, কোকেনের শেষোক্ত গুণটি ছাড়া আর কোনটিকেই গুরুত্ব দেয় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এক আধুনিক বিজ্ঞানী আর্লেনমায়ার কোকেনকে মানবজাতির তৃতীয় অভিশাপ (প্রথম দুটি আফিম ও মদ) শিরোপায় ভূষিত করেন। যদিও বর্তমানে তার মতামত সমর্থিত হয়েছে, প্রথম দিকে ফ্রয়েড তাকে তীব্র উপহাসের পাত্র প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোকেনকে একটি অকেজো ভেষজ বলে আর্লেনমায়ার একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রয়েড

প্রতিবাদ করেন যে আর্লেনমায়ার ভুল করে ভেষজটিকে চামড়ার নীচে প্রয়োগ করেছিলেন বলেই সেটি কোন কাজ দেয় নি। ড্রাগটি খেলে অনেক বেশি কার্যকর হয়। যদিও ফ্রয়েড কোকেনের দোষগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন তবু তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই মাদক দ্রব্যটির স্বপক্ষে নানা যুক্তি খাড়া করে গিয়েছেন।

কোকেনের সাথে আরেকজন প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিকের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে। ইনি হলেন শার্লক হোম্‌সের স্রষ্টা প্রবাদপ্রতিম স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (1859-1930)। তিনি নিজে যেমন ঘোর কোকেনাসক্ত ছিলেন, তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্রটিকেও কোকেনখোর বানিয়ে ছেড়েছিলেন। ডয়েলের লেখা গল্প উপন্যাসগুলিতে শার্লক হোম্‌সকে অবসর সময়ে কোকেনের ইঞ্জেকশন নিতে দেখা গেছে। বিখ্যাত 'সাইন অব ফোর' উপন্যাসে হোম্‌স বলেছিলেন যে কোন রহস্য বা সমস্যা না থাকলে তার ভাল লাগে না। এই ধরনের অলস মুহূর্তে তার কোকেনের মত কৃত্রিম উত্তেজক না থাকলে চলে না।

সৈনিকদের উপরও কোকেন প্রয়োগ করা হয়েছিল। 1883 সালে জার্মান সেনাদের চিকিৎসক অ্যাসেনব্রান্ডট ব্যাভেরিয়ান সৈনিকদের ক্লান্তি দূর করার জন্য কোকেন ব্যবহার করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর কর্সিকান রসায়নবিদ্ অ্যাঞ্জেলো মারিয়ানি উচ্চশ্রেণীর বর্দো মদের সাথে কোকেন পাতা মিশিয়ে একটি বিচিত্র মিশ্রণ প্রস্তুত করেন আর তার নাম দেন 'ভিন মারিয়ানি' বা 'মারিয়ানি ওয়াইন'। মারিয়ানি ওয়াইন দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আর অ্যাঞ্জেলো একজন কোকা মদের সফল আন্তর্জাতিক প্রচারক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা,



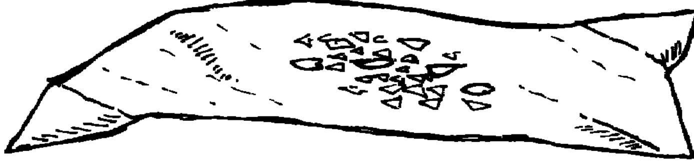
চিত্র 33: নানা সাহিত্যের নায়ক কোকেনাসক্ত ছিল। শার্লক হোমসের কথা সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

রানী, রাজপুরুষ, বিজ্ঞানী, লেখক, অভিনেতা অভিনেত্রী এবং অসংখ্য মানুষ কোকেন-জ্বরে আক্রান্ত হয়।

আমেরিকার কোকেনের নেশার ইতিহাসটিও খুব বিচিত্র। 'আধুনিক শল্যচিকিৎসার জনক' উইলিয়াম স্টেওয়ার্ড হল্‌স্টেড (1852-1922), 1884 সাল নাগাদ অনুভূতিনাশক বা অচেতক (অ্যানাস্থেটিক) হিসাবে কোকেনের ব্যবহারের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। তিনি লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া বা অঙ্গবিশেষের চেতনানাশ করতে কোকেনের ইঞ্জেক্‌শন দেওয়ার প্রবর্তন করেন বটে কিন্তু নিজেই কোকেনাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই নেশা ছাড়াবার জন্য তাকে অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়েছিল।

কোন এক সময়ে কোকেনকে যক্ষ্মা বা টিবির প্রতিষেধক ভাবা হয়েছিল। স্কটিশ সাহিত্যিক রবার্ট লুই স্টিভেনসন তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। 1885 সালে তার রোগের আরোগ্যের জন্যে দীর্ঘকাল একটি স্বাস্থ্যালয় বা স্যানিটোরিয়ামে কোকেন সহযোগে চিকিৎসা করিয়েছিলেন। এই চিকিৎসা চলাকালীন তিনি মাত্র তিন দিনে বিখ্যাত উপন্যাস ড. জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড লিখেছিলেন। 1886 সালে আটলান্টা শহরের অধিবাসী জন স্টাইথ পেম্বারটন কোকা পাতা থেকে কোকেন আর আফ্রিকান কোলা বাদাম থেকে ক্যাফিন নিঃসৃত করে একটি ঔষধ তৈরী করেন। তিনি বাজারে এটি 'কোকা-কোলা' নাম দিয়ে ছাড়েন। পেম্বারটনের ফর্মুলাটি (কোকা-কোলা প্রস্তুত করার উপায়) কিনে নিয়ে আসা শ্যান্ডলার এটিতে হাওয়া ভরে একটি বায়ুমিশ্রিত বা এয়ারেটেড পানীয়ে রূপান্তরিত করেন। বিখ্যাত কোকা-কোলা কোম্পানি এভাবেই জন্ম নেয়। এই পানীয়টি মাথা যন্ত্রণা, হতাশা আর হিস্টিরিয়া রোগের ওষুধ হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল। 1906 সালে কোকা কোলা কোম্পানি পানীয়টি থেকে কোকেন তুলে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাও এটির জনপ্রিয়তা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আজও কোকো-কোলা কোম্পানি পেরু ও বলিভিয়া থেকে নিউজার্সিতে বছরে প্রায় 200 টন কোকা পাতা আমদানী করে। এই শহরে কোকা পাতা থেকে কোকেন পৃথক করে ওষুধ শিল্পে কাজে লাগানো হয়। কোকেনহীন অবশিষ্ট পাতাগুলিকে এর পরে কোকা-কোলার বিখ্যাত ফ্লেবার বা সুবাস আনার জন্যে ঠাণ্ডা পানীয়তে ব্যবহার করা হয়। আজ দেড়শোটিরও বেশি দেশে কোকা-কোলা একটি জনপ্রিয় ঠাণ্ডা পানীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোকেনের আসক্তি একসময়ে উন্মাদনার চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। তাই 1914 সালে এই নেশাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে 'হ্যারিসন নারকোটিক আইন' চালু করা হয়। এই আইনটি ঘটনাক্রমে আফিম, মরফিন ও আফিমের নেশাও নিষিদ্ধ করে দেয়। আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও লোকে বেপরোয়াভাবে



চিত্র 34 : ক্র্যাকের ছোট ছোট টুকরো।

কোকেনের নেশা চালিয়ে যায়। 1920 সালে চিত্রাভিনেতা চেল্‌সিয়া আর্টস্‌ বল এই মাদক দ্রব্যের নেশার ফলে হঠাৎ মারা গেলে কোকেন আবার খবরের শিরোনামে আসে।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কোকেনের নেশা খুব একটা বাড়ে নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে, বিশেষত ষাটের দশকে, যখন আমেরিকায় এক লাগামছাড়া মুক্তির জোয়ার এসেছে, তখন কোকেনের নেশা একটি বিপজ্জনক রূপ ধারণ করে। সরকার সমস্যাটিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। কোকেন চাষের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। কিন্তু কোকেনের চাহিদা ও কোকেনাসক্তি সমানে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজও সে দেশে প্রায় ষাট লক্ষ কোকেনাসক্ত আছে। 1987 সালে এই মাদকের আসক্তি 1600 মৃত্যুর কারণ হয়।

কোকেনের ব্যবসা আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। শুধু দক্ষিণ আমেরিকাতেই চার লক্ষ একর জমিতে বেআইনিভাবে কোকেন চাষ করা হয়। সর্বোচ্চ কোকেন উৎপাদিত হয় পেরুতে (প্রায় ষাট শতাংশ)। এদেশে প্রায় 2·4 লক্ষ একর জমিতে এই মাদকের চাষ হয়। এর পরেই বলিভিয়া আর কলম্বিয়ার স্থান। বলিভিয়াতে 90,000 একর জমি (পৃথিবীর মোট কোকেন উৎপাদনের 22·5 শতাংশ) আর কলম্বিয়ার 60,000 একর জমি (15 শতাংশ) কোকেন চাষের আওতায় পড়ে। প্রতিবেশী দেশ ব্রাজিল, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা ও আর্জেন্টিনার কিছু অংশেও এই মাদকদ্রব্যের চাষ হয়। দুশ্চিন্তার কথা হল যে প্রতি বছর প্রায় শতকরা দশ ভাগ হারে এই চাষের এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষিজাত সব কোকাগাছই বেআইনি হয় না। কয়েকটি ক্ষেত্রে ওষুধ হিসাবে এবং আইন মোতাবেক খাওয়ার জন্যেও এর ব্যবহার হয়। পেরুতে উৎপন্ন সব কোকাপাতা একটি সরকারী সংস্থা এনাকোকে বিক্রি করতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ কোকাপাতা বেআইনি পথে কলম্বিয়া পৌঁছয়। এখানে বলিভিয়া ও অন্যান্য দেশের পাতাও এসে হাজির হয়। এখানকার বিশাল লেবরেটরিগুলি পাতা থেকে কোকেন বিচ্ছিন্ন করে উত্তর আমেরিকায় (প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) পাচার করে।

কোকেনের চোরাকারবার

চোরাকারবারীদের বেআইনি কোকেন প্রধানত তিনটি উপায়ে রাস্তাঘাটে পাওয়া যায়। জলের সাথে অ্যামোনিয়া বা বেকিং সোডা মিশিয়ে। 'ক্র্যাক নামে পরিচিত ক্ষুদ্র কঠিন প্রস্তরবত কোকেন প্রস্তুত করা হয়। 'ক্র্যাক' অনেকটা সাদা পাথরের ছোট্ট টুকরোর মত দেখায় আর একে 'পাথর'ও বলে। এটি সাধারণত ধূমপানের কাজে ব্যবহৃত হয়। স্তরীভূত বা 'ফ্রেক' আকৃতির শুদ্ধ কোকেনকে ভেঙে খেতে কোকেনাসক্তরা খুব ভালবাসে। তৃতীয়ত উল্লেখ করতে হয় গুঁড়ো কোকেনের। এটি সাধারণত 'ক্র্যাক' বা 'ফ্রেক'কে গুঁড়ো করে দুধের গুঁড়ো বা প্রোকেইনের (কোকেন-সদৃশ কৃত্রিম রাসায়নিক) সাথে মিশিয়ে তৈরী করা হয়।

ঠিক হেরোইনের মতই কোকেনও বেআইনি লেবরেটরির চার দেওয়াল পেরিয়ে, নানা হাত ঘুরে নেশাড়ুর কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে ভেজালে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভেজাল মেশানোর এই প্রক্রিয়াটিকে চোরাকারবারীরা বলে 'কাটছাঁট করা'। কোকেনের কারবারীরা অবশ্য এই মাদক দ্রব্যটির দ্রুত কার্যকরতা হ্রাস পাওয়ার ধর্মটি সম্বন্ধে ভালভাবেই ওয়াকিবহাল থাকে। এই মাদকের চোরাচালানে মস্ত অসুবিধা হল যে আর্দ্রতা, উষ্ণতা, হাওয়া বাতাস বা সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসলে এটির গুণ সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। হেরোইনের মত অত সহজে এতে ক্রমাগত ভেজাল মেশানো যায় না। এক্ষেত্রে ভেজাল হিসাবে পরিচিত রাসায়নিকগুলিই কিছু মাত্রায় মাদকটির 'গুণাগুণ' নষ্ট করে দেয়। তাই কারবারীরা চটপট এই দ্রব্যের হাত বদল ঘটায়। তাছাড়া হেরোইনের মত ব্যাপকহারে ভেজাল মেশানোও কোকেনের বেলায় সম্ভবপর হয় না। সর্বোচ্চ ভেজাল মিশ্রিত হেরোইনে মাত্র 5 শতাংশ খাঁটি মাদকদ্রব্য থাকে, কিন্তু কোকেনের বেলায় এই মাত্রা কখনই 20 থেকে 30 শতাংশের কম হয়না। 'কাটছাঁট' করতে সাধারণত বেকিং সোডা, গুঁড়ো চিনি বা দুধ, শর্করা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এই ভেজালগুলোর মত কোকেনের রঙও সাদা কেলাসাকার হয়—তাই সহজে ধরা যায় না। এছাড়া ল্যাক্টোজ, ডেক্সট্রোজ, এপসোম লবণ (ম্যাগনেসিয়াম সালফেট), কুইনিন বা গুঁড়ো ভিটামিনও ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো মিথামফিটামাইন (একে 'স্পিড'ও বলে) নামের একটি মারাত্মক রাসায়নিকও ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বিশুদ্ধতা পরিমাপের উপায়

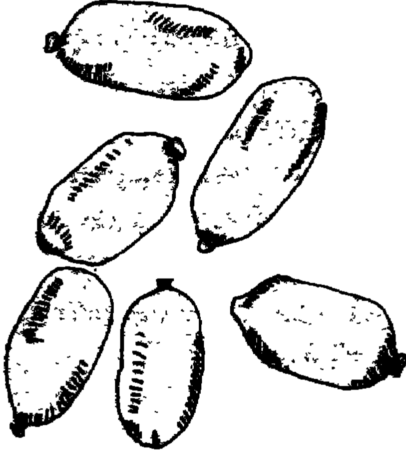
হাত বদলের সময় প্রতিটি চোরাচালানকারীকে 'মালের' বিশুদ্ধ কোকেনের পরিমাণ জানিয়ে দিতে হয়। সঠিক তথ্যটি জানা না থাকলে পরবর্তী ধাপে 'কাটছাঁট' করা মুশকিল হয়। কিন্তু সব সময় তথ্যটি নির্ভরযোগ্য হয় না। তাই প্রত্যেক ব্যাপারী

নিজেই মালের বিশুদ্ধতা যাচাই করে নেয়। মজার কথা হল যে যদিও কারবারীদের অধিকাংশই 'ক-অক্ষর গোমাংস' মাস্তান শ্রেণীর হয়, এদের যাচাই করার পদ্ধতি গুলো নিখুঁত আর বিজ্ঞানসম্মত। বিশুদ্ধ যাচাইয়ের যন্ত্রপাতিগুলির অধিকাংশ এই অন্ধকার জগতেই তৈরী হয়। কিছু কিছু অবশ্য আইন প্রণয়ন দপ্তর থেকেও সরিয়ে আনা হয়। কোকেনের বিশুদ্ধতা যাচাই করতে প্রধান যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় তার নাম কোবাল্ট থায়োসায়ানেট। কোকেন (বা এ জাতীয় অন্য কোন রাসায়নিক যেমন প্রোকেন, লিগনোকেন, টেট্রাকেন) কোবাল্ট থায়োসায়ানেটের সংস্পর্শে একটি নীল স্তরীভূত অধঃক্ষেপ (পাত্রের নীচে পড়ে থাকা অদ্রাব্য বস্তু) গঠন করে। এই বিজ্ঞানসম্মত রাসায়নিক পরীক্ষাটি জানিয়ে দেয় মালের মধ্যে খাঁটি কোকেনের মাত্রা। মালে প্রোকেন মেশানো থাকলে অধঃক্ষেপের রঙ নীল হবে। ভেজালের মাত্রা অত্যধিক মনে হলে অধঃক্ষেপটিতে স্ট্যানাস ক্লোরাইড মেশানো হয়। যার ফলে কোকেন ব্যতীত অন্যান্য ভেজালগুলো দ্রবীভূত হয়ে যায়। শুধু কোকেনই অধঃক্ষেপে থেকে যায় আর বিশুদ্ধতার হার জানিয়ে দেয়।

আরেকটা সরল পরীক্ষা প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে সামান্য কোকেনের গুঁড়ো এক গ্লাস জলে ঢালা হয়। খাঁটি কোকেন চটপট গুলে যায় বা দ্রবীভূত হয়ে যায়। ভেজাল বা 'কাট' কোকেন কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতিতে দ্রবীভূত হয়। অন্য আরেকটি পরীক্ষাতে ছোট্ট এক বোতল সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটে কোকেন ফেলে দিলে তা সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভূত হয়ে যায় কিন্তু প্রোকেন ও অন্যান্য ভেজাল পাত্রটির তলায় অধঃক্ষিপ্ত হয় আর কমলা বর্ণ ধারণ করে। এই পরীক্ষাকে 'ব্লিচ টেস্ট' বলে।

একটি অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলে (ফিন্‌ফিনে পাতে) কোকেনের গুঁড়ো রেখে হালকা আগুনের ওপর রাখলে কোকেন পুড়ে যায় আর পাতে কোন দাগ থাকে না। কিন্তু ভেজাল চিনি থাকলে পাতটিতে পোড়ার কালো দাগ পড়ে যাবে। ভেজালের পরিমাণ যত বেশি হবে পোড়া দাগটা তত কালো হবে। অবিশুদ্ধি হিসাবে মিথামফিটামাইন থাকলে পোড়া জিনিসটা অ্যালুমিনিয়াম পাতে মৃদু শব্দে ফাটতে থাকে। অন্যান্য রাসায়নিক লবণ পোড়ে না—অবশেষ হিসাবে পাতে পড়ে থাকে। প্রোকেন ও কোকেনের মত পরিষ্কার ভাবে পোড়ে কিন্তু পোড়ার ঠিক আগে বিচিত্র বুদ্‌বুদ্ কাটে বলে সহজেই ধরা পড়ে যায়।

ওস্তাদ কোকেন ব্যাপারী অবশ্য চেহারা দেখেই মাদক দ্রব্যটির শুদ্ধতার মাত্রা ধরে ফেলে। খাঁটি কোকেনের কেলাস চক্‌চকে আর স্বচ্ছ হয়। গুঁড়ো করে ফেললেও এই চক্‌চকে ভাবটা থেকে যায়। ভেজাল মেশালে এই ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পেয়ে যায়। বহু কোকেন-কারবারী বিশুদ্ধতা যাচাই করতে মাদক দ্রব্যটি চেখে দেখে। খাঁটি কোকেনের স্বাদ তেতো হয় আর ভেজাল মেশালে এই স্বাদ পাল্টে যায়। ল্যাক্টোজ বা গুঁড়ো-দুধ মেশালে মাদকটি খেতে মিষ্টি লাগে। ডেক্সট্রোজ



চিত্র 35 কন্ডোম ভর্তি কোকেন।

মেশালে মিষ্টতা আরো তীব্র হয়। প্রোকেনের স্বাদও তেতো কিন্তু এটি মুখে দেওয়া মাত্র মাড়ি ও জিভ অসাড় হয়ে যায় আর বহুক্ষণ অনুভূতি হীন হয়ে থাকে। রাসায়নিক লবণগুলি জিভে অদ্ভুত স্বাদ রেখে যায় আর এপসোম লবণ একটু বেশি টক হয় আর এর দানাগুলো বালি-বালি হয়। অধিকাংশ ব্যবসায়ী হাতে কলমে বিশুদ্ধতা যাচাই করে নেয় অর্থাৎ নাকের কাছে মাদকের ঘ্রাণ নিয়ে খাঁটি কিনা দেখে নেয়। নাক-চোখে জ্বালা জ্বালা ভাব আর চোখ দিয়ে জল গড়ালে বুঝতে হবে ভেজাল হিসাবে 'স্পিড' (মিথামফিটামাইন) মেশানো আছে। শর্করা আর লবণ জাতীয় ভেজাল নাকের জ্বলুনি বাড়িয়ে দেয় আর গলার কাছটা ভেজা-ভেজা ঠেকে। এপসোম লবণের সাথে কুইনিন মেশানো থাকলে ভেজালের মাত্রা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বেশিমাত্রায় প্রোকেন থাকলে মাদকটির অসাড় করার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

কোকেনের বিশুদ্ধতা যাচাই করার পর কোকেন-কারবারী 'কাটছাঁটে'র কাজে নেমে পড়ে। প্রথমে সামান্য একটু মাদকে ভেজাল মিশিয়ে নমুনা তৈরী করা হয়। এই নমুনাটি চেখে দেখে নিয়ে পুরো মাল 'কাটছাঁট করা হয়। তারপরেই চট্জলদি সেটাকে পাচার করে দেওয়া হয় কারণ ভেজাল মেশানোর পর কোকেনের কার্যকরতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। মাল পাচারে দেরী হয়ে গেলে সেটিকে ফ্রিজে বা শীতল কোন জায়গায় গাঢ় রঙের জারে (সূর্যালোকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য) সিল করে রেখে দেওয়া হয়।

ভেজাল কোকেন পাচার করার সময় একটি অদ্ভুত উপায়ে প্যাকিং করার রীতি প্রচলিত আছে। রবারের কন্ডোমে 15 থেকে 90 গ্রাম ওজনের কোকেন পুরে দেওয়া হয়। বেশি পরিমাণে (175 গ্রাম পর্যন্ত) প্যাক করতে হলে বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া আরেকটি কিম্ভুত উপায়ে কোকেনের চোরাচালান হয় বেজায় ধূর্ত স্মাগলাররা কাস্টম অধিকর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে মুখভর্তি কোকেনের কন্ডোম নিয়ে পালিয়ে যায়। একে বলে 'বডি প্যাকিং' আর এই বিচিত্র চোরাচালানকারীদের বলে 'বডি প্যাকার্স'। মুখে কন্ডোমের প্যাকেট নিয়েই বডি প্যাকার্সরা সেগুলিকে

গিলে খেয়ে নেয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তারা পায়খানায় ছোটে। মলের থেকে কন্ডোমের প্যাকেটগুলি উদ্ধার করে কোকেন বের করা হয়। এইভাবে কন্ডোমের প্যাকেটে ভরে গিলে ফেলা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। কখনো কখনো ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষারীয় পরিবেশে কন্ডোমের রবার ফেটে বডি প্যাকারের মৃত্যু ঘটায়। মাত্র 1200 মিলিগ্রাম কোকেন মৃত্যু ঘটাতে পারে আর কন্ডোমগুলি ভেজাল মেশানো কোকেনের পরিমাণ অন্তত 90,000 গ্রাম হয়। এই ধরনের দুর্ঘটনা তখনই ঘটে যখন কাস্টম অফিসাররা কোন বডি প্যাকারকে সন্দেহের বশে আটক করে জেরা করতে থাকেন। সন্ধে পর্যন্ত পাচারকারীর দেহে কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় পরেরদিন সকালবেলায় লোকটি হঠাৎ মারা গেছে। মৃতদেহের এক্স-রে করলেই কন্ডোমে বোঝাই কোকেনের উপস্থিতি ধরা পড়ে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে কোকেনের ব্যবহার

সেই 1870 সালে এক্স্টিন নামের এক বিজ্ঞানী কোকেনের অনুভূতি নাশ করার ক্ষমতার (বিশেষত চোখের) কথা বলেছিলেন। তাঁর মত ছিল যে চোখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপারেশনের আগে কোকেন ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলে কোন যন্ত্রণার অনুভূতি থাকে না। 1884 সালে ভিয়েনা শহরে কার্ল কোলার সর্বপ্রথম কোন অঙ্গের যন্ত্রণা উপশম করার জন্য কোকেন ব্যবহার করেন। শল্যচিকিৎসকরা লক্ষ করেন যে কোকেন প্রয়োগ করলে রক্তবাহী নালিকাগুলির সংকোচন ঘটে যার ফলে শল্যচিকিৎসার সময়ে রক্তপাতও খুব কম হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে তারা বুঝতে পারেন, রক্তনালিকার সংকোচন চোখের ক্ষতি করে। তাই আজকাল চোখের শল্যচিকিৎসায় কোকেন ব্যবহার করা হয় না।

কোকেন-সদৃশ কয়েকটি কৃত্রিম ড্রাগ (প্রোকেন, লিগনোকেন) আজকাল বাজারে পাওয়া যায়। এই ড্রাগগুলি অঙ্গবিশেষকে অসাড় করতে পারে (লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া) আর এদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কোকেনের চেয়ে কম ক্ষতিকর। তবুও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আজও অবশ করার জন্য কোকেন প্রয়োগ করা হয়। ই-এন-টি বা নাক-কান-গলার বিশেষজ্ঞ, প্লাস্টিক সার্জন এবং সঙ্কটজনক অবস্থায় কার্যরত চিকিৎসকরা কোকেন ব্যবহার করে থাকেন। ই-এন-টি চিকিৎসকরা নাকের শল্যচিকিৎসা (রক্তপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে) এবং রাইনোপ্লাস্টি অপারেশনের (নাকের গঠন পাল্টে দেয় এই অপারেশন) সময় কোকেন ব্যবহার করেন। সঙ্কটজনককালে চিকিৎসকরা শ্বাসনালীতে বায়ুনল প্রবেশ করানোর সময় (শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করার উদ্দেশ্যে), রক্তপাত এড়ানোর জন্য কোকেন ব্যবহার করে।

বায়ুনালী পরিদর্শন করার জন্য ব্রঙ্কোস্কোপ নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

এই যন্ত্রের সরু একটি নল বায়ুনালীতে প্রবেশ করিয়ে অন্তর্বীক্ষণ করা হয়। এই নল প্রবেশ করানোর সময় যন্ত্রণা ও রক্তপাত নিবারণের জন্য কোকেন ব্যবহার করা হয়। ইউরোপে ক্যানসার রোগীদের যন্ত্রণা উপশমের জন্য ব্রম্পটনের মিক্সচার ব্যবহার করা হয়—যার একটি প্রধান উপাদান কোকেন। এককালে সাময়িকভাবে দেহের কোন অংশকে অবশ করার কাজে এপিনেফ্রিন নামের একটি ড্রাগের সাথে কোকেন মিশিয়ে প্রয়োগ করা হত। এই মিশ্রণটির নাম ছিল 'কোকেনের কাদা', দ্রবণটির বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার কথা জানার পর চিকিৎসকরা এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এখন উত্তেজক, কামোদ্দীপক বা হাঁপানি রোগের চিকিৎসাতেও কোকেনের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কোকেনের কার্যপ্রক্রিয়া

কোকেন কিভাবে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে কাজ করে তা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো স্পষ্ট হয় নি। কিন্তু কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খাড়া করা হয়েছে। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে ডোপামিন নামে একটি রাসায়নিক আছে। এই রাসায়নিকটি একপ্রকারের স্নায়বিক প্রেরকপদার্থ। এই রাসায়নিকগুলি স্নায়ুর মাধ্যমে নানা গুরুত্বপূর্ণ স্নায়বিক তথ্যের আদান-প্রদান করে। এদের কাজ অনেকটা বার্তাবহ পায়রার মত। এরা না থাকলে জরুরি তথ্য সম্প্রচার করা সম্ভবপর হত না আর সব খবরাখবর প্রথম স্নায়ুকোষটির প্রান্তে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে যেত। ওদিকে বার্তাপ্রেরক পায়রার সংখ্যা অগুন্তি হলে অসংখ্য অর্থহীন তথ্য সম্প্রচারিত হত যার ফলে স্নায়ুতন্ত্রে বিরাট গোলমাল দেখা দিত। তাই আমাদের দেহের অভ্যন্তরে ডোপামাইনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি আছে যা ডোপামাইনের মাত্রাকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখে। শরীরে কোকেন প্রবেশ করলে ডোপামাইনের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই কারণেই কোকেন সবকিছু ওলট-পালট করে দেয়।

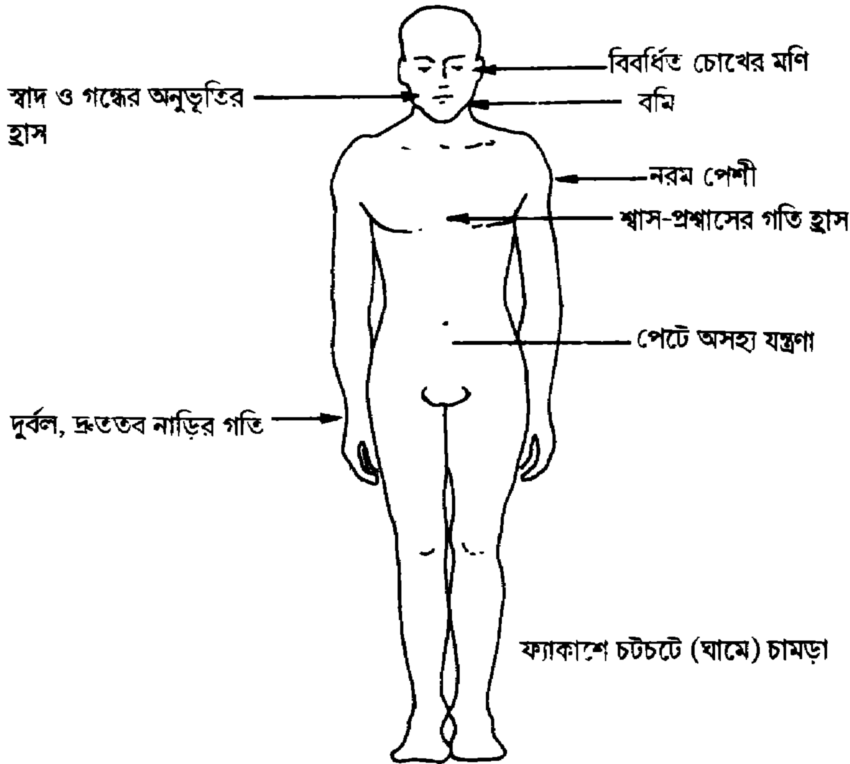
তবে এই ব্যাখ্যা দিয়ে কোকেনাসক্তির সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ধরনের অনেক মাদকদ্রব্য ডোপামাইনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু তারা কেন লাগামছাড়া আনন্দের অনুভূতি আনে না? বোঝাই যাচ্ছে, কোকেনের কার্যপ্রক্রিয়া বিজ্ঞানীদের কাছে আজও ধাঁধা হয়ে আছে। তবে জোরকদমে গবেষণা চলছে—মনে হয় শিগগির এর উত্তর পাওয়া যাবে।

শরীরে কোকেনের প্রভাব

প্রথমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে ও পরে কোকেন সেখানে অবদমনের (ডিপ্রেসন) কাজ করে। একে 'চেইন রিঅ্যাকশন' বা 'শৃঙ্খল বিক্রিয়া' বলে (অর্থাৎ

ক্রমিক ক্রিয়া) উত্তেজনার প্রাথমিক অবস্থাটিতে ক্রমিকভাবে উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, মাথা-যন্ত্রণা, বিবমিষা, বমি, গালের ক্ষুদ্র পেশী ও আঙুল হাত বা থাই (জংঘা)-এর পেশীর সংকোচন দেখা যায়। নাড়ির গতি (পাল্‌স বিট) দেহের তাপমাত্রা (কোকেন জ্বর), রক্তচাপ আর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিও বেড়ে যায়। চোখের মণি বড় হয়ে যায় (মরফিনের বেলায় কিন্তু মণি সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায়)। উত্তেজনার পরবর্তী দশায় খিঁচুনি আর শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। অবদমনের দশাটিতে, পেশীর পক্ষাঘাত, চেতনানাশ এমনকি মৃত্যুও আসতে পারে। এত ঝুটঝামেলা সত্ত্বেও লোকে কোকেন সেবন করে কারণ এটি প্রথামিক দশায় এমন সুখকর অনুভূতি এনে দেয় যাকে নেশাখোরেরা প্রায়শই যৌন সম্ভোগের চূড়ান্ত অনুভূতির সাথে তুলনা করে থাকে। তাই কোকেনের তুলনা করা যায় সেই গ্রীক রূপকথার সাইরেনের সাথে যার মধুর শব্দ মানুষকে প্রলুব্ধ করে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যেত।

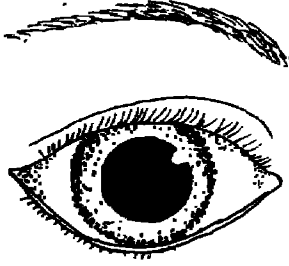
কখনো কখনো কোকেনাসক্তরা মানসিকভাবে তীব্র আলোড়নের সম্মুখীন হয়।

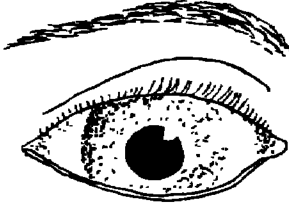


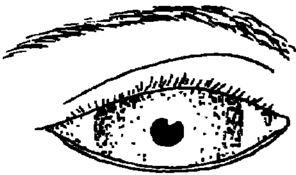
চিত্র 36. কোকেন-নেশার নানা চিহ্ন ও উপসর্গ

এই প্রক্রিয়াকে বলে 'কোকেন লিপ' বা 'কোকেন উল্লম্ফন'। দীর্ঘকালীন কোকেনাসক্ত ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে চামড়ার তলায় 'পোকামাকড়ের চলাফেরা' অনুভব করতে থাকে আর শরীর দারুণভাবে চুলকাতে থাকে। চুলকানির চোটে মাঝে-মাঝে ছালচামড়া উঠে যাবার দাখিল হয়। কাল্পনিক পোকাগুলিকে 'কোকেনের পোকা' বলে আর বহির্লক্ষণটিকে 'ম্যানিয়ানের লক্ষণ' বলে। এই লক্ষণটির কথা প্রথম বলেন প্যারিসের মনোরোগবিশেষজ্ঞ ভ্যালেন্টিন জ্যাক্স জোসেফ ম্যাগনান (জন্ম 1835)।

প্রথম অধ্যায়ে সহ্য ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে। কোকেনের ক্ষেত্রে একটি বিচিত্র ক্রিয়া দেখা যায় যাকে পাল্টা-সহ্য ক্ষমতা বা রিভার্স টলারেন্স বলে। এই প্রক্রিয়াটিতে প্রথমদিকে নির্দিষ্ট মাত্রার মাদক শরীরের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের পর একই মাত্রার ওষুধ নানা মারাত্মক উপসর্গের (যেমন মাংসপেশীর আক্ষেপ) জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়াটি মস্তিষ্কে নানা জটিল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাই একে 'অগ্নিসংযোগ-প্রক্রিয়া' বা 'কিন্ড্‌লিং-ফেনোমেননও' বলে।


বিবর্ধিত


স্বাভাবিক


সঙ্কুচিত


চিত্র 37: বিবর্ধিত, স্বাভাবিক ও সঙ্কুচিত চোখের মণি।

বিনোদন ও আসক্তি

কোকেনাসক্তি একটি অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ বদভ্যাস তাই একে 'রাজসিক বিনোদন' বলা হয়। সাধারণত বেশ্যাবৃত্তির সাথে জড়িত লোকজন, সঙ্গীত রসিক আর ধনকুবেরদের কাছে কোকেন অত্যন্ত জনপ্রিয় নেশার জিনিস। এই নেশার নানা পদ্ধতি চালু আছে কিন্তু ঘ্রাণের মাধ্যমে নেশার প্রক্রিয়াটিই সর্বাধিক জনপ্রিয়। নাক দিয়ে কোকেনের গন্ধ প্রবেশ করা মাত্র 'এক ঝলক' আনন্দানুভূতি আসে যা প্রায় আধ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। সরাসরি শিরায় কোকেন প্রবেশ করালেও সেই আধ ঘণ্টা মাত্রাহীন আনন্দে ভেসে

থাকা যায়। গিলে বা গলাধঃকরণ করে খেলে 'ঝলক'-এর ঠিক আমেজটা আসে না। তাই নেশাড়ুরা কোকেন গেলা পছন্দ করে না। কিন্তু খেলে পর এই মৃদু ঝলক প্রায় ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হয়।

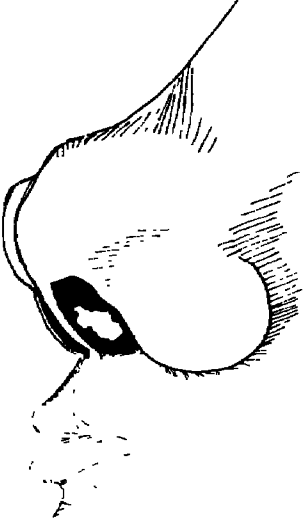
ইঞ্জেকশন দিলে নেশাটা তীব্রতম হয়। যদিও ঘ্রাণের মাধ্যমে নেশার তীব্রতা সামান্য কম হয়, নেশাখোরেরা প্রথম পদ্ধতিটি বেশি পছন্দ করে।

ঘ্রাণের মাধ্যমে কোকেনের নেশা

এই পদ্ধতিটিতে নেশাখোর, নাকের একটি ছিদ্রকে আঙুল দিয়ে চেপে বন্ধ রেখে অন্য ছিদ্র দিয়ে জোরে টান মারে। এর ফলে ঘ্রাণের মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে কোকেন শরীরে প্রবেশ করে। ঘ্রাণ নেওয়া মাত্র নাক জ্বলতে থাকে। জ্বালার মাত্রা বহুলাংশে নির্ভর করে মাদক-দ্রব্যটির বিশুদ্ধতার উপর। কাটছাঁটে ব্যবহৃত ভেজাল বেশি হলে জ্বালার মাত্রার রকমফের ঘটে। কাটছাঁটে প্রোকেন ব্যবহার করলে নাকে শীতল-অনুভূতি আসে। একটানে এক গ্রামের এক দশমাংশ থেকে আধ গ্রাম কোকেনের ঘ্রাণ নেওয়া যায়। মাঝে-মাঝে কোকেনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দানা নাকের লোমে আটকে থেকে যায় আর ভীষণ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে নাকে ঘা ও রক্তক্ষরণও হতে পারে। নাকের দুটি ছিদ্রের মধ্যবর্তী দেওয়াল বা 'ন্যাসাল সেপ্টামটি (এটি তরুণাস্থি নির্মিত হয়)' অতিরিক্ত কোকেনের ঘ্রাণ নিতে-নিতে ছিদ্রাল হয়ে যায়। কোকেনাসক্তরা তাদের ঘ্রাণশক্তিও হারিয়ে ফেলে।

মাথার খুলির সাইনাস গহ্বরগুলিতেও কোকেন আটকে পড়ে তীব্র অস্বস্তি সৃষ্টি করে। সাইনাসগুলি যাতে বুজে না যায়, নেশাড়ুরা কোকেন নেওয়ার আগে সেটিকে গুঁড়িয়ে মিহি করে নেয়। ধারালো কোন যন্ত্রের (ক্ষুর বা ব্লেড) সাহায্যে অথবা হামানদিস্তেতে গুঁড়িয়ে দানাগুলিকে মিহি করা হয়। দানা যত মিহি হবে, সাইনাসে বা নাকে আটকে পড়ার সম্ভাবনাও তত কম হবে। বহু নেশাখোর কোকেনে টান মারার পর নাকে জল দিয়ে অবশিষ্ট দানাগুলোকে ধুয়ে ফেলে যাতে লোমে কোন দানা আটকে না থাকে। অনেকে আবার নাকে স্প্রে বা ভেসলিন লাগিয়ে নাকের ঝিল্লীগুলিকে রক্ষা করে। তবে অধিকাংশ নেশাখোর ফুর্তির চোটে স্রেফ টেনে যায়। তারা বুজে যাওয়া সাইনাস বা নাকের অস্বস্তির তোয়াক্কা করে না।

একদল নেশাড়ু কাগজ কিংবা ছুরির ফলায় কোকেন রেখে নাকের কাছে এনে জোর টান লাগায়। আরেক দল অবশ্য বেশ সাড়ম্বরে এই টান মারে। এরা হেড শপ (ড্রাগের মাল-মশলা বিক্রির বেআইনি দোকান) থেকে একটি ছোট্ট কারুকার্যখচিত চামচ কেনে। এই কোক-চামচটিতে প্রায় 50 মিলিগ্রাম গুঁড়ো-কোকেন ধরে। চামচটিতে কোকেন নিয়ে নাকের কাছে ধরে মেজাজে টান মারতে হয়। এই চামচটি আবার নেশাড়ু তার গলার চেনে কায়দা করে ঝুলিয়ে রাখে। চেনে



চিত্র 38 ক্রমাগত কোকেন নিঃশ্বাসের সাথে (নস্যির মত) টানলে নাকের বিভাজনে ছিদ্র দেখা যায়।

কারুকার্যখচিত চামচ দেখে কোকেনখোরকে সহজেই চেনা যায়। কিছু-কিছু কোকেন চামচের আবার দুটি মুণ্ডি থাকে যাতে নাকের দুটি ছিদ্র দিয়েই কোকেনে টান মারা যায়।

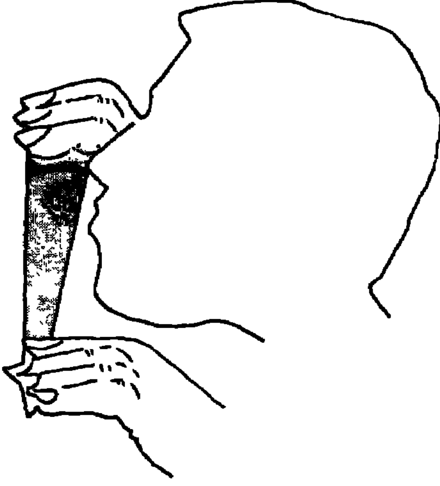
আরেকদল নেশাড়ু স্ট্র বা কাগজের নলের সাহায্যে কোকেনে টান মারে। এরা একটি শক্ত জায়গা, যেমন ধরুন আয়নার উপর, লাইন করে কোকেন ফেলে স্ট্র দিয়ে, লাইন বরাবর খানিকটা উপর থেকে টান মেরে চলে। লাইনের দৈর্ঘ্য 5 সেমি বা তার বেশি হয় (পছন্দ অনুযায়ী)। বেশ্যাপাড়ার দালাল আর ফাঁটুশরা টাকার নোটকে পাকিয়ে কায়দার স্ট্র তৈরী করে। যত বেশি টাকার নোট হয় 'কদর' তত বেশি হয়। যে একশো বা পাঁচশো টাকার নোটের স্ট্র ব্যবহার করে তার খাতির অনেক বেশি। এক গ্রাম কোকেন দিয়ে খান তিরিশ-চল্লিশ লাইন বানানো যায়। একেকটা লাইনে 25 থেকে 30 মিলিগ্রাম কোকেন থাকে। কেউ কেউ আবার টাকার ভিতরে পাকিয়ে কোকেন ভরে রাখে আর দুদিকে মুখগুলো মুড়ে দেয়। পাকানো নোটে কোকেন তার পকেটে গোঁজা থাকে। 'কোকেন-তৃষ্ণা' পেলে সে পাক দেওয়া নোটের একমুখ খুলে টান মারে।

আরেকটি উদ্ভট প্রক্রিয়ায় একটি ছোট্ট বোতলে কোকেন পুরে দেওয়া হয়। এই চ্যাপ্টা ছোট বোতলটির একপাশে লম্বা সুঁচালো নল থাকে (অনেকটা সাধুদের কমণ্ডলুর মত)। নেশাখোর কমণ্ডলুতে মাদক দ্রব্যটি রেখে লম্বা মুখ দিয়ে টান মারে। এই ছোট্ট বোতলগুলিকেও গলার চেনে আটকে রাখার রেওয়াজ আছে।

কোন কোন কোকেনখোর আঙুলে লম্বা নখ রাখে যা কোকচামচ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। হাঁপানি রুগীদের 'ইনহেলারের' মতও কোকেনটানার যন্ত্র বেরিয়েছে।

মুক্ত-ক্ষারীকরণ বা ফ্রি বেস

সম্প্রতি মুক্ত-ক্ষারীকরণ বা ফ্রি-বেসিং নামের একটি মারাত্মক প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এই প্রক্রিয়াতে কোকেনের হাইড্রোক্লোরাইড যৌগটি (যা যেখানে সেখানে পাওয়া যায়) বিশুদ্ধ ক্ষারকীয় কোকেন বা 'মুক্ত-ক্ষারে' পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে



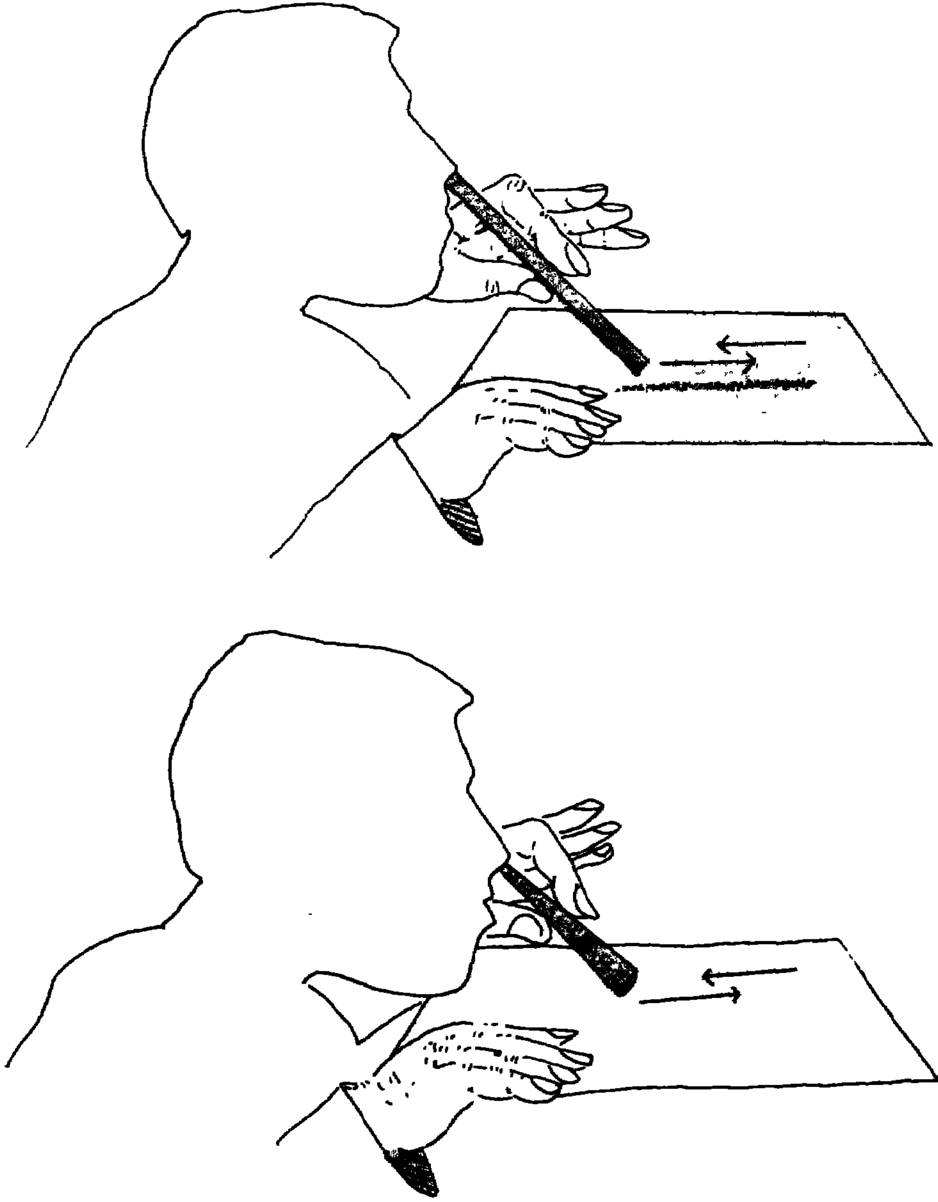
চিত্র 39 নাক দিয়ে টান মারা।



চিত্র 40: গলায় বাহারি ছোট্ট চামচ দেখে কোকেনাসক্তকে সহজেই সনাক্ত করা যায়।

নিম্নমানের কোকেন ক্ষারীয় দ্রবণে মেশানো হয়। তারপর এটিতে ইথারের মত কোন দ্রাবক দেওয়া হয়। মিশ্রণটিতে স্পষ্ট দুটি স্তর তৈরী হয়। উপরের স্তরটিতে দ্রবীভূত কোকেন থাকে। এই স্তরটিকে পৃথক করে বাষ্পে পরিণত করা হয়। বাষ্পীভূত কোকেনকে শীতল করলে বিশুদ্ধ কোকেনের কেলাস পড়ে থাকে। মুক্ত-ক্ষারকে পোড়াতে হয় না। এটি সহজেই বাষ্পীভূত হয় বলে 'কোক-পাইপ' বা সিগারেটের তামাকের সাথে মিশিয়ে এটির ধোঁয়া নেওয়া হয়। এটিকে মারিজুয়ানাতে (মারিজুয়ানার বিস্তারিত বর্ণনা আছে পরের অধ্যায়ে) মিশিয়েও টানা হয়। 'ফ্রি-বেস' নেশাড়ু বা একটি সিগারেটে বা জয়েন্টে 300 মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিশুদ্ধ কোকেন্ নিয়ে ধূমপান করে।

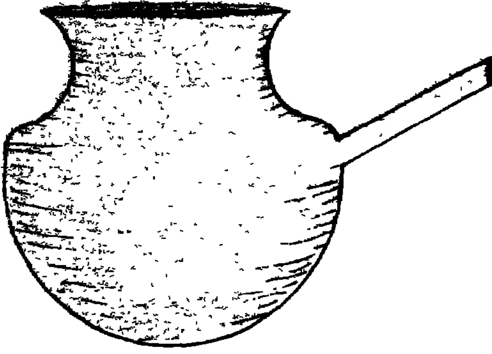
'মুক্ত-ক্ষার' কেন বেশি ক্ষতিকর জানেন? প্রথমত কোকেন নাকের ঝিল্লির রক্তবাহী নালিকাগুলিকে সঙ্কুচিত করে দেয়। এই সঙ্কোচন নালিকাগুলির কোকেন শোষণ করার ক্ষমতার হ্রাস ঘটায় আর এইভাবে নিজের থেকেই দেহে মাদকের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মুক্ত-ক্ষার এই স্বয়ংক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়।



চিত্র 41 · ফাঁপা নল দিয়ে টান মারা।

এই ব্যবস্থা কাজ করে না কারণ মুক্ত-ক্ষারযুক্ত কোকেন সাধারণত ধূমপানে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে ফুসফুসের সাহায্যে সরাসরি শোষণ ঘটে। মুক্ত-ক্ষার মেশানো কোকেন খেয়ে কোকেনাসক্তের তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ঘটনাও শোনা যায়। এই বিপদ সত্ত্বেও 'মুক্ত-ক্ষারীকরণ' দিব্যি চলে। মুক্ত-ক্ষার মেশানোর সব রকম মাল-মশলা বহু জায়গাতেই পাওয়া যায়।

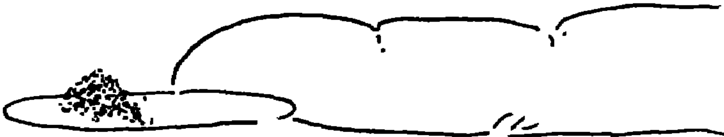
ব্যবসায়ীরা অনেকেই 'কোকেন বেস'কে মুক্ত-ক্ষার হিসাবে চালাতে চায়। এই দুটি বস্তুর কিন্তু আকাশ-পাতাল ফারাক। কোকেন বেস পূর্বোল্লিখিত কোকা পেস্ট ছাড়া অন্য কিছু নয়। এটি সালফিউরিক অ্যাসিডে শুকনো কোকা পাতা ফেলে তৈরী করা হয়। এই পেস্টকে পাস্তা বা বাজুকাও বলা হয়। কোকেন বেসে প্রধানত কোকেন সালফেট থাকে কিন্তু মুক্ত-ক্ষার বা ফ্রি-বেসে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কোকেন থাকে।



চিত্র 42 কোকেন টান মারতে এই ধরনের কমণ্ডলুর মত ছোট্ট ঘটি ব্যবহার করা হয়।

কোকেন ইঞ্জেকশন

বহু নেশাসক্ত, হেরোইনখোরদের মতই সরাসরি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শিরায় কোকেন প্রবেশ করায়। কিন্তু শিরায় কোকেন নেওয়ার সাথে হেরোইন নেওয়ার সামান্য পার্থক্য আছে। শিরায় নেওয়ার আগে কোকেনকে উত্তপ্ত করতে হয় না কারণ রাস্তার কোকেন (কোকেন হাইড্রো-ক্লোরাইড) সহজেই জলে গুলে যায়। আরেকটি তফাত হল যে কোকেন হাতে (যেখানে ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়) নীল দাগ তৈরী করে। তৃতীয়ত বহু কোকেনাসক্তরা স্থিরভাবে বিশ্বাস করে যে কোকেন রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। তাই এই নেশাড়ুরা শিরায় ছিদ্র করার



চিত্র 43: আসক্তের লম্বা নখ চামচের কাজ করে।

সঙ্গে-সঙ্গে কোকেন প্রবেশ করিয়ে ছাড়ে।

অনেকে আবার হেরোইন আর কোকেন মিশিয়ে নেয়। এই মিশ্রণটিকে 'স্পিডবল' বা 'কোকজ্যাব' বলে। এতে দারুণ নেশা হয় আর কোকেনের ক্ষতিকর

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও চাপা পড়ে যায়। কোকেন যেমন মাত্রাছাড়া আনন্দানুভূতি এনে দেয় তা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। উপরন্তু, তীব্র নেশা কেটে যাওয়ায় মনে হতাশা ও ভয় আসে। হেরোইন মিশিয়ে কোকেন নিলে আনন্দের অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয় আর যন্ত্রণাদায়ক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। 'স্পিড-বল' খাওয়া যায় কিন্তু এতে নেশাটা জোরদার হয় না। অনেক নেশাড়ু আবার মদে কোকেন মিশিয়ে পান করে। এই মিশ্রণকে বলে 'তরল দেবী' (এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিচিত্র মিশ্রণ 'মিকি ফিনের' কথা বলা যাক যা হুইস্কির সাথে মারাত্মক ঘুমের ওষুধ ক্লোরাল হাইড্রেট মিশিয়ে তৈরী করা হয়)।

শেষে কিম্ভূত কয়েকটি নেশার পদ্ধতির কথা বলা যাক। সরাসরি কোকেনের নেশায় কোকেনের জলীয় দ্রবণকে দেহের নানা অংশে মাখিয়ে নেওয়া হয়। জিভ, মাড়ি আর চোখের পাতায় কোকেন মাখানোর রেওয়াজ তো আছেই, এমনও শোনা যায় যে পুরুষ নেশাড়ু পুরুষাঙ্গে আর মহিলা নেশাখোর যোনিদেশে কোকেন মাখিয়ে নেয়। এতে নাকি যৌন উত্তেজনা আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

পাঁচ

ক্যানাবিস ঃ গরিবের স্বর্গ

ভাঙ, চরস, হ্যাশিস বা গাঁজার নাম কে শোনে নি? এই সবকটি মাদকের উৎস ইন্ডিয়ান হেম্প বা ভারতীয় শন গাছ। গাছটির বিজ্ঞানভিত্তিক নাম ক্যানাবিস স্যাটিভা। এটির গোত্রের নাম ক্যানাবিন্যাসি। ক্যানাবিন্যাসির আবার দুটি পর্ব আছে: ক্যানাবিস আর হিউমুলাস। হিউমুলাস পর্বের অন্তর্গত দুটি প্রজাতির নাম হিউমুলাস লুপুলাস, হিউমুলাস আমেরিকানাস। এগুলির প্রচলিত নাম 'হপ্‌স' আর মল্ট জাতীয় মদের তিতকুটে সুঘ্রাণ আনতে এটি ব্যবহৃত হয়।

ক্যানাবিস নামটির উৎপত্তিগত ইতিহাসটি বেশ মজার। অ্যাসিরীয় শব্দ কান্নাবু এই নামের উৎস। প্রাচীন জাতির এই মানুষরা নাক দিয়ে হেম্প বীজের বাষ্প টানত আর অদ্ভুত এক আওয়াজ করত। এই আওয়াজটির তারা নাম দিয়েছিল 'কান্নাবু' আর তার থেকেই নাম হয় ক্যানাবিস। 'স্যাটিভা' শব্দটির উৎস ল্যাটিন শব্দ স্যাটিভাস অর্থাৎ যা কিছু পুঁতে দেওয়া হয়।

চাষের অঞ্চল অনুসারে তিনটে প্রজাতির ক্যানাবিস পাওয়া যায়—ইন্ডিকা, আমেরিকানা আর মেক্সিকানা। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা অবশ্য মনে করেন যে ক্যানাবিস স্যাটিভা-ই বিশুদ্ধ প্রজাতি আর উক্ত প্রজাতিগুলি এরই রূপভেদ।

ক্যানাবিস উদ্ভিদ

ক্যানাবিস উদ্ভিদ থেকে 400 টিরও বেশি রাসায়নিক পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। তবে আনন্দদায়ক অনুভূতিদানে সক্ষম রাসায়নিকটির নাম ডেল্টা-9-টেট্রাহাইড্রো-ক্যানাবিনল বা টি এইচ সি। টি এইচ সি পাওয়া যায় গাছের পাতা আর ফুলে।

ক্যানাবিস একটি বর্ষজীবী, লম্বা, কাষ্ঠল ভিন্নবাসী উদ্ভিদ। উদ্ভিদবিদ্যায় 'ভিন্নবাসী উদ্ভিদ'-এর অর্থ স্ত্রী ও পুরুষ ফুল একই উদ্ভিদে জন্মায় না। স্ত্রী ফুল ধারক উদ্ভিদ ও পুরুষফুল ধারক উদ্ভিদ আলাদা হয়। পুরুষ উদ্ভিদকে বলে পুংপুষ্পধারী আর স্ত্রী উদ্ভিদকে বলে স্ত্রী পুষ্পধারী (অ্যাসপারাগাস আর উইলো এই



চিত্র 44 মারিজুয়ানা উদ্ভিদ ও তার ফল।

ধরনের দুটি ভিন্নবাসী উদ্ভিদ)। উদ্ভিদগুলির উচ্চতা 100 থেকে 500 সেমি হয়। স্ত্রী উদ্ভিদ পুরুষের তুলনায় দীর্ঘতর হয়। এর পাতাগুলি যৌগিক হয় আর ক্ষুদ্র-পত্রের সংখ্যা 5 থেকে 11 টি হয় (সাধারণত সাতটি)। প্রতিটি ক্ষুদ্র-পত্রের দুই প্রান্ত সুচালো আর করাতের মত কাটা কাটা হয়। ফুল আর বীজগুলি, উদ্ভিদের ওপরদিকে শাখাগুলির ডগায় লেগে থাকে। উদ্ভিদটির সারা অঙ্গে রোঁয়া থাকে যা স্পর্শ করলে আঠালো বোধ হয়। আঠালো ভাবটা আসে রজন থেকে। এই উদ্ভিদ থেকেই উচ্চ শ্রেণীর রজন পাওয়া যায়। উদ্ভিদগুলির কাণ্ডগুলির গঠন বিচিত্র আর এগুলির প্রস্থচ্ছেদ চৌকো দেখায়।

পুরুষ ফুলগুলি প্রায় 15 সেমি দীর্ঘ সুন্দর পল্লব গঠন করে আর শাখায় দৃষ্টিনন্দনভাবে ঝুলে থাকে। এদের রঙ সবুজাভ হয় আর এরা বায়ুতে প্রচুর রেণু ছাড়ে। দূর থেকে পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের কোন পার্থক্য করা যায় না। কাছ থেকে



চিত্র 45 মারিজুয়ানার পাতা।

দেখলে স্ত্রী জননাঙ্গ আর পুরুষ জননাঙ্গের আকৃতিগত পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়। স্ত্রী ফুলেই বেশি টি এইচ সি থাকে।

স্ত্রী উদ্ভিদে বৃদ্ধির সাথে সাথে ফলেরও উদয় হয়। ফলকে সাধারণত বীজ বলে ডাকা হয়। এটিকে গমের শস্যদানার মত দেখতে হয় আর একটি খোলার মধ্যে এটি আবদ্ধ থাকে। ফলটির রঙ সবুজ হয় আর এটি আঠালো হয়। একেকটি পুষ্ট ফল হালকা সবুজাভ হলুদ কিংবা বাদামী রঙের হয়। ফলগুলি ডিম্বাকৃতির

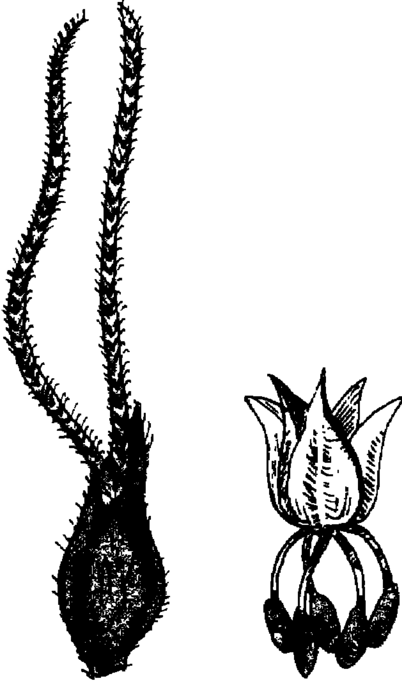


চিত্র 46: মারিজুয়ানা গাছ 5 মিটারেরও বেশি লম্বা হতে পারে।

হয় আর পরিধি বরাবর একটি উঁচু রেখা এগুলিকে দুভাগে বিভক্ত রাখে। ফলের গায়ে ফিতার মত দাগ কাটা থাকে। ফলের ভিতরে সাদা মাংসাল বস্তু থাকে যা অনেকটা নারকেলের শাঁসের মত দেখায়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফল আর তার খোল দেখেই ক্যানাবিসকে চেনা যায়।

বিভিন্ন ব্যবহার

ক্যানাবিসের চাষ করা হয় প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্যে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নেশার কাজে ব্যবহারের কথা। মাদক উৎপাদনকারী উদ্ভিদে খুব বেশি পরিমাণ (প্রায় 6 শতাংশ) টি এইচ সি থাকে। এছাড়া এই উদ্ভিদ থেকে আঁশ (বা তন্তু) পাওয়া যায় যার থেকে দড়ি, সুতলি, টুপি ইত্যাদি তৈরী হয়। ক্যানভাস বা ক্যাম্বিস (তু. ক্যাম্বিসের জুতো) শব্দটি এসেছে এই ক্যানাবিস থেকে। যে ক্যানাবিস থেকে দড়ি বা কাপড় প্রস্তুত করা হয়, তার থেকে কিন্তু মাত্র 0·4 শতাংশ বা তারও কম টি এইচ সি পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে ক্যানাবিস উদ্ভিদ থেকে আঁশ পাওয়া যাবে, তার থেকে মাদক পাওয়া যাবে না। তবে সব সময় ভাল আঁশ উৎপন্নকারী উদ্ভিদ থেকে ভাল কাপড় বা দড়ি তৈরী করা যায় না। ক্যানাবিসের বীজ থেকে এক ধরনের তেল পাওয়া যায় যা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এই তেল তৈলচিত্র আঁকতে কাজে লাগে। এই তেল লিনসিড বা তিসির তেলের পরিবর্তেও ব্যবহার করা যায়।



চিত্র 47 মারিজুয়ানা পুরুষ ও স্ত্রী ফুল।

যে রজন থেকে টি এইচ সি পাওয়া যায়, তা উদ্ভিদের বহুকোষী গ্রন্থিযুক্ত লোম থেকে উৎপন্ন হয়। এই রজন খুবই আঠালো আর চটচটে হয়। উদ্ভিদটির বিভিন্ন অংশ থেকে এই রজন পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় জননাঙ্গগুলি থেকে। কয়েকটি উদ্ভিদ আবার খুব বেশি পরিমাণ রজন উৎপাদন করতে পারে।

এর সঠিক কারণ ঠিক বোঝা যায় নি কিন্তু উচ্চতা, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ইত্যাদির সাথে উৎপন্ন রজনের পরিমাণের একটা নিশ্চিত সম্পর্ক আছে। উষ্ণ আর শুষ্ক আবহাওয়ায় বেশি পরিমাণ রজন উৎপন্ন হয় কারণ এইভাবে জলীয় বাষ্পের হ্রাস রোধ করা হয়। এই কারণেই ভারত, আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার উদ্ভিদগুলি মাদক হিসাবে বেশি কাজে লাগে।

ক্যানাবিস থেকে আরো অনেকগুলি সমধর্মী বস্তু পাওয়া যায় যার কথা আমরা সবাই জানি। পাতা আর মূলগুলি শুকিয়ে তৈরী করা হয় ভাঙ বা সিদ্ধি। একে পট্টি বা সব্জিও বলে অনেকে। ভাঙ এমনি খাওয়া যায় আবার নানা পানীয় বস্তুতে মিশিয়ে অনেক রকমের নেশার বস্তু তৈরী করা যায়। একটি মিশ্রণ তৈরী করা হয় শুকনো পাথরে চিনি আর গোলমরিচের সাথে ক্যানাবিস পাতা ঘষে। তারপর মিশ্রণটিকে জলে মিশিয়ে সেই জলকে মসলিন কাপড়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। এই পানীয়টিকেই বলে 'ঠাণ্ডাই' যা হোলিতে সারা ভারতে পান করা হয়।

চিনি, ময়দা, দুধ আর মাখনে ভাঙ মিশিয়ে মাজুন নামের একটি মিষ্টান্ন তৈরী করা হয়। বহু প্রদেশে ভাঙ দেওয়া মিষ্টি কিনতে পাওয়া যায় যা বরফির আকৃতির আর সবুজ রঙের হয়।

জংলা সবুজ রঙের বিশেষ গন্ধবিশিষ্ট ক্যানাবিসের উৎপাদনের নাম গাঁজা। স্ত্রী ক্যানাবিস ফুলের নির্যাস থেকে গাঁজা তৈরী করা হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে টি এইচ সি থাকে। ভাঙে 1 থেকে 2 শতাংশ টি এইচ সি থাকে কিন্তু গাঁজায় এর পরিমাণ প্রায় 5 শতাংশ। এই গাঁজাকেই পশ্চিম দেশে মারিজুয়ানা বা বারিহুয়ানা বলে (দুটি উচ্চারণ ঠিক)। এই নামটির সম্ভাব্য উৎস অ্যাজটেক শব্দ মিলান-আ-হুয়ান যা স্প্যানিশ আক্রমণকারীদের উচ্চারণে বারিজুয়ানা হয়ে যায়।

ভাঙ খাওয়া হয় বা পানীয়ে মিশিয়ে খাওয়া হয় কিন্তু গাঁজা ধূমপানের মাধ্যমে সেবন করা হয়। 1 থেকে 2 গ্রাম পরিমাণ গাঁজার জল মিশিয়ে পাকিয়ে একটা আঠালো গোল্লা পাকানো হয়। এরপর সামান্য তামাকে মিশিয়ে কলকে বা ছিলমে পুরে নেওয়া হয়। সাধু, ফকির আর মজুরেরা যুগ যুগ ধরে গাঁজা সেবন করে আসছে। গাঁজার দম দিয়ে গরিব-গুর্বোরা 'স্বর্গদর্শন' সারতে যায় কিন্তু শেষকালে যমের দুয়ারে গিয়ে হাজির হয়।

পশ্চিম দেশে সিগারেটের তামাকে গাঁজা (এরা মারিজুয়ানা বলে) মিশিয়ে খাওয়ার চল আছে। এই গাঁজা মেশানো সিগারেটকে 'রিফার' বা 'জয়েন্ট' বলা হয়। নেশাড়ুরা বিশেষ ধরনের পাতলা কাগজে 500 মিলিগ্রাম ওজনের মারিজুয়ানা রেখে দেয়। এগুলিকে কাগজে মুড়ে সযত্নে রাখা হয়। কখনো কখনো দুটি কাগজ দিয়ে 'রিফার' তৈরী করা হয়। ভাঙ-এর মতো মারিজুয়ানাও খাওয়া যায় বা ভিজিয়ে চা তৈরী করা যায় কিন্তু মাদকটি খেলে ভালো নেশা হয় না। খেলে নেশা

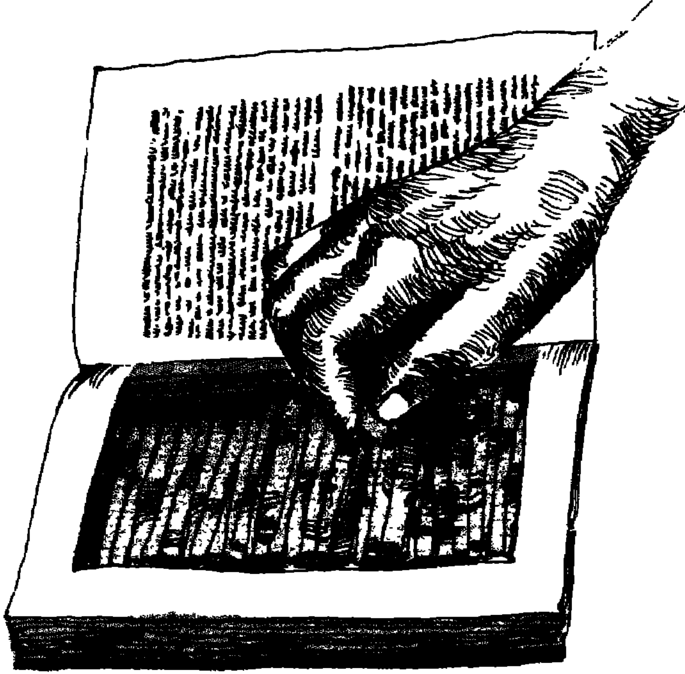


চিত্র 48 - মারিজুয়ানা উদ্ভিদ থেকেই ভাঙ, গাঁজা আর মাজুন পাওয়া যায়।

হতে ঘণ্টাখানেক লাগে কিন্তু ধূমপান করলে চট্‌পট্‌ নেশা লেগে যায়। মারিজুয়ানা মিশিয়ে বিস্কুটও বানানো যায়। এই উপাদেয় বিস্কুটকে কুকিবা ব্রাউনি বলে।

মারিজুয়ানার ধূমপানকে অনেক সময় 'ধুমকি দেওয়া' বলে। রিফারগুলিকে অনেক সময় জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া হয় যাতে এগুলি ধীরে ধীরে পুড়তে পারে। তাই রিফারের নেশা একটু অপরিছন্ন মনে হয় কিন্তু নেশার আমেজটা ঠিক এনে দেয়। রিফার দেখলেই ঘেন্না করবে। এটি ধূসর, কাদা কাদা আর ভীষণ নোংরা দেখায়। কেউ কেউ চোঙা বা 'বঙ' সহযোগে গাঁজা টানে। সেরা চোঙগুলিতে ছোট্ট বাটির মত অংশ লাগানো থাকে। এই চোঙগুলিকে হুঁকোও বলা হয়। এই হুঁকোগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে বসে দল বেঁধে টানা হয়। অন্ধকার ঘরে মোমবাতি বা ধূপ জ্বালিয়ে বসে একে অপরের দিকে হুঁকোগুলো বাড়িয়ে দেয় আর লম্বা-লম্বা টান মারে। এই দলগুলি 'বদ্ধ' বা 'মুক্ত' হতে পারে। বদ্ধ আড্ডায় মারিজুয়ানার উৎস কিংবা মাদক দ্রব্যটির সম্বন্ধে অন্য কোন আলোচনা করা হয় না। মুক্ত আড্ডায় উৎস, পরিমাণ এবং ড্রাগটির সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা খোলাখুলিভাবে হতে থাকে। এই আড্ডাগুলি খুব আন্তরিক আর খোলামেলা হয়।

রিফারের এক টানকে টোক বলে আর নেশাড়ু চেষ্টা করে একটানে অনেকটা ধোঁয়া টেনে ফুসফুসে অনেকক্ষণ ধরে রাখতে। সিগারেটের মত করে টান দিলে কোন নেশাই হয় না। কিন্তু কলকে বা রিফারে জোরালো টান মেরে কম সে কম 20 থেকে 30 সেকেন্ড ধোঁয়াটাকে ধরে ফুসফুস হয়ে রক্তে প্রবেশ করতে দিতে হয়। এক কলকে মারিজুয়ানার ওজন প্রায় 500 মিলিগ্রাম হয়। টি এইচ সির



চিত্র 49: রিফারগুলিকে সিগারের মত দেখায়। এখানে চোরাচালানকারী বইয়ের পাতায় সেগুলিকে প্যাক করতে দেখা যাচ্ছে।

পরিমাণ 1 শতাংশ ধরলে গড়ে প্রায় 5 মিলিগ্রাম টি এইচ সি থাকে এক কলকে গাঁজায়। গাঁজা খাঁটি হলে টি এইচ সির শতকরা হার 10-15% হতে পারে (প্রায় 1 গ্রাম)। খাঁটি রিফারে (অন্তত 100-150 গ্রাম টি এইচ সি) হ্যাশ তেল মিশিয়ে মাদকশক্তি দ্বিগুণ করে তোলা যায়। ধূমপানে 50 শতাংশ টি এইচ সি দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাই খুব নিম্নমানের রিফারও দেহে 2·5 মিলিগ্রাম টি এইচ সি শোষণ করায়। এর কার্যকারিতা খাওয়া রিফারের প্রায় তিন গুণ হয়। পাক্কা নেশাড়ুরা প্রতিদিন প্রচুর রিফার ধূমপান করে আর এদের দেহে 150 থেকে 200 মিলিগ্রাম টি এইচ সি শোষিত হয়। দু তিন সপ্তাহ এভাবে গাঁজা খেয়ে তারপর ছেড়ে দিলে প্রত্যাহরণ উপসর্গ বা উইথড্রয়াল সিম্পটম দেখা যায়।

সিগারেট খাওয়া হয়ে গেলে অবশিষ্ট টুকরোটি ফেলে দেওয়া হয় কিন্তু রিফারের শেষ অংশটুকু বা রোচটিকে (ককরোচ বা আরশোলার মত দেখতে হয়) নেশাড়ুরা সযত্নে জমিয়ে রাখে। এর কারণ এই অংশটিতেই ধূমপানের পর সর্বোচ্চ পরিমাণ টি এইচ সি জমে থাকে। পুরো মারিজুয়ানা মিশ্রিত জয়েন্টের অর্ধেক বা অন্তত এক তৃতীয়াংশ মাদক এতে জমে যায়। এই রোচ খাওয়ার নানা পদ্ধতি চালু

আছে। কেউ এটিকে স্রেফ চিবিয়ে খেয়ে ফেলে আবার কেউ-কেউ চুলের কাঁটায় বিঁধিয়ে আগুন লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে (মুখ বা আঙুল না পুড়িয়ে) টান মারে।

প্রায় কখনোই শিরায় ইঞ্জেকশন দিয়ে মারিজুয়ানার নেশা করা হয় না (হেরোইনের ঠিক বিপরীত)। অবশ্য তবুও কাঁচা মারিজুয়ানা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে শিরায় প্রবেশ করানোর প্রচেষ্টার কথা শোনা গেছে। যারা এইভাবে নেশা করার চেষ্টা করেছে তাদের দেহে বহু চিকিৎসাগত জটিলতা দেখা গেছে।

বাজার চলতি ভাষায় মারিজুয়ানাকে প্রায়শই 'পট' বলা হয়। ইংরাজিতে একটি প্রবচনই আছে "তাকে তার কলকে আর পট তুলে নিতে দাও" (অর্থাৎ তাকে যা ইচ্ছা করতে দাও)। এই পট নামটির সম্ভাব্য উৎস মারিজুয়ানা শব্দের মেক্সিকান প্রতিশব্দ—পটাগুয়া। অনেকের মতে হার্লেম অঞ্চলে ফুলের টব বা পটে ক্যানাবিস উৎপন্ন হয় বলে একে 'পট' বলা হয়।

ক্যানাবিসের আরেকটি উৎপাদন 'চরস' যার পশ্চিমী নাম হ্যাশিস। হাসান-ইবন-সাবাহর (1100 খ্রীস্টাব্দ) নামানুসারে এর নামকরণ। এই ব্যক্তির চেলা-চামুণ্ডারা এই নেশা করত বলেই এহেন নাম। হ্যাশিসে টি এইচ সির পরিমাণ 10 থেকে 15 শতাংশ। এটি মারিজুয়ানার চেয়ে বহুগুণ বেশি জোরালো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভাঙ, গাঁজা আর চরস একই মাদক দ্রব্যের উৎপাদন কিন্তু এগুলিতে ড্রাগের মাত্রার তারতম্য থাকে। এই গোত্রের আরেকটি ড্রাগ হল অ্যালকোহল বা মদ যার বিভিন্ন ঘনত্ব থাকে। কিন্তু মদ খাওয়া বহু সমাজে কোন অপরাধ বলে গণ্য হয় না। লঘু মাত্রার মদ হল বিয়ার (এটির তুলনা করা চলে লঘুমাত্রার ক্যানাবিস ধারণকারী মাদক ভাঙের সাথে) আর চড়া অ্যালকোহল পাবেন ওয়াইনে (তুলনীয় ঃ মারিজুয়ানা)। এর চেয়েও জোরালো মদ হল হুইস্কি (তুলনীয় ঃ চরস)।

চরস বা হ্যাশিসের রঙ হয় গাঢ় সবুজ বা বাদামী। এটি ক্যানাবিস গাছের পাতা আর কাণ্ডে নিঃসৃত ঘন রজন। হ্যাশিস তৈরী করার নানা পদ্ধতি আছে। একেকটি দেশে এই মাদকটি প্রস্তুত করার একেকটি নিজস্ব কায়দা আছে। মিশরীয়দের চিরাচরিত পদ্ধতিতে 60 সে.মি ব্যবধান রেখে শণের চার রোপণ করা হত। চারাগুলি লম্বা-লম্বা গাছে পরিণত হয়ে শাখায় শাখায় রজন উৎপন্ন হত। এই রজন উলঙ্গ হয়ে অথবা চামড়ায় বিশেষ পোশাক সংগ্রহ করা হত। এই সংগ্রহকারীরা গাছগুলির সারির মাঝ দিয়ে উদ্বাহু হয়ে হেঁটে চলে যেত। একটি ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে চামড়ার পোশাকের হাতায় বা হাতে চাবুকের মত কিছু কাঁটা-কাঁটা বস্তু লাগানো থাকত। এই সংগ্রাহকরা যখন ক্যানাবিসের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসত, এদের হাতে বা চাবুকে আঠালো রজন লেগে থাকত। ভোঁতা ছুরি দিয়ে চেঁছেপুছে এই রজন সংগ্রহ করা হত। এই বিচিত্র প্রক্রিয়ার প্রামাণিকতা



চিত্র 50 কখনো কখনো 'পট' বা টবে ক্যানাবিস লাগানো হয়। সম্ভবত তাই চলতি ভাষায় এই মাদককে পট বলে।

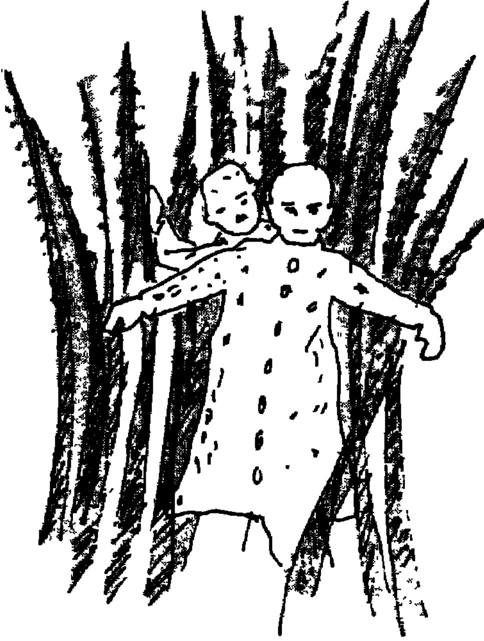
সম্বন্ধে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

রজন নিঃসৃত করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে হাতের তালুতে ক্যানাবিসের পাতালতাগুলিকে অনবরত পাকানো। এছাড়া এই উদ্ভিদগুলিকে কাপড়ের উপরে আছড়ে রজনটি পৃথক করার পদ্ধতি ও প্রচলিত আছে।

হ্যাশিস, ক্রুসেডের (মুসলমান ও পশ্চিমের খ্রীস্টানদের ধর্মযুদ্ধ যা 1094-1444 খ্রীস্টাব্দ অব্দি চলেছিল) সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধুনা ইজরায়েলের রাজধানী জেরুজালেম তখন তুর্কীর মুসলমানদের দখলে ছিল। খ্রীস্টানরা এই পবিত্র নগরী দখল করে খ্রীস্টধর্মের পুণ্য রাজদণ্ড পুনরুদ্ধার করতে যুদ্ধে নেমেছিল। খ্রীস্টানরা (এদের ক্রুসেডার বলা হত) মুহুর্মুহু জেরুজালেমের মুসলমানদের আক্রমণ করত। ওদিকে মুসলমানেরা খ্রীস্টান যুদ্ধবাজদের ঠেকাতে ভাড়াটে খুনিদের কাজে লাগাত। এই খুনিরা হ্যাশিস চড়িয়ে নিজেদের উত্তেজিত রাখত আর ঠাণ্ডা মাথায় খ্রীস্টান হামলাবাজদের কোতল করত। এই মাদক এদের মধ্যে মারাত্মক উন্মাদনা এনে দিত আর এদের হ্যাশিচিন নামে ডাকা হত। এই হ্যাশিচিন শব্দটি ইংরাজি শব্দ 'অ্যাসাসিনের' (অর্থে ঘাতক) উৎস।

শ্রেণী অনুসারে হ্যাশিসের দোষগুণ বিচার করা হয়। এই বিভাজনে সহায়ক হয় মাদকটির রঙ। রঙ যত ফিকে হবে, তার কার্যক্ষমতা তত কম হবে। বলা হয় গাঢ় বাদামী রঙের হ্যাশিসে সর্বোচ্চ পরিমাণ টি এইচ সি থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হ্যাশিস চেখে তার দোষগুণ বিচার করার পেশাদার বিশেষজ্ঞ (যেমন 'টি-টেস্টার' চা চেখে তার দাম ঠিক করে দেয়) বিরল নয়।

মারিজুয়ানার মত হ্যাশিসও ধূমপান করা হয় (অবশ্য দুটিই ভক্ষণযোগ্য মাদক)। ধূমপানের সময় তামাক খাওয়ার পাইপ বা বিশেষ ধরনের হ্যাশ পাইপ ব্যবহার করা হয়। হ্যাশ পাইপে একটি ক্ষুদ্র বাটি লাগানো থাকে। কখনো কখনো বাটির তলায়



চিত্র 51: ক্যানাবিস উদ্ভিদ থেকে চরস সংগ্রাহকদের চামড়ার পোশাক।

একটি ছাঁকনি থাকে যা মাদক বস্তুটির বড় দানা ছেঁকে আলাদা করে দেয়। নাহলে বড় দানা মুখে আটকে এক বিভ্রাট হয়। যারা ছাঁকনি-বিহীন পাইপ ব্যবহার করে, তারা অ্যালুমিনিয়ামের ফিন্‌ফিনে পাতে ছিদ্র করে (পিন বা সুচ দিয়ে) পাইপটির মুখে সাঁটিয়ে নেয়। কাজ হয়ে গেলে পাতটি ফেলে দেওয়া হয়। পাইপ পাওয়া না গেলে জ্বলন্ত সিগারেটের ডগায় আঠালো হ্যাশিস লাগিয়ে তার ধোঁয়া সোজা ফুসফুসে চালান করে দেওয়া হয়। হ্যাশিসের জনপ্রিয়তার কারণ এটি খুব দ্রুত কাজ করে আর চট্‌ করে নেশাকে তুঙ্গে তুলে দেয়। এটি এল এস ডির মত মানুষকে অলীক জগতে প্রমোদ ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের কৃত্রিম ভ্রম বা হ্যালুসিনেশন কখনো কখনো অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় আর মানসিক পীড়া উৎপন্ন করে।

হ্যাশিস তেলে টি এইচ সির পরিমাণ প্রচুর। এতে চরসের চেয়েও বেশি টি এইচ সি থাকে। এই তেলের অন্যান্য কয়েকটির নাম হল মারিজুয়ানার তেল, মধুর তেল অথবা স্রেফ হ্যাশ তেল। এতে টি এইচ সির পরিমাণ 20 শতাংশ থেকে 60 শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। দেখা যাচ্ছে হ্যাশিস তেলে সাধারণ হ্যাশিসের তুলনায় প্রায় তিন চারগুণ বেশি টি এইচ সি থাকে। এই তেলটি আগেকার দিনে ওষুধের দোকানে আর চিকিৎসাক্ষেত্রে 'ক্যানাবিসের আরক' হিসাবে ব্যবহৃত হত। এর প্রয়োগ রীতিমত আইনসঙ্গত ছিল। আজকাল অবশ্য এই তেল বেআইনিভাবে তৈরী হয়। মদের উপমা টেনে হ্যাশিস তেলের ব্যাপারটা বোঝানো যাবে না কারণ অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে এই তেলের সদৃশ কোন মদ নেই। তবে যদি চোলাই করে অত্যন্ত উচ্চ ঘনত্বের কোন মদ তৈরী করা সম্ভব হয় তা হ্যাশিস তেলের অনুরূপ বলা যাবে।

সস্তার হ্যাশিস তেল খুব গাঢ় হয়। এই ঘনত্ব কখনও কখনও এত বেশি হয় যে গরম না করলে এটি স্থির হয়ে পাত্রে পড়ে থাকে। তরলটি নানা রঙের হতে পারে। কিন্তু হলুদ, গাঢ় সবুজ, বাদামী আর কালো রঙের হ্যাশিস তেলই বাজারে পাওয়া যায়। এতে টি এইচ সির পরিমাণ প্রায় 100 শতাংশ খাঁটি টি এইচ সির কাছাকাছি হয়। খাঁটি টি এইচ সি গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরী করা যায় কিন্তু তা খুবই খরচসাপেক্ষ। তাছাড়া খাঁটি টি এইচ সি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

নেশাখোরেরা সাধারণত মারিজুয়ানা কিংবা সাধারণ তামাকযুক্ত সিগারেটে হ্যাশিস তেল মিশিয়ে ধূমপান করে থাকে। কেউ কেউ খাবারে বা চা-কফির মত পানীয়ে মিশিয়ে খায়। এর ঘনত্ব এবং নিষ্কাশনের সময় এতে অন্যান্য রাসায়নিক মেশানো হয় বলে এটিকে বায়ুনিরোধক পাত্রে, আলো আর তাপের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। বায়ু, তাপ ও আলো এই তেলকে কঠিন করে দেয় এর কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।

হ্যাশ তেল তৈরী করার নানা পদ্ধতি আছে কিন্তু এটি গবেষণাগারে প্রস্তুত করার মূল পদ্ধতিটি কতকটা অনুস্রাবণ পদ্ধতিতে কফি প্রস্তুত করার মত। এই পদ্ধতিতে মারিজুয়ানা বা হ্যাশিসকে কুচি-কুচি করে কেটে বা গুঁড়ো করে একটি ঝুড়িতে রাখা হয়। এই ঝুড়িটিকে একটি দ্রাবক তরলে পরিপূর্ণ পাত্রে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দ্রাবক তরল হিসেবে সাধারণত ইথানল, ডিনেচারড অ্যালকোহল (এটি আসলে মিথানল মিশ্রিত ইথানল। ইথানলে মিথানল মিশিয়ে এটিকে পানের অযোগ্য করে তোলা হয়। এটি শুধুমাত্র জ্বালানি ও অন্যান্য কয়েকটি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হয়)। হেক্সেন আর পেট্রোলিয়াম ইথার ব্যবহৃত হয়।

ঝুড়ির উপর পাত্রের মধ্যে একটা তামার নল ফিট করে দেওয়া হয়। এই নলের ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা জল চালনা করা হয়। দ্রাবক তরলটিকে উত্তপ্ত করা হলে তা বাষ্পীভূত হয়ে পাত্রের উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই বাষ্প ঝুড়িতে ঝোলান মারিজুয়ানার মধ্যে দিয়ে তামার নলের দিকে যায়। এই নলের সংস্পর্শে এসে মারিজুয়ানা মিশ্রিত এই বাষ্প শীতল হয় আর ফোঁটা ফোঁটা হয়ে তলার তরলে পড়তে থাকে। এই ফোঁটাগুলি মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়, রজন (এটি দ্রাবকে গুলে যায়) চুঁয়ে চুঁয়ে দ্রাবকে পৃথক হয়ে জমতে থাকে। এইভাবে বার বার উত্তপ্ত ও শীতল করার পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া হয় যতক্ষণ না মিশ্রণটি টি এইচ সি সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়। বেশি দ্রাবক ও মারিজুয়ানা মিশিয়ে আরো শক্তিশালী দ্রবণ তৈরী করা হয়। শেষ পর্যন্ত টি এইচ সি পরিপূর্ণ একটি ঘন দ্রবণ পাওয়া যায়।

এখন হ্যাশ তেল তৈরীর বিদ্যুৎচালিত একটা মেশিন কিনতে পাওয়া যায়। বহু চোরাকারবারী রান্নাঘর অথবা বাথরুমের কোণে এই ধরনের মেশিন বসিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে হ্যাশ তেল তৈরী করে। আইসোমেরাইজার এই কাজে ব্যবহার করার

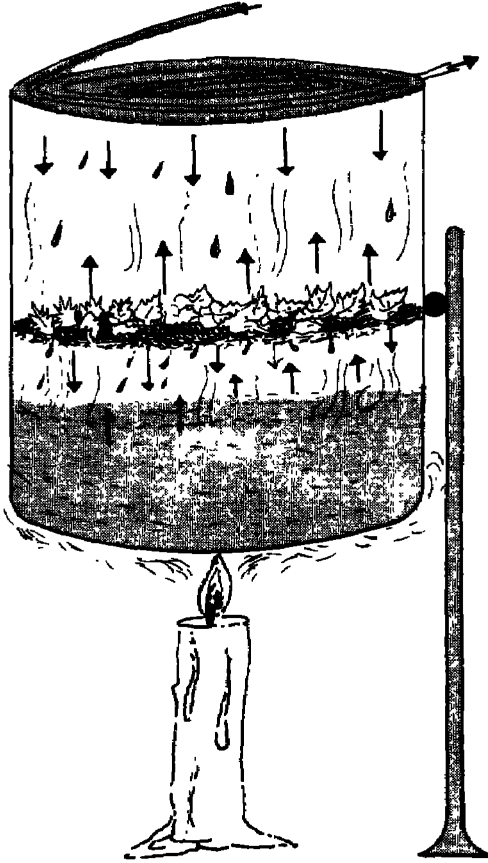
একটি মেশিন। এটি বিভিন্ন সাইজের হয় আর দামও সেই অনুযায়ী হয়। ISO-2 এমনই একটি মেশিন যার বিজ্ঞাপন একটি পশ্চিমী মাদক-দ্রব্য বিষয়ক পত্রিকায় প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমের দেশগুলিতে আইনসঙ্গত ভাবে এই ধরনের মেশিন কিনতে পাওয়া যায়। এই মেশিনগুলিতে সহজেই আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে আর প্রায়শই এগুলির বিস্ফোরণ ঘটে। মাদক-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নকারী অফিসারেরা এই ধরনের যন্ত্রের খবর পেলে অত্যন্ত সন্তর্পণে এগুলিকে নাড়াচড়া করে যাতে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ না ঘটে।

ক্যানাবিসের প্রাচীনতা

ক্যানাবিস প্রস্তুতির পদ্ধতিগুলিতে আজ উন্নত ছোঁয়া লেগেছে কিন্তু প্রাচীন কাল থেকেই এর প্রচলন আছে। আমাদের পুরাণেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি পৌরাণিক গাথাতে দেবাদিদেব শিবকে কোন সাংসারিক কলহের পর ক্রুদ্ধ হয়ে কোন নির্জন মাঠে প্রস্থান করতে দেখা গেছে। সেই তেপান্তরের মাঠে একটি মাত্র সুউচ্চ ক্যানাবিস বা শনের গাছ, তাকে প্রচণ্ড তাপের হাত থেকে রক্ষা করে। এই গাছটির ঠাণ্ডা ছায়ায় সারাদিন বসে থাকতে থাকতে তিনি কখন অন্যমনস্কভাবে দুটি পাতা ছিঁড়ে খেয়েছিলেন। এই পাতা তার মন প্রাণকে সতেজ করেছিল আর তিনি এটিকে তার প্রিয় খাদ্যের তালিকায় স্থান দিয়েছিলেন। এই জন্যেই শিবকে 'ভাঙের দেবতা'ও বলা হয়।

এই মাদকের প্রথম প্রামাণিক তথ্যটি 2737 খ্রীস্টপূর্বাব্দে জানা যায়। চীনা সম্রাট শেন নাঙের 'ভেষজ' নামের আকর গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই মাদকটির উল্লেখ পাই। ওল্ড টেস্টামেন্টের স্যামুয়েল পুরাণে (কাষ্ঠমধু নামে) আর সলোমন গীতিকায় (ক্যালামাস নামে) এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের অথর্ববেদেও "ভেষজের পঞ্চজগৎ যা আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করে" এই পংক্তিটি পাই। পঞ্চজগতের মধ্যে একটি 'ভাঙ'। প্রাচীন রোমান আর গ্রীকরাও ক্যানাবিসের ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। গ্রীক চিকিৎসক ডায়োসকোরাইড্‌স (50-70 খ্রীস্টাব্দ) আর গ্যালেন (131-201 খ্রীস্টাব্দ) কানের রোগ ভোগের ওষুধ হিসাবে ক্যানাবিস প্রয়োগ করার পরামর্শ দিতেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায় যে সিথিয়ার অধিবাসী উত্তপ্ত লাল প্রস্তরে ক্যানাবিস ফেলে এর বাষ্প নিঃসৃত করত।

নবম এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আরব আক্রমণকারীরা উত্তর আফ্রিকা, মিশর, আলজিরিয়া আর মরক্কোতে ক্যানাবিসের নেশার প্রবর্তন করে। আরব্য রজনীর উপাখ্যান এবং অন্যান্য সাহিত্যিক রচনাতে ক্যানাবিসের স্তুতি গাওয়া হয়েছে। দশম শতাব্দী নাগাদ ভারতবর্ষে ইন্দ্রকান্না বা 'ঈশ্বরের খাদ্য' নামে ক্যানাবিসের উচ্চ প্রশংসার কথা জানা যায়। কিন্তু শীঘ্রই ক্যানাবিসের স্বরূপ



চিত্র 52: হ্যাশ তেল বের করার পদ্ধতি।

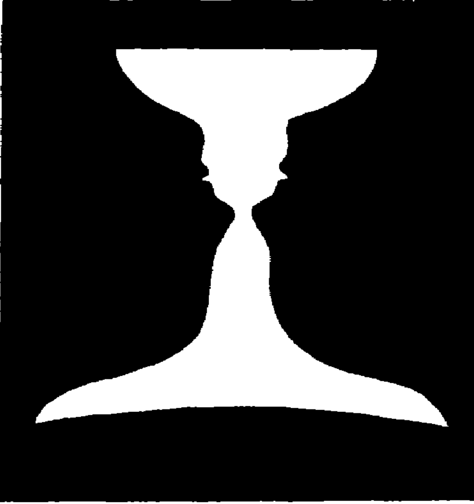
উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। শোনা যায় 1374 খ্রীস্টাব্দে আরব দেশের আমির সুনদুনি শিকুনি এই মাদকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন। যারা এই মাদক দ্রব্যের চাষ করত বা ব্যবহার করত, তাদের দাঁতগুলো উপড়ে ফেলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। ভারতবর্ষে যারা গাঁজা ও ভাঙ খেত তাদের ভাঙি বা গাঁজেরি নামে অপমানজনক ভাবে সম্বোধিত করা হত। বর্তমানে 1985 সালের 'নারকোটিকস এন্ড সাইকোট্রপিক অ্যাক্ট' নামক একটি আইন বলে ক্যানাবিসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

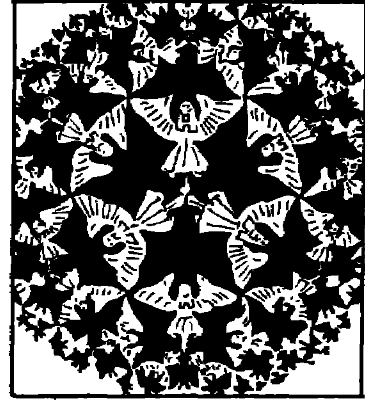
দেহে ক্যানাবিসের প্রভাব

দেহে ক্যানাবিসের প্রভাব ফেলে রাসায়নিক টি এইচ সি। দেহে ক্যানাবিসের অর্ধজীবন বা হাফ লাইফ পিরিয়ড কুড়ি ঘণ্টা। এর অর্থ হল যে, কোন ব্যক্তির দেহে একটি নির্দিষ্ট সময়ে 10 মিলিগ্রাম টি এইচ সি থাকলে কুড়ি ঘন্টা পরে এই রাসায়নিকের পরিমাণ 5 মিলিগ্রামে দাঁড়াবে। আরো কুড়ি ঘণ্টা পরে টি এইচ সি'র পরিমাণ হবে 2·5 মিলিগ্রাম। এইভাবে টি এইচ সি'র পরিমাণ ক্রমাগত কমতে থাকে। এখন প্রশ্ন হল কোথায় উধাও হয় এই রাসায়নিক? আসলে এই রাসায়নিক ক্রমাগতভাবে নির্বিষ পদার্থে পরিণত হতে থাকে। এই নির্বিষ পদার্থগুলি টি এইচ সি'র বিপাকলব্ধ কিছু পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। সম্পূর্ণভাবে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ক্যানাবিসের অদৃশ্য হতে প্রায় তিরিশ দিন বা তার কিছু বেশি সময় লাগে। এই কারণেই প্রতি সপ্তাহে একবার নেশা করলে অনেকদিন চলে যায়। একেকটা সময় আসে যখন

নেশাড়ুর দেহে টি এইচ সি'র মাত্রা বিপদ সীমা অতিক্রম করে যায়।

ক্যানাবিস সর্বাধিক প্রভাব ফেলে মস্তিষ্কে। এটি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেশাড়ুর মনটা আনন্দে ভরে যায় (এই মাত্রাহীন আনন্দানুভূতিকে মেঘের দেশে বিচরণ করার সাথে তুলনা করা হয়)। নেশাখোর অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রগল্ভ হয়ে ওঠে। তাই দল বেঁধে আড্ডা মারতে মারতে ক্যানাবিসের নেশা করা হয়। নেশা যখন চড়ে









চিত্র 53 (ক ও খ): মিনিটখানেক ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকুন। মনে হবে মূল চিত্র আর তার পৃষ্ঠভূমি তার স্থান পাল্টে ফেলছে। ক্যানাবিসের নেশা করলে মনে হবে খুব দ্রুত এই পরিবর্তন ঘটছে।

তখন দলের সবাই ঘোরের চোটে অনবরত বকে যায়।

ক্যানাবিসের নেশার সবচেয়ে মজার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হল যে সময়ের কোন আন্দাজ পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন সময় লাগাম ছাড়া হয়ে বেড়ে গেছে। তিরিশ মিনিটের সময়কাল মনে হয় বেড়ে একঘণ্টা হয়ে গেছে। এই ক্রিয়াটির জন্য একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়েছে যে মারিজুয়ানার নেশা করলে অনেক বেশি কাজ করা যায়। এই ক্রিয়াটিকে 'সময়ের বিস্তার' বা 'সময়ের সম্প্রসারণ' বলা হয়।

ধারণা আছে যে এই মাদক দ্রব্য 'মনের সম্প্রসারণ' ঘটায় আর চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিশক্তির প্রসারতা বাড়িয়ে দেয়। এমনও বলা হয়ে থাকে যে এই মাদক সৌন্দর্যের অনুভূতিকে সজাগ করে আর মানুষের শিল্পীসত্তা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

কিন্তু মুশকিলের কথা কি জানেন? এই ধারণাগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে এই মাদক দ্রব্য। মারিজুয়ানায় আসক্ত ব্যক্তি সৃজনশীলতার কথা ভেবে আনন্দ পায় আর ভাবে তার মত কর্মক্ষম আর কেউ নেই, কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এই ধারণার সারশূন্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে।

যেমন ধরুন বিজ্ঞানীরা মারিজুয়ানার ঘোরে আবিষ্ট বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের সুরসৃষ্টি একবার টেপ রেকর্ডারে বন্দী করে রেখেছিলেন। বাজানো সময়ে শিল্পীদের মনে হয়েছিল যে তাঁরা জীবনের সেরা সুর রচনা করে ফেলেছেন। পরের দিন নেশার ঘোর কাটতে সেই সুর যখন তাঁদের শোনানো হল তখন তাঁরা তাঁদের ভুলভাল বাজনা শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। শিল্পীদের সময়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। কয়েকজন শিল্পী তো বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে ধাপ্পাবাজির অভিযোগ পর্যন্ত এনেছিলেন।

একই ধরনের পরীক্ষায় চিত্রশিল্পীরাও মারিজুয়ানার নেশার ঘোরে উল্টোপাল্টা ছবি এঁকেছিলেন। এঁরাও ছবি আঁকার সময় ভেবেছিলেন বুঝি অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করতে চলেছেন। অঙ্কবিশারদরা নেশার ঘোরে সহজ অঙ্কের সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন আর খেলোয়াড়রা নেশার চোটে তাদের দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছিল। এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে মারিজুয়ানা কেন ভয়ঙ্কর মাদক-দ্রব্য। এই মাদক-দ্রব্য সেবনকারীকে দায়িত্বপূর্ণ কাজে কে বহাল করবে? কে মারিজুয়ানা-আসক্ত ড্রাইভারের গাড়িতে উঠবে? মাদকাসক্ত ড্রাইভার নিজেকে দক্ষ মনে করবে অথচ কার্যক্ষেত্রে ঘটাবে চরম বিভ্রাট।

ক্যানাবিস-আসক্তির আরেকটি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ফলে অনুভূতি শক্তিগুলি প্রগাঢ় হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে প্রতিটি রঙ অত্যন্ত চড়া ঠেকে আর প্রতিটি দৃশ্যের আপাত গভীরতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কোন ছবির নক্শাগুলি এর প্রভাবে বেশি স্পষ্ট মনে হয় আর ছবি ও তার পৃষ্ঠভূমির পার্থক্যটা ভীষণ চোখে লাগে (চিত্র 53 দেখুন)। এও মনে হয় যে ছবিগুলি দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে। শব্দগুলি অনেক বেশি কানে বাজতে থাকে আর স্বাদ গন্ধের অনুভূতি বহুগুণ

বিবর্ধিত হয়ে ওঠে। শীতলতা ও উষ্ণতার অনুভূতিও বেশিমাত্রায় সজাগ হয়ে পড়ে।

মারিজুয়ানার নেশা অতি মাত্রায় চড়লে নেশাড়ুর দৃষ্টিভ্রম বা হ্যালুসিনেশন হয় (যেমন এল এস ডি'র ফলে হয়—পরের অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণনা আছে)। বহু আসক্তকে আবার নিদারুণ ভয় আর চরম বিষাদ এসে গ্রাস করে। কেউ বলতে পারে না নেশার চোটে কে মাত্রাধিক আনন্দের অনুভূতি পাবে আর কে চরম হতাশার শিকার হবে। কখনো কখনো একই ব্যক্তি নেশার ঘোরে কখনও মাত্রাহীন আনন্দ ও কখনও প্রচণ্ড হতাশার উভয় অনুভূতি লাভ করে।

ক্যানাবিসের কার্যপ্রক্রিয়া

আজও বিজ্ঞানীদের কাছে এই মাদকটির কার্যপ্রক্রিয়া স্পষ্ট নয়। তবে অনেকগুলি তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি দলের ধারণা হল যে মারিজুয়ানার মূল মাদক উপাদান টি এইচ সি দেহের কয়েকটির বিশেষ বিশেষ স্থানে আবদ্ধ হয় আর তার ফলেই নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি যে মরফিন ও মরফিন জাতীয় ড্রাগের ক্রিয়াও ঠিক এইভাবেই হয়। বিজ্ঞানীরা আমাদের দেহে এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল খুঁজে বের করেছেন যেখানে টি এইচ সি খুব সহজে গিয়ে আটকা পড়ে। এই অঞ্চলগুলি লিভার আর মস্তিষ্ক। কিন্তু নির্দিষ্ট অঞ্চল সম্বন্ধে খুব একটা বেশি কিছু জানা যায় নি। এদেরকে টি এইচ সি রিসেপ্টর বলা যেতে পারে। এখন নানাদেশে এই রিসেপ্টর বা গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রগুলির উপর গবেষণা চলছে। ভবিষ্যতে গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলি এই রিসেপ্টরগুলির সম্বন্ধে আমাদের বিশদভাবে জানতে সাহায্য করবে।

এই ক্রিয়ার আরেকটি সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ক্রিয়া বুঝতে দেহকোষ গঠনের প্রক্রিয়াটির কথা একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। আমাদের দেহের প্রত্যেকটি কোষ একটি কোষ পর্দায় ঘেরা থাকে। এই কোষ পর্দাগুলিতে তৈলাক্ত এক ধরনের বস্তু থাকে যাকে স্নেহ পদার্থ বা লিপিড বলে। কোষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। কোষগুলিকে ভালভাবে আগে জেনে নিতে হয় কাকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে আর কাকে দেওয়া হবে না। এই সিদ্ধান্তে কোন ভুলচুক হলেই অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক হুড়মুড়িয়ে কোষে ঢুকে পড়ে আর দরকারী রাসায়নিক প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। কোষের এই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় কোষ মধ্যস্থ স্নেহ পদার্থ। ক্যানাবিস এই স্নেহ পদার্থের সাথে এমন বিক্রিয়া করে যে এদের কাজকর্ম ভণ্ডুল হয়ে যায়। ফলে যত রাজ্যের উল্টো পাল্টা রাসায়নিক কোষের ভিতর গিয়ে ভিড় করে। এই ঘটনা যদি মস্তিষ্কের কোষে ঘটে ভাবুন অনুভূতিগুলি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ক্যানাবিস নিলে ঠিক এই ঘটনাই ঘটে।

আরেকটি সম্ভাব্য কার্যপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেহে প্রোস্টাগ্লান্ডিন বলে একধরনের রাসায়নিক আছে। এই রাসায়নিকগুলি একেকটা অলরাউন্ডার অর্থাৎ এরা নানা কাজে পটু হয়। অনেক ড্রাগ আছে যা দেহের প্রোস্টাগ্লান্ডিনের মাত্রার হেরফের ঘটাতে পারে। যেমন অতিপরিচিত যন্ত্রণা-নিবারক ওষুধ অ্যাসপিরিন প্রোস্টাগ্লান্ডিনের মাত্রা কমিয়ে ব্যথা বেদনার উপশম ঘটায়। ক্যানাবিসের সবচেয়ে সক্রিয় রাসায়নিক টি এইচ সিও সম্ভবত দেহের প্রোস্টাগ্লান্ডিনের মাত্রা পাল্টে দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা ধন্দ এখনো কাটে নি। যেমন কয়েকটি কলায় (কোষ সমষ্টি) টি এইচ সি প্রোস্টাগ্লান্ডিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় আবার কয়েকটিতে মাত্রা কমিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে আরো অনেক গবেষণা করতে হবে, নাহলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছন যাবে না। সম্ভবত টি এইচ সি উল্লিখিত সবকটি ক্রিয়াই একত্রে উৎপন্ন করে থাকে। স্পষ্টভাবে সব কিছু এখনো বোঝা যায় নি।

উন্মাদের মত ছুটোছুটি

মারিজুয়ানা ধূমপায়ীরা একটি অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, যাকে বলে 'পূর্বদীপ্তি' বা 'ফ্ল্যাশব্যাক'। এই প্রক্রিয়ার ফলে আসক্ত ব্যক্তি নেশা ছেড়ে দেওয়ার মাসখানেক পরেও মাদকটির বিষাক্ত লক্ষণগুলির মুখোমুখি হয়। এল এস ডি আসক্ত ব্যক্তিরাও এই 'ফ্ল্যাশব্যাক' প্রক্রিয়ার কবলে পড়ে। এই মাদকটির সাথে এই অভিজ্ঞতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। একজন মারিজুয়ানা আসক্ত ব্যক্তি নেশা ছাড়ার একমাস পরেও হঠাৎ করে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে (যেন সে তক্ষুনি চড়া ডোজের মারিজুয়ানা সেবন করেছে) আর বদ্ধ পাগলের মত রাস্তায় ছোটাছুটি করতে পারে। এই বিচিত্র আচরণকেই 'উন্মাদের মত ছুটোছুটি' করা বলে। এই অবস্থায় লোকে ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র হাতে পাগলের মত খুনখারাপিও করে ফেলতে পারে। এই ফ্ল্যাশব্যাক প্রক্রিয়া থেকে ধাতস্থ হলে উন্মাদ মানুষটা কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যায়। সে নেশার ঘোরে করা তাণ্ডবের কথা বেমালুম ভুলে মেরে দেয়। অনেকে আবার পুলিশের কাছে গিয়ে অকপটে সব কথা বলে ফেলে আর অস্ত্রশস্ত্র শুদ্ধু নিঃসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করে। এই প্রক্রিয়াকে 'জেকিল এন্ড হাইড এফেক্ট' বলে। রবার্ট লুই স্টিভেন্‌সনের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডক্টর জেকিল এন্ড হাইড'-এ (রচনাকাল ১৪৪6) এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। সাড়াজাগানো এই উপন্যাসের মূলচরিত্র লন্ডন শহরের পরোপকারী ডক্টর জেকিল একটি ড্রাগের প্রভাবে মিস্টার হাইডরূপী দুষ্টচরিত্রে রূপান্তরিত হন। মাদকের প্রভাব চলে গেলে তিনি আবার যে কে সেই ডক্টর জেকিল হয়ে যান। এইভাবে একরাত্রে মি. হাইডের রূপে ডক্টর জেকিল স্যার ডেনভার্স ক্রুর হত্যা করে বসেন। উপন্যাসটির শেষটা খুবই উত্তেজনায় ভরা তবে বেশ দুঃখজনক।



চিত্র 54 ফ্ল্যাশব্যাক বা পূর্বদীপ্তি প্রক্রিয়া ড. জেকিল এন্ড হাইডের কথা মনে করায়।

মারিজুয়ানার কুপ্রভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের গতিও বেড়ে যেতে পারে (ট্যাকি কার্ডিয়া)। এই মাদক খিদে বাড়াতে আর বমি বমি ভাব কমাতেও সক্ষম হয়।

সত্যি সত্যি ডাক্তারেরা কিছু রোগীর বমি থামাতে (অ্যান্টিমিটিক) এটি প্রয়োগ করে ভাল ফল পেয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে যে কিছু ক্ষেত্রে ভাল ফল দেয় বলে চিন্তাভাবনা না করে টি এইচ সি ব্যবহার করার ফল মারাত্মক হতে পারে। যে কোন ড্রাগ ভাবনাচিন্তা না করে নিলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

সিগারেটের ধোঁয়ার মত মারিজুয়ানার ধোঁয়াতেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলকাতরার মত

বস্তু থাকে। এর ফলে নাকের (রাইনিটাস) অথবা গলার প্রদাহ (ফ্যারিন্জাইটিস) এবং গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোতে থাকে। শ্বাসনালী কিছুটা প্রসারিতও হয়ে ওঠে। এই ধর্মের জন্য যে সব হাঁপানি রুগী শ্বাসনালীর সঙ্কোচন জনিত কারণে শ্বাসকষ্ট বোধ করে, তাদের শ্বাসনালী প্রসারিত করতে এই ড্রাগের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে এর ফলে প্রচলিত হাঁপানির ওষুধের চেয়ে ফল খুব একটা ভাল হচ্ছে না। তার ওপর এই ড্রাগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি নানা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্যানাবিস নিলে আবার চোখের রঙও লাল হয়ে যায়।

মারিজুয়ানা আসক্ত বহু ব্যক্তি দাবি করে যে এই মাদকটি অতি উত্তম কামোদ্দীপক। কিন্তু আসলে এটি বন্ধ্যাত্ব এনে দেয়। এটি শুক্রানুর সংখ্যার হ্রাস ঘটায় আর পুরুষদের রক্তে যৌন হরমোন টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমিয়ে দেয় আর বহু পুরুষের মধ্যে এই মাদকের প্রভাবে স্তনগুলি বিকশিত হতে থাকে। এই রোগটিকে গাইনিকোমাস্টিয়া বলে।

মারিজুয়ানার উপকার ও অপকার নিয়ে তর্কবিতর্কের শেষ নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে ঃ

- স্বাভাবিক মাত্রার মারিজুয়ানা হয় খানিকটা আনন্দের অনুভূতি এনে দেয় অথবা কোন প্রভাবই ফেলে না।
- কোন কোন নেশাসক্ত ব্যক্তি মারিজুয়ানার ধূমপান করার পর আতঙ্ক, হতাশা বা মানসিক বিকারের শিকার হয়।
- নিয়মিত যারা মারিজুয়ানা ধূমপান করেন তারা মানসিক রোগে ভোগেন বটে—কিন্তু নেশা ছেড়ে দিলেই স্বাভাবিক আচরণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।
- মারিজুয়ানার নেশা কখনই নিরাপদ নয় তবে এর নেশার ঘোরে সচরাচর মানুষ ঘৃণ্য অপরাধে প্রবৃত্ত হয় না।

ছয়

এল এস ডি ঃ স্বর্গের (নাকি নরকের!) চাবিকাঠি

হ্যালুসিনোজেন বা ভ্রম উৎপাদনকারী মাদকগুলি মানুষকে অলীক জগতে পাড়ি দিতে সাহায্য করে। এই মাদকগুলি (এল এস ডি'র নামটি সর্বাধিক পরিচিত) মানুষের অনুভূতি আর পরিবেশকে বোঝার স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটায়; যার ফলে, এই মাদক মানুষের রঙের সংবেদনশক্তি বেশিমাত্রায় সক্রিয় করে তোলে, বিকৃত করে কিংবা অবচেতন মনের চিন্তা ভাবনা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। আসক্ত ব্যক্তি বলে, সে নাকি শব্দের প্রতিটি ধ্বনি 'দেখতে' পায়, দৃশ্যগুলি 'শুনতে পায়' আর সেগুলির 'গন্ধও' পায়।

এল এস ডি'র সম্পূর্ণ নাম হল লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইইথাইল মাইড আর এটি হ্যালুসিনোজেন গোষ্ঠীভুক্ত মাদক দ্রব্য। এই গোষ্ঠীর ড্রাগগুলি আসক্ত ব্যক্তির মেজাজ আর বোধশক্তির পরিবর্তন ঘটায়। এই শ্রেণীর ড্রাগের নামকরণ হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'আলুসিনারি' থেকে যার অর্থ 'মনের বাউণ্ডুলেপনা'। এই ধরনের ড্রাগগুলিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়—সাইকোটোমাইমেটিক, সাইকেডেলিক, ইলিউশনোজিনিক অথবা মিস্টিকোমাইমেটিক। কেউ কেউ এগুলিকে মনের প্রসারণকারী ড্রাগ বলেন।

হ্যালুসিনোজেন মানুষের মন ও সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বের উপর অন্যান্য ড্রাগের মত প্রভাব ফেলে না। এর বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার একটি হল মানুষের কল্পনায় সুস্পষ্ট চিত্রবৎ অলীক জগতের সৃষ্টি। এটি সেবন করার পর অন্তত আট থেকে দশ ঘণ্টা ঘুম আসে না। অনেকের মনে একটা আতঙ্কের অনুভূতি চলে আসে। হঠাৎ করে মুখ লাল হয় আর উত্তেজনার চোটে শরীর কাঁপতে থাকে।

নানা রকমের হ্যালুসিনোজেন

অনেক রকমের হ্যালুসিনোজেন আছে কিন্তু জীবরসায়নবিদ্যা অনুযায়ী এগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ইন্ডোলঅ্যালাইলামাইন্‌স বা আই

এ এ। এগুলির রাসায়নিক গঠনের মূলে থাকে ইন্ডোল, (নাইট্রোজেন বলয় সম্পন্ন) যার একাধিক বলয় থাকে। এই রাসায়নিকের দলে পড়ে এল এস ডি, সিলোসিন, সিলোসাইবিন, ডি এম টি (ডাইমিথাইল ট্রিপ্টামাইন) আর হার্মালা অ্যালক্যালয়েড। দ্বিতীয় দলে আছে ফিনাইল ইথাইল অ্যামিন বা পি ই এ। এদের মাত্র একটি বলয় থাকে। এই দলে পড়ে মেসকালাইন। তৃতীয় দলে পড়ছে ফিনাইল আইসো প্রোপাইল অ্যামিন অথবা পি আই এ। যদিও এদেরও একটাই বলয় থাকে, গঠন অত্যন্ত জটিল হয়। এই দলে পড়ে কৃত্রিম কিছু ড্রাগ যার বর্ণনা ইতিমধ্যেই প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। DOM (বা STP), MDA, DOET, MMDA আর TMA—এই ধরনের কিছু ড্রাগ। এই আদ্যাক্ষরগুলির পিছনে লুকিয়ে আছে লম্বা লম্বা রাসায়নিক নাম। যেমন ধরুন DOM-এর পুরো নাম হল 2, 5-ডাইমিথক্সি-4-মিথাইল অ্যাম্ফিটামাইন। এই আদ্যক্ষর সংবলিত নামগুলিকে চলতি ভাষায় নানা মজাদার নামে ডাকা হয়ে থাকে। যেমন MDMA কে ঘুরিয়ে অনেকে অ্যাডাম বলে।

এল এস ডি

এল এস ডি আমাদের জানা অত্যন্ত শক্তিশালী ড্রাগগুলির মধ্যে অন্যতম। মাত্র 25 মাইক্রোগ্রাম (গ্রামের হাজার ভাগ) নেশা চড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। এল এস ডি মস্তিকে কিভাবে কাজ করে তা এখনো বোঝা যায় নি। সম্ভবত এই ড্রাগ মস্তিকে রাসায়নিক পরিবর্তন আনে আর নিউক্লিক অ্যাসিড নামের একটি জটিল জৈব যৌগের সাথে জুড়ে যায় (নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যেই জীবকোষের যাবতীয় নকশা আঁকা থাকে)। LSD অবশ্য কোন ড্রাগ নির্ভরশীলতা তৈরী করে না অর্থাৎ এর নেশা হঠাৎ ছেড়ে দিলে কোন প্রত্যাহরণ-লক্ষণ বা উইথড্রয়াল সিম্পটম দেখা যায় না। তবে ড্রাগের ধাক্কা সহ্য করার ক্ষমতা খুব তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে। নেশা শুরু করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পুরো আমেজ আনতে 500 মাইক্রোগ্রাম মাত্রার ড্রাগের প্রয়োজন হয়। অন্যান্য ড্রাগের তুলনায় এই ড্রাগের মাত্রা খুবই অল্প। মাত্র 30 গ্রাম LSD আড়াই লক্ষ নেশাড়ুকে নেশার আমেজ এনে দিতে পারে। এ কারণেই এক গাঁজাখুরি গল্প বাজারে চালু আছে যে শহরের জল-সরবরাহ ব্যবস্থায় কেউ একজন 30 গ্রাম LSD মিশিয়ে গোটা শহরের মানুষকে পাগল বানিয়ে ছেড়েছিল।

তরল অবস্থায় ছোট মাত্রায় LSD ও খুব কার্যকর হয়। একটি সুচের ডগায় সামান্য ড্রাগ নিলেই কাজ হয়। LSD কিন্তু 'কচিকাঁচাদের ড্রাগ' বলেই সুপরিচিত। দেখা গেছে বিশ-বাইশ বছর বয়সের পর আর কেউ এই মাদক সেবন করে না। ষাটের দশকে যখন স্কুল-কলেজের ছেলেদের মধ্যে একবার মহাজাগতিক ক্ষমতা অথবা ঈশ্বরের সাথে 'একাত্ম' হবার হিড়িক পড়েছিল। সেই সময় অনেকেই LSD সেবন করে এই ব্যর্থ চেষ্টায় সামিল হত। আসলে সাইকেডেলিক (এই

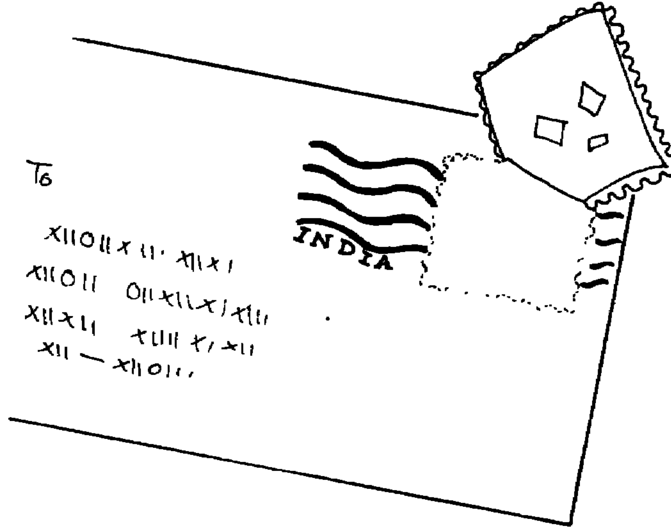
গোত্রেই LSD আছে) নামটার উৎপত্তিই হয়েছে এই উদ্ভট ধারণা থেকে। এটি গ্রীক শব্দ 'সাইকে' (অর্থ আত্মা) আর 'ডেলোসে'র (অর্থ দৃশ্যমান) মিলন থেকে তৈরী হয়েছে। LSD নাকি 'আত্মাকে দেখতে' সাহায্য করে। নিজের আত্মাকে আবিষ্কার করার জন্য আর কল্পলোকে বিচরণ করতে এই ড্রাগ নেওয়া হত। অনেকে সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেও এই ড্রাগের সাহায্য নিত। কেউ কেউ মনে করত আধ্যাত্মিক সাধনার পথপ্রদর্শক LSD। তাই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন নেশাখোরের বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকলেও ড্রাগটির মূল প্রভাব সেই একই। এটি মানুষের সচেতনতাকে ওলট পালট করে দেয়।

নানা আকারের এল এস ডি কিনতে পাওয়া যায়। ক্যাপসুল চিনির ঘনক (কিউব), লজেন্স, চ্যুইং গাম, ব্লটিং পেপার, এমনকি ডাক-টিকিটের আকৃতির এল এস ডিও পাওয়া যায়। এই ড্রাগটি সাধারণত গলাধঃকরণ করে খাওয়া হয়। এটির গুঁড়ো বা ঠাণ্ডা পানীয়তে মিশিয়ে যেমন খাওয়া যায় তেমনই মিষ্টি বা লজেন্সেও দেওয়া যায়। ব্লটিং পেপারেও এই গুঁড়ো এমনভাবে সেঁধিয়ে রাখা যায় যে এই কাগজ চুষলেই নেশা হয়। এই আকৃতির LSD কে বলে "ব্লটার অ্যাসিড"।

গবেষণাগারে LSD তৈরী করা খুব সহজ। একশো টাকা দামের ছোট্ট এক মাত্রা LSD তৈরী করতে মাত্র এক টাকা লাগে। কিন্তু ভারতে যত LSD পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই বিদেশে তৈরী হয়ে চোরাকারবারীদের মারফত এসে পৌঁছয়। উচ্চ কার্যকর ক্ষমতা, স্বাদ-গন্ধ-বর্ণহীনতা ও জলে দ্রাব্যতা ড্রাগ-চোরাচালানকারীদের সহায়ক হয়। আজকাল এল এস ডি সুগার-কিউব (চিনির ঘনক) আর চ্যুইং গাম আকারেই বেশি পাওয়া যায়। এটি পাতলা চৌকো চৌকো আঠালো পদার্থ (জিলটিন) বা 'জানালার শার্সির' আকৃতিতেও পাওয়া যায়। এই 'জানালার শার্সিগুলি এতই ক্ষুদ্রকায় হয় যে এগুলিকে সহজেই খামে সাঁটানো ডাকটিকিটের তলায় লুকিয়ে রাখা যায়। পুলিশ অবশ্য এইভাবে লুকানো LSD অনায়াসে খুঁজে বের করে (চিত্র দেখুন)। ডাকটিকিটের তলায় লুকানো এই বিচিত্র পদ্ধতিটির থেকেই "টিকিটটা খুলে নিয়ে, নেশা করো চেটেপুটে" নীতি বাক্যের উদয় হয়েছে।

LSD পাচার করার সর্বাধুনিক পদ্ধতিটিতে ডেক্যাল অথবা ডেক্যালকোম্যানিয়া কাগজ ব্যবহার করা হয়। এই কাগজে LSD গেঁথে রাখা হয়। এই কাগজগুলিতে আপাতভাবে মিকি-মাউস, ডেনিস দ্য মিনেস ইত্যাদি জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্রগুলির ছবি আঁকা থাকে। নেশাখোর ছবিটি চেটে-চেটে নেশা করে।

সাধারণত LSD খেয়েই নেশা করা হয়। খুব কমই ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে অথবা শুঁকে নেশা করা হয়। ধূমপান তো প্রায় একেবারেই চলে না কারণ এর ফলে হঠাৎ তুঙ্গে উঠে আসা নেশাটা অনেকে বরদাস্ত করতে পারে না।



চিত্র 55 : জানালার শার্সি আকৃতির এল এস ডি, ডাকটিকিটের আড়ালে লুকানো থাকে।

নেশার প্রচলিত পদ্ধতি

অন্যান্য ড্রাগে যেমন সহজেই ভেজাল মেশানো যায় তা LSD-র ক্ষেত্রে একেবারেই অপ্রযোজ্য। হেরোইনে যেমন ভেজাল মেশাতে মেশাতে খাঁটি মাদকের পরিমাণ কমে প্রায় শূন্য শতাংশে এসে দাঁড়ায় তা এটির ক্ষেত্রে হয় না। এর কারণ হেরোইন অত্যন্ত দামি ড্রাগ আর এটি তৈরী করতেও প্রচুর খরচ পড়ে। কিন্তু LSD যেমন তৈরী করা সহজ তেমনই সস্তা। তাই এই মাদকে ভেজাল মেশানোর প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ এমন অনেক ড্রাগ আছে (যেমন মেস্কালিন, সিলোসাইবিন, টি এইচ সি ইত্যাদি) যা আসলে LSD ছাড়া আর কিছুই নয়।

LSD ব্যবহার করার পদ্ধতিগুলি খুবই বিচিত্র। বেশিরভাগ LSD আসক্ত ব্যক্তি টানা নেশা করে না। এরা সাধারণত 'সপ্তাহান্তে' এই নেশা করে থাকে। আসক্ত ব্যক্তিরা দেখা গেছে একাধিক ড্রাগের নেশা করে। যেমন LSD-র পাশাপাশি মারিজুয়ানা অথবা অ্যাম্ফিটামাইনের নেশা চলতে থাকে। এইভাবে অন্যান্য হ্যালুসিনোজেনের প্রতিও (যেমন মেস্কালিন আর সিলোসাইবিন) সহ্যক্ষমতা গড়ে ওঠে। কিন্তু ফেনসাইলিডিন অথবা ক্যানাবিস সহ্য করা ক্ষমতায় আসে না। পাক্কা LSD আসক্ত ব্যক্তিকে 'অ্যাসিড হেড' বলে।

LSD-র গল্প

প্রচলিত খাদ্যশস্য রাইয়ের সাথে LSD-র উৎপত্তির ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এই শস্যকে প্রায়শই ক্লডিসেপ্‌স পার্পুরিয়া নামের একটি ছত্রাক আক্রমণ করে। সাধারণত আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে রাইশস্যের ক্ষেতে এই ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে। অন্যান্য ফসলও এই ছত্রাকে সংক্রমিত হয় কিন্তু এই জীবাণুর প্রিয় খাদ্য রাই শস্য। ছত্রাকটির রেণুগুলি (জননের একক) কীটপতঙ্গের শরীরে লেগে বা বায়ুর সাহায্যে রাইশস্যের ডিম্বকে এসে পড়ে। ডিম্বকের মধ্যে রেণুগুলি প্রস্ফুটিত হয়ে নলাকার অণুসূত্র গঠন করে। এই অণুসূত্রগুলি খমির জাতীয় শক্তিশালী রাসায়নিক উৎপন্ন করে যা ডিম্বকের নীচের দিকে ছিদ্র তৈরী করে। এই খমির শস্যের পচন ধরায় আর হলুদ, আঠালো পদার্থ উৎপন্ন করে যাকে 'হানিডিউ বলে। এই মধু সদৃশ চট্‌চটে রাসায়নিকটি কীটপতঙ্গদের আকৃষ্ট করে যারা রাইশস্যের মঞ্জরীতে ছত্রাকগুলিকে ছড়িয়ে দেয়। অণুসূত্রগুলি ডিম্বকের গভীরে বিস্তৃত হয় আর ক্রমশ একটি শক্ত বেগুনি রঙের স্ক্লেরোটিয়াম গঠন করে। একে ইংরাজিতে রাইশস্যের আর্গট বলে। এটি একটি ফরাসী শব্দ 'আর্গট' থেকে আহরিত যার আক্ষরিক অর্থ 'মোরগের নকল-নখ'। এটি দেখতে মোরগের নখের কাছে অবস্থিত অঙ্গটির মত হয় বলে এহেন নামকরণ। তাই এই আর্গটের একটি প্রাচীন নাম ছিল 'নখরযুক্ত রাই।



চিত্র 56: ছত্রাক সংক্রমিত (কালো কালো) রাই শস্য।

এই ছত্রাক সংক্রমিত রাইশস্য খাওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু ইউরোপে মধ্যযুগে গরিব চাষীরা এই রোগে আক্রান্ত রাইশস্য খেতে বাধ্য হত যার ফলে আর্গটিজ্‌ম বা 'সেন্ট অ্যান্থনির আগুন' নামে একটি বিচিত্র রোগের কবলে পড়ত। রোগীদের হাতে পায়ে দারুণ যন্ত্রণা হত আর খিঁচুনি হত। মনে হত হাত-পাগুলিতে আগুন লেগেছে আর পুড়ে কালো হয়ে খসে পড়বে। শেষ পর্যন্ত অনেককেই হাত পা খোয়াতে হত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে সাধু অ্যান্থনির আশ্রমে গেলে তিনি এই রোগের উপশম করাতে পারবেন। এই কারণেই নামকরণ হয়েছে "সেন্ট অ্যান্থনির আগুন"।

পরে বিজ্ঞানীরা আর্গটে উপস্থিত



চিত্র 57: রোগগ্রস্ত শস্য-বিবর্ধিত আকারে মোরগের নকল নখের মত দেখায়।

আর্গটামাইন আর আর্গোনোভাইন রাসায়নিকগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলিই এই মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। এই রাসায়নিকগুলি দেহের মসৃণ পেশীগুলির সঙ্কোচন ঘটায়। রক্তবাহী নালিকাগুলির গায়ে মসৃণ পেশী থাকে যার ফলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত-সরবরাহ ব্যাহত হয়। আমরা সকলেই জানি যে হাত ও পায়ে রক্ত না পৌঁছলে সেখানকার কোষগুলির মৃত্যু ঘটবে। আর কালো বর্ণ ধারণ করবে। একেই বলে গ্যাংগ্রিন। প্রাচীন কালে অবশ্য মানুষের ধারণা ছিল যে অজানা কোন আগুন বুঝি এই কালো বর্ণের জন্য দায়ী।

মহিলাদের জরায়ুতেও মসৃণ পেশী থাকে। এই পেশীর সঙ্কোচন ঘটলে এর ভিতরের জৈব বস্তু বেরিয়ে আসে। এই কারণেই আর্গট খেলে বহু মহিলাদের গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মজার কথা হল যে গর্ভস্থ সন্তান সম্পূর্ণ পরিণত হয়ে থাকলে আর্গট সন্তান জন্মের সময় সহায়ক হয়। জরায়ুর সঙ্কোচন এক্ষেত্রে শিশুর জন্মের প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করে দেয়। পোস্টপার্টম হেমারেজ (সন্তানজন্মের পরে যে রক্তক্ষরণ হয়) হলেও সেটা থামিয়ে দিতে পারে আর্গট। তাই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ধাত্রীবিদ্যায় আকছার আর্গট ব্যবহার করা হত। 1935 সালে আর্গট থেকে আর্গোনোভাইন পৃথক করা হয়। এই রাসায়নিকটিই জরায়ুকে সঙ্কুচিত করে। আর্গট অচিরে বহুমূল্য অনেকগুলি ড্রাগের খনিতে



চিত্র 58: সাধু অ্যান্থনির নামানুসারে "সেন্ট অ্যান্টনিস ফায়ার' রোগের নাম হয়েছে।

রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু ভাবছেন যে LSD-র সাথে এসব কিছুর কি সম্পর্ক? তিরিশের দশকের শেষের দিকে সুইশ বিজ্ঞানী আর্থার স্টোল আর্গটের বিভিন্ন উপক্ষারগুলির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে প্রত্যেকটি উপক্ষারের অণুগুলির একটি বিশেষ অংশের মধ্যে মিল থাকে। এই মিলের অংশটির নাম লাইসারজিক অ্যাসিড। প্রফেসর স্টোল এই অংশটির পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নততর নতুন কোন ড্রাগ তৈরী করতে চাইছিলেন—এমন ড্রাগ যার রক্তবাহী নালিকা সঙ্কুচিত করার ক্ষতিকর ক্ষমতা থাকবে না অথচ উপকারী দিকটা অপরিবর্তিত থাকবে। এই আবিষ্কার করতে পারলে অত্যন্ত মূল্যবান ওষুধের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হবে। তিনি এই আবিষ্কারের গুরুভার দেন বেস্‌লের স্যান্ডোজ লিমিটেড কোম্পানির প্রাকৃতির উৎপাদন বিভাগের গবেষণার প্রধান ড. অ্যালবার্ট হফম্যানকে।

হফম্যান লাইসার্জিক অ্যাসিড থেকে অনেকগুলি নতুন যৌগ প্রস্তুত করেন। এর মধ্যে ছিল লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইইথাইল অ্যাসিড। এটি প্রোফেসর আর্নস্ট রথলিনকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছিল। এটি লাইসারজিক অ্যাসিড অ্যামিডের সদ্য আবিষ্কৃত যৌগগুলির 25 নম্বর যৌগ ছিল। তাই এটির নাম দেওয়া হয় এল এস ডি-25। প্রোফেসর রথলিন এটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেন আর এর জরায়ু সঙ্কুচিত করার ক্ষমতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এই ক্ষমতার কথা আগে থেকেই আন্দাজ করা হয়েছিল কিন্তু এই রাসায়নিক সম্বন্ধে তাঁর রিপোর্টে আরেকটি অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যের কথার উল্লেখ ছিল—রাসায়নিকটি কিছু বিশেষ বিশেষ প্রাণীর মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। সেটা ছিল 1938 সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে LSD সংক্রান্ত সব গবেষণাকে বছর পাঁচেক ধামাচাপা দিয়ে রাখল।

1943 সালে ডক্টর হফম্যান নতুন উদ্যমে আবার তার গবেষণা শুরু করলেন। এবার ড্রাগটি তিনি নিজের শরীরে প্রয়োগ করে দেখলেন। 1943 সালের 19 শে



৲ 59 : এল এস ডি-র আবিষ্কর্তা ড. হফম্যান।

এপ্রিল বিকেল চারটে বেজে কুড়ি মিনিটে তিনি 250 মাইক্রোগ্রাম LSD খেয়েছিলেন। জিনিসটি তার জিভে বিস্বাদ ঠেকে। চারটে বেজে পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলেন। ঠিক পাঁচটা থেকে দেখা দেয় নানা অস্বস্তিকর উপসর্গ—তার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে, শরীর আনচান করে ওঠে, মনঃসংযোগ ব্যাহত হয়, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে আর প্রবল হাসি পেতে থাকে। এরপর তিনি আর কোন উপসর্গের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারেন নি। শেষ বর্ণনাটিও খুব কষ্ট করে লেখেন। তার সহকারীকে তার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত যাবার অনুরোধ করেন। দুজনে একসাথে সাইকেলে চেপে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। পরে তিনি বলেছিলেন, "আমার চোখের সামনে সবকিছু দুলছিল আর উদ্ভট আয়নায় দেখা প্রতিকৃতির মত বেঁকেচুরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমার নড়াচড়া করার শক্তি লোপ পেয়েছে। কিন্তু পরে আমার সহকারী বলেছিল যে আমি নাকি দিব্যি সুস্থভাবেই সাইকেল চালিয়েছিলাম।"

তারপরে কয়েকঘণ্টা আরো বিচিত্র-বিচিত্র সব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তাঁর বর্ণনায়, "মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করা বেড়ে গিয়েছিল, দৃষ্টি আরো ঝাপসা হয়ে উঠছিল; চারদিকে ভেসে উঠছিল চিত্রবিচিত্র মুখোশপরা মুখ; প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল আর হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছিল; কিছুক্ষণ পর-পর হাত-পা, মাথা আর প্রায় পুরো শরীর অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উঠছিল; গলা শুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল; সব কিছুই কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, একেবারে টনটনে জ্ঞান ছিল আর আমি সামনে পাগলের মত আমার অবস্থার কথা বিড়বিড় করে বলে চলেছিলাম। কখনও বা চিৎকার করে উঠছিলাম। একেকবার আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি নিজের দেহের বাইরে বিচরণ করছিলাম.....।"

LSD-র প্রভাব বর্ণনা করে তিনি যে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা একেবারে সত্যি। এখন জানা গেছে যে নেশাটা চড়তে প্রায় আধঘণ্টা লাগে আর

দুই থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে তা তুঙ্গে পৌছে যায়। আট থেকে বারো ঘন্টার মধ্যে নেশা ছুটে যায়। কেউ কেউ বেশিক্ষণ অলীক জগতে ঘুরে বেড়ায়। নেশার বিপজ্জনক দিকটা হল যে লোকে এর প্রভাবটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। একটু অতিরঞ্জন থাকলেও উঁচু বাড়ির জানালা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া, গতিশীল যানবাহনের মাঝে গিয়ে দাঁড়ানো, আগুনের মাঝে হেঁটে যাওয়া বা সাগরে হেঁটে মিশে যাওয়ার চেষ্টার ঘটনাগুলি কিন্তু কালেভদ্রে ঘটেও থাকে। অ্যাম্ফিটামাইনের মত LSD ও আসক্তের মধ্যে বিকৃত মস্তিষ্কে লাঞ্ছিত মনোভাব ফুটিয়ে তোলে। নেশাসক্ত নিজেকে নির্যাতিত মনে করতে থাকে আর হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। আরো কয়েকটি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, যেমন নানা রকমের মানসিক ভারসাম্যহীনতা, দেখা যায় যার জন্য হাসপাতালেও ভর্তি করতে হতে পারে। কখন কি প্রভাব ফেলে তা বলা খুব কঠিন।

কয়েকটি মানসিক ব্যাধির সাথে LSD উৎপন্ন উপসর্গগুলির হুবহু মিল থাকার ফলে, বহু চিকিৎসক ভেবেছিলেন যে এই রোগগুলির কোন ওষুধ (এই রাসায়নিকের সাহায্যে) আবিষ্কার করা সহজ হবে। তাই বহু চিকিৎসক নানা মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় LSD প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কখনো এর ফল আশাপ্রদ হয় নি। মদ ও আফিম আসক্তদের চিকিৎসায় LSD প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া অটিজ্‌ম (একটি দুর্লভ ব্যাধি; এটি শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, যার ফলে কথা বলা ও বোঝার শক্তি লোপ পায়), পরিণত অবস্থার ক্যানসারের চিকিৎসায় ও অন্যান্য মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় LSD প্রয়োগ করা হয়। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় এই চিকিৎসা খুবই আশা জাগিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর কোন চিকিৎসাগত মূল্য নেই বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ভাল ও মন্দ ট্রিপ

LSD-র মত সাইকেডেলিক মাদক দ্রব্যগুলির প্রভাবে মানুষ অলীক জগতে প্রমোদ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। এই ভ্রমণের চলতি নাম ট্রিপ। কিন্তু ট্রিপেরও আবার রকমফের আছে। ভাল ট্রিপ বলব সেই ভ্রমণকে যা মানুষকে আনন্দ দেবে আর আবেগপ্রবণ করে তুলবে। এক্ষেত্রে সুন্দর-সুন্দর দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বাজে ট্রিপে বারবার হোঁচট খেতে হবে। দৃশ্যগুলি হবে ভয়ঙ্কর, জঘন্য এবং শোচনীয়। আগে থেকে কখনই বলা যায় না যে কার ভাগ্যে ভাল ট্রিপ আছে আর কার মন্দ ট্রিপ। LSD খাওয়া তাই একটা রাসায়নিকের সাথে ফাটকা খেলার সামিল। LSD-র সাথে অ্যাম্ফিটামাইন মিশিয়ে খেলে এমন ভীষণ সব দৃশ্যের অভিজ্ঞতা হয় যে একে 'ডেথ ট্রিপ' বা 'মরণ ভ্রমণ'ও বলা হয়ে থাকে।



চিত্র 60 : গালিভার প্রভাবের ফলে আসক্ত নিজেকে লিলিপুটদের জগতে দৈত্য ভাবতে থাকে।

ফ্ল্যাশব্যাক

LSD-র নেশার একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব হল ফ্ল্যাশব্যাক। ক্যানাবিসের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটে। LSD নেওয়া ছেড়ে দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ, এমনকি মাসখানেক পরেও, নেশার প্রভাবের পুনরুদয় হতে পারে। এই প্রক্রিয়াতে LSD-র নেশায় উৎপন্ন অলীক জগতে ভ্রমণের ঘটনা ঘটে। কিন্তু মজার কথা হল, এবার এই ভ্রমণ LSD ছাড়াই সম্ভব হয়। এটির কারণ বিজ্ঞানীদের কাছে আজও রহস্য হয়ে আছে। সম্ভবত মস্তিষ্কের রাসায়নিক পরিবর্তনই এর জন্য দায়ী। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ

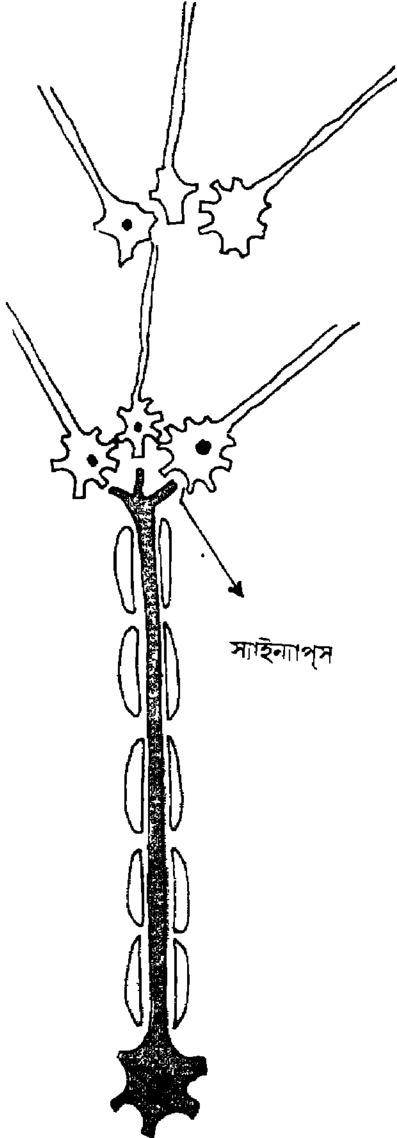
চিত্র 61 : এল এস ডি আসক্তির ফলে রঙিন চরকি ঘুরলে 'মধুর সঙ্গীতের অনুভূতি' আসে।

ক্ষেত্রে ফ্ল্যাশব্যাক কিভাবে শুরু হয় তা বলা যায় না। বাকি পঞ্চাশ ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় উজ্জ্বল আলো, মদ্যপান, উচ্চ স্বর, মারিজুয়ানার নেশা অথবা কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জেরে ফ্ল্যাশব্যাকের সূত্রপাত হয়। পাক্কা LSD আসক্ত ব্যক্তির মধ্যে অন্তত পাঁচ শতাংশের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাশব্যাক দেখা যায়।

LSD-র প্রভাব

বিজ্ঞানী হফম্যান LSD-র বিভিন্ন প্রভাবের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন। আরো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে LSD-র নেশা, মস্তিষ্কের উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে আমূল পাল্টে দেয়। রঙগুলো চড়া ঠেকে, কোন চিত্রের বাহ্যিক সীমারেখাগুলি অতিরিক্ত স্পষ্ট দেখায়। বস্তুগুলি স্বাভাবিকের তুলনায় ছোট অথবা বড় মনে হয়। একে বলে গালিভার-প্রভাব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে জোনাথান সুইফ্‌টের বিখ্যাত উপন্যাস 'গালিভার্স ট্র্যাভেলের' কথা—যেখানে গালিভার লিলিপুটদের দেশে গিয়ে হাজির হন। ক্ষুদ্রকায় লিলিপুটদের দেশে বিচিত্র

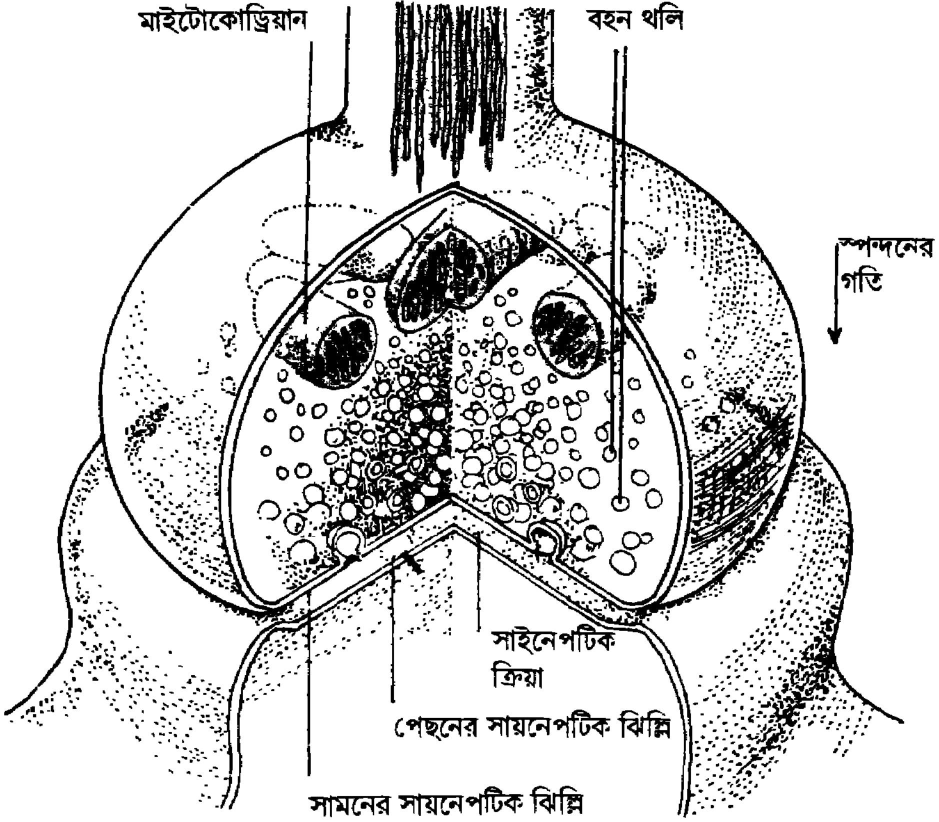
অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর তিনি দৈত্যাকার ব্রবডিংল্যাগদের দেশেও গিয়ে পড়েছিলেন। চোখ বুজিয়ে ফেলার পর ফ্ল্যাশব্যাকে চোখের সামনে রঙিন ছবি ভাসতে থাকে। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানের ভাষায় সিনাস্থেসিয়া বলে। এর ফলে একটি বিশেষ ধরনের উত্তেজনা অনেকগুলি অনুভূতি সৃষ্টি করে। সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি, নেশার ঘোরে নানা রঙের বর্ণালী তুলে ধরতে পারে আবার একটি সুন্দর ছবি বা রঙ বেরঙের চাকা মস্তিষ্কে সুমধুর সঙ্গীতের অনুভূতি আনে। স্বাভাবিক মানুষের চেহারা বাঁকাচোরা দেখায়। সম্পূর্ণ মানবদেহ বা তার হাতগুলো হয় খুব বড় বা অস্বাভাবিক রকম ছোট দেখায়, একে বলে 'অ্যালিস ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড প্রভাব' (লুইস ক্যারলের বিখ্যাত এই উপন্যাসটিতে এক আজগুবি দেশের বর্ণনা ছিল)।



চিত্র 62: স্যাইন্যাপ্স-দুটি স্নায়ুর মধ্যবর্তী স্থান।

দেহে আরো অনেক পরিবর্তন আসে। রক্তের চাপ বাড়ে, হৃদ্‌পিণ্ড আরো জোরে ছোটে, চোখের মণি বড় হয় (ফলে বেশি আলো ঢোকে আর চোখে যন্ত্রণা শুরু হয়), চামড়া ও চোখ লাল হয়, ক্ষুধামান্দ্য দেখা যায়, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়, চোখ দিয়ে জল পড়ে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, কাঁপুনি আসে, হাঁটার সময় টলে টলে উঠতে হয় আর থেকে থেকে বমি হতে থাকে। শরীরের তাপমাত্রাও খুব বেড়ে যায় (খরগোশের উপর LSD প্রয়োগ করে দেখা গেছে এই তাপ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় আর এটিই মাদক প্রয়োগের প্রধান উপসর্গ হয়ে দেখা দেয়) আর খিঁচুনি দেখা যেতে পারে। কখনো কখনো কঠিন মানসিক অসুখ দেখা যায়। প্রায় 50 মিলিগ্রাম LSD একজন মানুষকে মেরে ফেলতে পারে।

1967 সালে বিজ্ঞানী কোহেন LSD-র



চিত্র 63 : সাইন্যাপ্‌সের বহু বিবর্ধিত চিত্র। দুটি মুণ্ডির মত গঠন আসলে দুটি স্নায়ুর প্রান্ত। উপরিস্থিত মুণ্ডিতে বুদ্‌বুদ্‌ সদৃশ অনেকগুলি বস্তু দেখা যাচ্ছে। এগুলি সেরোটোনিন পূর্ণ ক্ষুদ্র থলি। এই রাসায়নিকটিই মস্তিষ্কে স্পন্দন নিয়ে যায়।

প্রভাবে, মানুষের শ্বেত রক্ত কণিকার ক্রোমোজোমে (কোষের নিউক্লিয়াসের সূত্রাকার জৈব বস্তু; এটিই বংশগতির একক 'জিনের' ধারক ও বাহক) কিছু ত্রুটি লক্ষ করেন। সমসাময়িককালে বিখ্যাত সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত এই পর্যবেক্ষণটি সবার নজর কাড়ে। হয়ত আপনাদের স্মরণে থ্যালিডোমাইড দুর্ঘটনার ভয়ঙ্কর স্মৃতি আজও জ্বল-জ্বল করছে। বছর পাঁচেক আগে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায়, যে সব মহিলা থ্যালিডোমাইড নামের একটি ঘুমের ওষুধ খেতেন, তারা হাত-পা বিহীন পঙ্গু শিশুর জন্ম দেন। এই গা হিমকরা দুর্ঘটনা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ক্রোমোজোম নষ্ট হয়ে গেলে শুধু আসক্তেরাই নয় সম্পূর্ণ বংশের ক্ষতি হতে পারে। এর পরে LSD ও ক্রোমোজোমের উপর তার কুপ্রভাব জানতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কিন্তু এখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো

যায় নি। অনেকে মনে করেন যে গর্ভপাত, সন্তানের অঙ্গবিকৃতি, ক্যানসার ইত্যাদি রোগে LSD-র প্রভাব আছে। অবশ্য এই ধারণার স্বপক্ষে এখনো পর্যন্ত কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

LSD-র কার্যপ্রক্রিয়া

মানুষের মস্তিষ্কে সেরোটোনিন নামের একটি বিশেষ রাসায়নিক থাকে যা দুটি স্নায়ুর মাঝখানে দূতের ভূমিকা পালন করে। স্নায়ুগুলি কাটা কাটা তারের মত সাজানো থাকে। দুটি স্নায়ুর মাঝে খুব ছোট্ট ছোট্ট ফাঁক থাকে যাকে সাইন্যাপ্স বলে। সেরোটোনিনের মত কয়েকটি রাসায়নিক না থাকলে একটি স্নায়ু থেকে আরেকটি স্নায়ু পর্যন্ত বিদ্যুত-সদৃশ স্নায়বিক স্পন্দন কখনই পৌঁছতে পারত না। স্নায়ুর স্পন্দন একটি নার্ভের প্রান্তে পৌঁছালে, সাইন্যাপ্সের ফাঁকে সেরোটোনিন অণুর উদয় হয়। এই অণুগুলি পরবর্তী স্নায়ুর দিকে ছুটে যায় আর কিছু বিশেষ গ্রাহক কোষের সাথে যুক্ত হয়। (চিত্র দ্রষ্টব্য)

LSD-র সাথে সেরোটোনিনের রাসায়নিক সাদৃশ্য আছে। তাই এটি সেরিটোনিনের বদলে নিজে গ্রাহক কোষে গিয়ে জোড়া লেগে যায়। এর ফলে মস্তিষ্কে স্নায়বিক স্পন্দন থেমে যায়। তাই মস্তিষ্কের কাজ ব্যাহত হয় অথবা সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। LSD এই সুযোগে নানা উপসর্গ প্রকাশ করতে থাকে। সেরোটোনিনের ক্রিয়া নষ্ট করতে পারে এমন রাসায়নিকের সাথে LSD প্রয়োগ করলে ফল আরো মারাত্মক আর দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু সেরোটোনিন উৎপাদক রাসায়নিকের সাথে LSD দিলে মস্তিষ্কে LSD-র প্রভাব খুব ক্ষীণ হয়। এই পরীক্ষাগুলি প্রমাণ করে যে মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের বনাম LSD-র একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়।

সাত

পি সি পি ঃ দেবদূতের পদধূলি

পি সি পি বা ফেন্‌সাইক্লিডিন হঠাৎ মাদক দ্রব্যের জগতে সাড়া জাগিয়েছে। এটি পশুচিকিৎসায় চেতনানাশক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। পি সি পি নামটি আসলে রাসায়নিক যৌগ ফেনসাইক্লোহেক্সিলপিপারিডিনের সংক্ষিপ্ত রূপ। তাছাড়া ড্রাগটির কাল্পনিক মজাদার নাম 'পিস পিল'ও (শান্তির ওষুধ), এই বিশাল নামের সংক্ষিপ্ত বাজার-চলতি সংস্করণ। এই ড্রাগটির আরো অনেকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম আছে যেমন 'দেবদূতের পদধূলি' 'সুগন্ধি মলম', 'গেরিলাদের বিস্কুট' 'জাদু-কুয়াশা' আর 'রকেটের জ্বালানি'। এটির আবিষ্কার হয় 1926 সালে। কিন্তু এর চেতনা-নাশক গুণটি উদ্‌ঘাটিত হয় 1957 সালে। 1958 সালে এটি পরীক্ষামূলকভাবে সাধারণ চেতনানাশক হিসাবে মানুষের উপর প্রয়োগ করার জন্য বাজারে ছাড়া হয়। মাদকটি বাঁদরের উপর প্রয়োগ করার পর জন্তুগুলিকে অস্বাভাবিক রকম শান্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। তাই এই ড্রাগটির নির্মাতা পার্ক-ডেভিস কোম্পানি এটির ব্যবসায়িক নাম দেন সেরনিল (ইংরাজিতে সেরিনিটি শব্দের অর্থ শান্তি)। অধিকাংশ চেতনানাশক ওষুধ শ্বাস-প্রশ্বাসের অবদমন ঘটায় আর তাই একজন অ্যানাস্থেসিস্টকে (চেতনানাশকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার) কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হয়। সেরনিল শ্বাস-প্রশ্বাসকে চাপা দেয় না বলে প্রথম দিকে এটি চেতনানাশকের কাজে আকছার ব্যবহৃত হত। কিন্তু 1956 সালে ড্রাগটির ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায় আর ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে ছিল অস্বস্তিকর অনুভূতি, প্রলাপ বকা, শরীরে প্রবল আলোড়ন, অলীক অনুভূতি এবং সময় ও স্থানের ধারণা হারানো। প্রতি পাঁচজন রোগীর মধ্যে অন্তত একজন এই সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হত আর এসব চলত প্রায় 18 ঘণ্টা। সেরনিলের প্রতিক্রিয়াটি অনেকটা মানসিক রোগের লক্ষণের মত মনে হয়েছিল। তাই এটিকে মনস্তাত্ত্বিকরা আদর্শ মনোবিকার উৎপাদক হিসাবে ধরে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন।

1967 সালে, ফেনসাইক্লিডিনকে সেরনাইলেন নামে বাজারে ছাড়া হয়—

পশুচিকিৎসার চেতনানাশক হিসাবে। একই সময়ে সানফ্রান্সিসকোর রাস্তায়-রাস্তায় এই ড্রাগটির উদয় হয়। এখানেই এটি নতুন 'পিস পিল' নামটি পায়। পি সি পি হেরোইনের মত ইঞ্জেকশন না করে এমনি খাওয়া হত। কিন্তু পি সি পি-র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলির কোন আন্দাজ পাওয়া যেত না। তাছাড়া ঘন-ঘন অতিরিক্ত মাত্রায় পি সি পি নেওয়া হত বলে এক বছরও সানফ্রান্সিসকোয় এই নেশা চলে নি। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মার্কিন দেশের পূর্ব উপকূলে 'হগ' নামে এটির প্রচলন হয়। কিন্তু এও খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

1970 সালের প্রথম দিকে এই ড্রাগের আবার প্রচলন হয় — এবার লোক ঠকানোর হাতিয়ার হিসাবে। বেআইনি গবেষণাগারে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনায়াসে এই ড্রাগ তৈরী করা যেত। ড্রাগের কারবারীরা টি এইচ সি, মেস্কালিন সিলোসাইবিন, এল এস ডি, অ্যাম্ফিটামাইন আর কোকেন বলে নেশাখোরদের দিব্যি পি সি পি গছিয়ে দিত। দেখা গেছিল যে মাত্র শতকরা তিরিশভাগ পি সি পি তার স্বনামে বিক্রি হয়। টি এইচ সি যেহেতু সহজে মেলে না, কারবারীরা বেশিরভাগ সময়ে এই দুর্মূল্য ড্রাগের বদলে পি সি পি বেচত।

1970 সালের মাঝামাঝি পি সি পি-র নেশা মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছিল। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছিল যে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই অন্ততপক্ষে সত্তর লক্ষ লোক মাঝে-মাঝে আর দশ লক্ষ লোক নিয়মিতভাবে (সপ্তাহে অন্তত এক দিন করে) পি সি পি সেবন করে। পি সি পি অচিরেই একটি জনপ্রিয় মাদকে পরিণত হয়। বিশেষ করে বছর চোদ্দ বয়সের ছেলেমেয়েরা এটির নেশার কবলে পড়ে। এখন দেখা যাচ্ছে পি সি পি-র নেশার প্রকোপ বেশ কিছুটা কমেছে।

পি সি পি বস্তুটা কি?

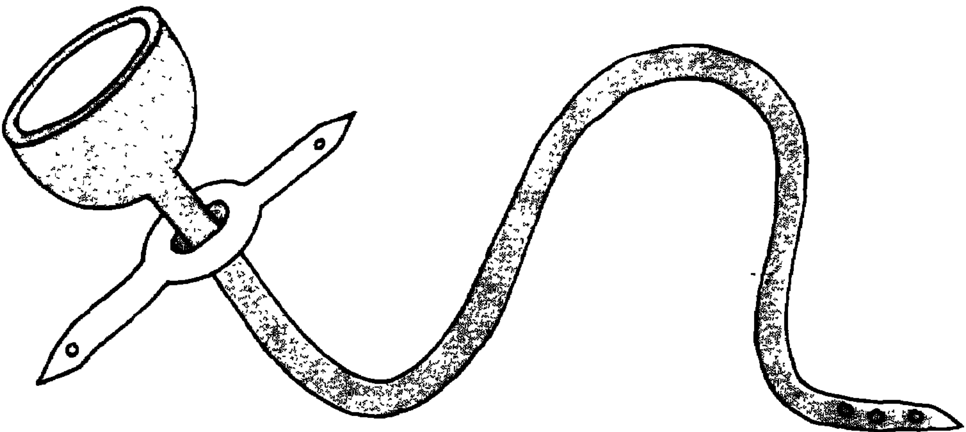
পি সি পি একটি সাদা কেলাসাকার কঠিন পদার্থ যা জল ও অ্যালকোহল উভয়েই দ্রবীভূত হতে পারে। বাজারে 'দেবদূতের পদধূলি' নামে যে পি সি পি পাওয়া যায় তা একটি হাইড্রোক্লোরাইড় যৌগ। এটি খেলে আসক্ত অলীক স্বর্গে পাড়ি দেয় বলে, নেশাড়ুদের ধারণা আছে যে দেবদূতরাও এই মাদক সেবন করে। এই কিম্ভূত ধারণা থেকেই এহেন নামকরণ।

ধূমপানের পর নেশাখোর 2-5 মিনিটের মধ্যে নেশা চড়িয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু খেলে পর 30-60 মিনিট লাগে নেশা চড়তে। ধূমপান করলে 15 থেকে 30 মিনিটে নেশা তুঙ্গে উঠে যায়। এর পর চার থেকে ছয় ঘণ্টা নেশা থাকে আর নামতে 24 থেকে 48 ঘণ্টা সময় লাগে।

পি সি পি-র রক্তবাহ ছেড়ে শরীরে কোষদলে প্রবেশ করার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেভাবেই পি সি পি-র নেশা করা হোক না কেন, দেখা যায়

মস্তিষ্কে জমা পি সি-পি-র পরিমাণ রক্তবাহের তুলনায় অন্তত দশগুণ বেশি। মেদকোষে তো এই পরিমাণ প্রায় 100 গুণ বেশি। এজন্যই রক্তবাহে পি সি পি-র অনুপস্থিতি সত্ত্বেও অনেকসময় নেশা নামতে চায় না। আসলে কোষদলে প্রবেশ করে বলেই পি সি পি-র উপস্থিতি ডাক্তাররা রক্ত-পরীক্ষায় ধরতে পারেন না অথচ নেশাও হয় দীর্ঘস্থায়ী।

ধূমপান অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে (নস্যির মত) পিসিপি টানলে প্রচুর পরিমাণে এই মাদক পাকস্থলীতে ক্ষরিত হতে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলী খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ করে। কিন্তু দেহের এই অঙ্গেই পিসিপি ক্ষরিত হতে থাকে। ওদিকে ক্ষুদ্রান্তে আবার পিসিপি-র শোষণ ঘটে। এখান থেকে এটি রক্ত ও তারপর কোষদলে গিয়ে হাজির হয়। রক্তে পৌঁছনোর পর কিন্তু পিসিপি প্রথমে পাকস্থলীতে ক্ষরিত হয় আর তারপর ক্ষুদ্রান্ত্রে পুনঃশোষিত হয়। এইভাবে ক্রমাগত ভাবে পিসিপি চক্রাকারে দেহের মধ্যে ঘুরতে থাকে। একেকবার পাকস্থলীতে পিসিপি-র ঘনত্ব রক্তবাহের চেয়েও পঞ্চাশ গুণ বেশি হয়ে যায়। তাই ধূমপানের মাধ্যমে পিসিপি-র নেশা করা সত্ত্বেও, ডাক্তাররা নেশা ছাড়ানোর জন্য, অনেক সময় পাকস্থলীতে নল প্রবেশ করিয়ে থাকেন। এই নলের সাহায্যে আসক্ত ব্যক্তির পেট থেকে পিসিপি ধুয়ে বের করা হয়। এই নলের আকৃতিটা দেখলে অবাক লাগতে পারে কিন্তু পাকস্থলীতে পিসিপি-র চক্রাকার আবর্তনের ব্যাপারটা জানা থাকলে আর একটুও আশ্চর্য হবেন না।



চিত্র 64 : পেটের নল।

পিসিপি-র প্রভাব

পিসিপি মানুষের মনস্তত্ত্বকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। একটি সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি নেশার ঘোরে বেখাপ্পা আর অদ্ভুত ঠেকে। মনে হতে পারে যে মানুষটির হাত বা পা যেন অতিকায় হয়ে উঠেছে অথবা নেশাসক্তের নিজের মাথাটাই বুঝিবা ঝুলে পড়ে তার নিজের দেহের দিকে চেয়ে প্রবল হাসিতে ফেটে পড়েছে। সারা দেহ অসাড় হয়ে যেতে পারে। আসক্ত ব্যক্তির চালচলন পাল্টে যায় আর তার স্মৃতিভ্রংশও ঘটতে পারে। সে তার দেহের অস্তিত্বটাই বেমালুম ভুলে বসে আর তার ব্যথা-বেদনার অনুভূতি হারিয়ে যায়। ফলে তার দুর্ঘটনার কবলে পড়ার সুযোগ বেড়ে যায়। সে নিজেকে শয়তান, পশু-এমনকি স্বয়ং ঈশ্বরও ভেবে বসে। দুশ্চিন্তা আর চরম হিংস্রতাও তাকে গ্রাস করতে পারে। কোন কোন নেশাখোর তো সব জামাকাপড় খুলে একেবারে বিবস্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়ায়। নেশার চরম অবস্থায় নিজেকে অজেয় আর অমর মনে হতে পারে। মাদকটির যন্ত্রণা নিবারক গুণটি এই ভিত্তিহীন ধারণার মূলে থাকে। উন্মত্ত নেশাখোরদের হাতকড়া পরালে তারা হাতকড়া ছিঁড়ে ফেলে পুলিশকে আক্রমণ করতেও পিছপা হয় না। এমন নেশাখোরও দেখা গেছে, যে রেললাইনে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে চলন্ত ইঞ্জিনকে থামিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে, ভাল্লুকের গুহায় বীরদর্পে ঢুকে পড়েছে কিংবা উঁচু জানালা বা পাহাড়ের চুড়ো থেকে লাফিয়ে পড়তে চেয়েছে। এই কিম্ভূত ব্যবহার মাঝে-মাঝে হিংস্রতার সব সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। একবার তো এক আসক্ত সাঁড়াশি দিয়ে তার নিজের একপাটি সামনের দাঁত উপড়ে ফেলেছিল। আর একজন মহিলা নিজের কোলের সন্তানকে রান্নার কড়াইয়ে তেল দিয়ে ভেজে ফেলেছিল! এছাড়া বন্ধু-বান্ধব বা সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির উপর নিরস্ত্র বা সশস্ত্র হামলার কথা প্রায়ই শোনা যায়। যেসব আসক্তরা এমন হিংস্র আচরণ করেন তারা আদতে কিন্তু শান্ত শিষ্ট আর গোবেচারা মানুষ।

পিসিপি আসক্তির আরেকটি চরম নিদর্শন হল চোখের মণির কাঁপুনি। চিকিৎসাবিদ্যায় একে নিস্টাগমাস বলে। রোগীর নিস্টাগমাস হয়েছে কিনা জানবার জন্য ডাক্তার তাকে দূরের কোন বস্তুর দিকে (ধরুন একটা ছবি) নিশ্চলভাবে চেয়ে থাকতে বলেন আর খুব মনোযোগ সহকারে ব্যক্তির চোখের কালো অংশটাকে খুঁটিয়ে দেখেন। নিস্টাগমাস হলে মণিটা ওপর-নীচ বা পাশাপাশি কাঁপতে থাকে।

নেশার ফলে খিঁচুনিও দেখা দিতে পারে। তাছাড়া অঙ্গসঞ্চালনে পুনরাবৃত্তি, টলে টলে পা ফেলা আর মুখবিকৃতিও দেখা যায়। আসক্ত কোমায় চলে যেতে পারে আর শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে পারে। এছাড়া চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠা, প্রচুর ঘাম হওয়া, বমি, পেচ্ছাপ আটকে যাওয়া, মুখ দিয়ে লালা ঝরা, দেহের তাপমাত্রা, নাড়ীর গতিও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি ও উল্লেখযোগ্য উপসর্গ।

পিসিপি মায়ের গর্ভের আচ্ছাদনকে ভেদ করতে পারে। অর্থাৎ গর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় কোন নারী পিসিপি খেলে তা গর্ভের মোটা আবরণকে ভেদ করে ভ্রূণে প্রবেশ করে। এমনিতে সন্তান ও মায়ের মাঝখানের এই আবরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকেই ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়। কিন্তু ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও পিসিপি বলপূর্বক এই বাধা অতিক্রম করতে পারে। এর ফল হয় মারাত্মক। নবজাতক, মায়ের পেটেই নিস্টাগমাস, খিঁচুনি, অবস্থান পরিবর্তন, কাঁপুনি আর পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়। সন্তানধারণের প্রথম দিকে পিসিপি-র নেশা করলে নারী বিকলাঙ্গ অথবা মৃত শিশু প্রসব করতে পারে।

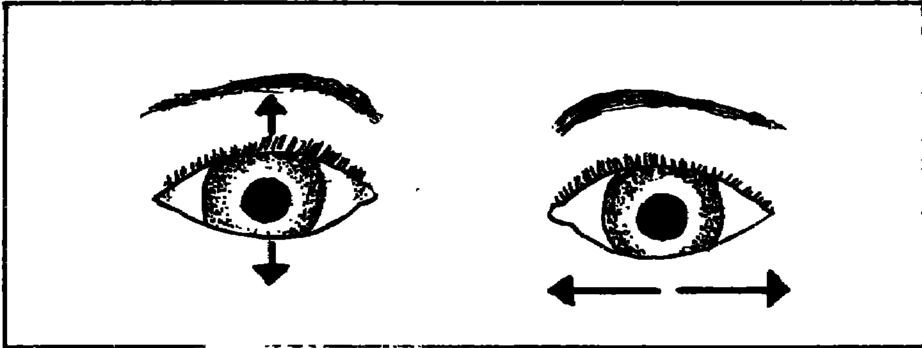
আরোগ্য লাভ

ছোটখাটো উপসর্গ দেখা দিলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আরোগ্যলাভ ঘটতে পারে। অবশ্য হতাশাভাব বা বিরক্তি আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোন কোন রুগী চার থেকে ছয় সপ্তাহ পাগলামির অবস্থায় থাকে। সাধারণ পাগলামোর (যাকে সিজোফ্রিনিক সাইকোসিস বলে) চিকিৎসায় ওষুধ যেভাবে কাজ করে, এক্ষেত্রে কিন্তু তা কার্যকরী হয় না। দীর্ঘ ফেনসাইক্লিডিন উদ্ভূত মানসিক বিকার কিন্তু একসময়ে সিজোফ্রিনিয়া হয়ে দাঁড়াতে পারে। দীর্ঘ ফেনসাইক্লিডিনের নেশার কবল থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়া শতকরা প্রায় পঁচিশ শতাংশ রোগী কঠিন মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে আবার ডাক্তারের কাছে ফিরে আসে। এই মনোবিকার অনেকটা সিজোফ্রিনিয়ার মত হয়। এই মনোবিকার খুব সহজে ওষুধ প্রয়োগ করলেও সারে না কিন্তু ফেনসাইক্লিডিন প্রভাবিত মনোবিকারের চেয়ে এটি অপেক্ষাকৃত কম ভয়ঙ্কর। ধীরে হলেও ওষুধ এই রোগে খানিকটা কাজে দেয়। এই রোগীরা সিজোফ্রিনিয়া আক্রান্ত রোগীর মতই আচরণ করে।

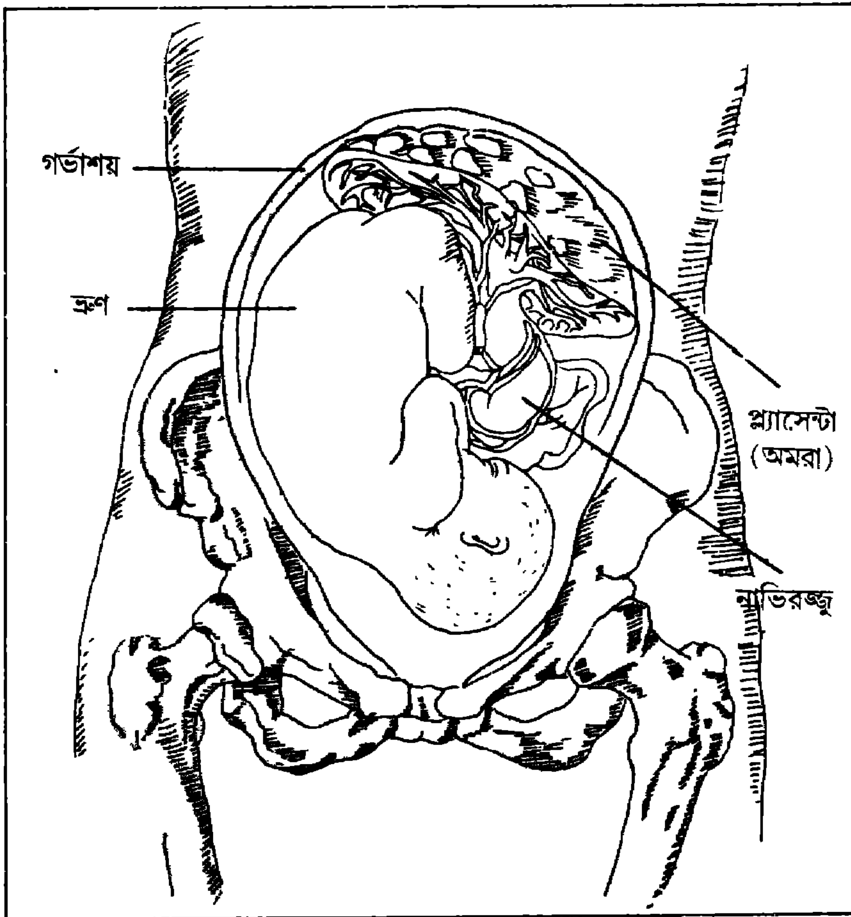
ফেনসাইক্লিডিন প্রভাবিত মনোবিকার সেরে যাওয়ার পরেও অনেক রোগীর মন থেকে হতাশা কাটে না। এই হতাশা কাটানোর জন্য অনেকে ফের নেশার করাল গ্রাসে পড়ে যায়।

দেহে পিসিপি-র কার্য প্রক্রিয়া

পিসিপি ও তার সমগোত্রীয় মাদকগুলি স্নায়ুতন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আবদ্ধ হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মরফিন ও তার সমগোত্রীয় মাদকও একইভাবে ক্রিয়া করতে পারে। মরফিন ও তার যৌগগুলি গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রে কিভাবে আবদ্ধ হয় তা আগেই বলেছি। এই গ্রাহক কেন্দ্রগুলি উত্তেজিত হলে অস্বস্তি (ডিস্‌ফোরিয়া) আর হ্যালুসিনেশন দেখা দিতে পারে। পিসিপি গ্রাহক কেন্দ্রে আরো দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। এই ধর্মের ভিত্তিতে পিসিপি-র ক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।



চিত্র 65 : নিস্টাগমাস।

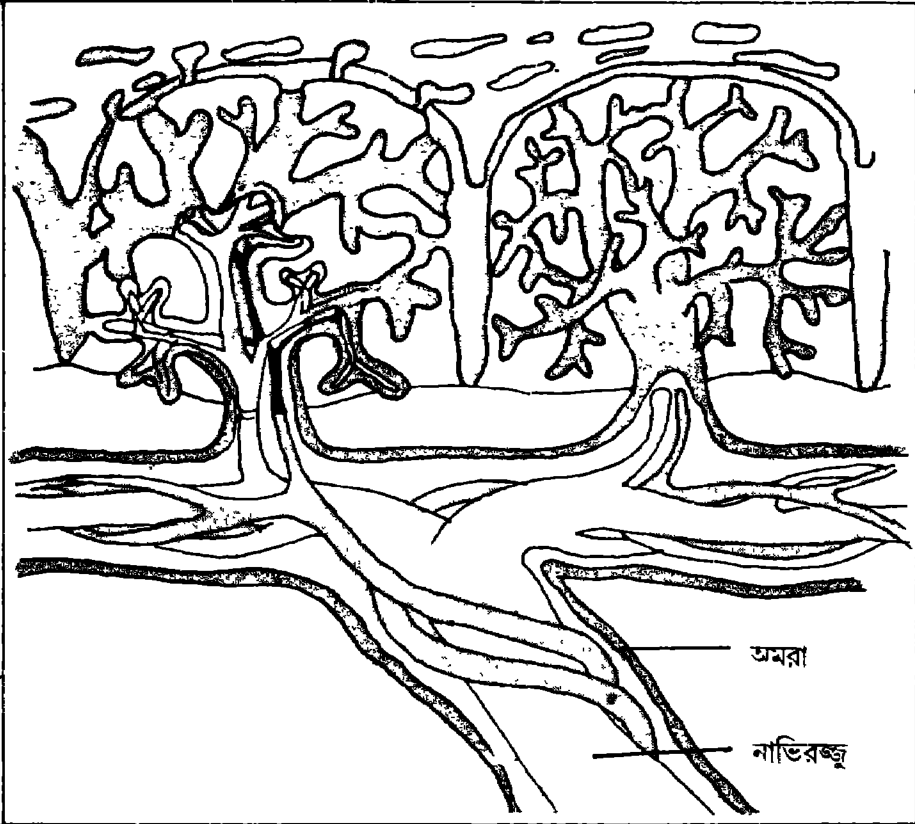


চিত্র 66 : মায়ের রক্ত থেকে গর্ভস্থ শিশুর কাছে PCP চুঁয়ে চুঁয়ে পৌঁছে যায়।

পিসিপি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে ডোপামিনের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। আমরা দেখেছি যে কোকেনও ঠিক এইভাবেই কাজ করে। পিসিপি আরেকটি নিউরোট্রান্সমিটর (স্নায়ুদূত)—নরত্রপিনেফ্রিনেরও ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। এই বিদ্‌ঘুটে নামের রাসায়নিকটিও স্নায়ুতন্ত্রে বার্তাবহ পায়রার মত কাজ করে। এই দুটি স্নায়ুদূতের মাত্রাবৃদ্ধি পিসিপি-র অন্যান্য প্রতিক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

এছাড়া আরো অনেকগুলি জটিল প্রক্রিয়া আছে বলে মনে হয়। পিসিপি কোষ পর্দার মধ্যে ক্যালসিয়ম আয়নের চলাচলকে ব্যাহত করে। এই আচরণটির সাথে নেশার নানা উপসর্গের সম্পর্ক এখনো স্পষ্ট হয় নি।

নানা গবেষণা পিসিপি-র কার্যপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছে। এই তথ্যগুলি কি, তা বোঝানোর আগে স্নায়ুকোষের ধর্মগুলি আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। স্নায়ুকোষগুলি ইস্‌কিমিয়া রোগের (এই রোগে অক্সিজেনের অভাব দেখা যায়) প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়। কোষদলে তখনই



চিত্র 67 : অমরার মাধ্যমে যার থেকে শিশুকে মাদক পৌছায়।

রক্তাভাব দেখা যায় যখন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনার ফলে রক্ত কমে যায় অথবা তার চলাচল ব্যাহত হয়। ইস্‌কিমিয়া হলে স্নায়ুকোষগুলি খুব তাড়াতাড়ি মারা পড়ে। স্নায়ুকোষগুলি যথেষ্ট অক্সিজেন না পেলে তিন মিনিটের বেশি বাঁচে না। দেখা গেছে পিসিপি তার সমগোত্রীয় যৌগগুলি অক্সিজেনের অভাব সত্ত্বেও স্নায়ুকোষগুলির মৃত্যুর হার কমিয়ে দেয়। এই ক্রিয়াটির থেকেই যে নানা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে তা নিশ্চিত হয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে স্ট্রোকের মত কয়েকটি রোগের চিকিৎসায় পিসিপি ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধে পরিণত হতে পারে।

বাজারের পিসিপি

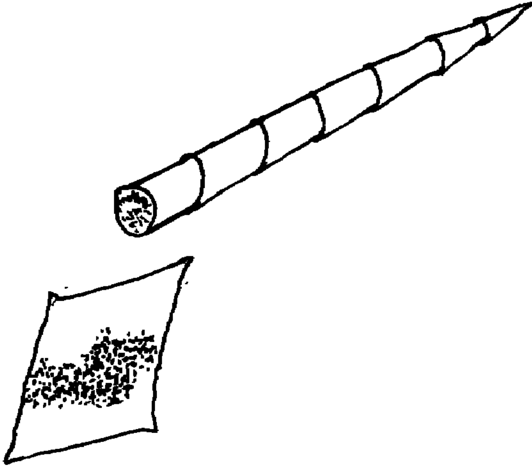
সাধারণ পিসিপি গুঁড়ো, ট্যাবলেট, মিশ্রণ তরল কিংবা ½ গ্রাম ওজনের 'প্রস্তরীভূত' কেলাসাকারে পাওয়া যায়। 'দেবদূতের পদধূলি' নামে প্রচলিত পিসিপি-র গুঁড়ো প্রায় 88-100 শতাংশ খাঁটি হয়। কেলাসাকার পিসিপিতে শতকরা 50 থেকে 100 ভাগ খাঁটি মাদক থাকে। কিন্তু অন্যান্য আর যেসব নামে পিসিপি বিক্রি হয় তাতে খাঁটি মাদক দ্রব্যটি কমতে কমতে শতকরা 10 থেকে 30 ভাগ হয়ে যায়। ট্যাবলেট আকারের পিসিপিতে ওষুধের মাত্রা 1 থেকে 6 মিলিগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত 5 মিলিগ্রামের ট্যাবলেটই পাওয়া যায়। পার্সলি, মিন্ট (পুদিনা) বা ওরিগানোর মত সুগন্ধী পাতার মিশ্রণে পিসিপি মিশিয়ে পাকিয়ে-পাকিয়ে জয়েন্ট (ক্রিস্টাল জয়েন্ট বা 'কে জে') তৈরী করা যায়। এই জয়েন্টের ওজন 100 থেকে 400 মিলিগ্রাম হয়। গড়ে 150 মিলিগ্রাম পাতার মিশ্রণে 1 মিলিগ্রাম পিসিপি থাকে। এই জয়েন্টগুলিতে পিসিপি-র মাত্রা 0·25 থেকে 8 শতাংশ হয় আর ঘোর নেশাখোরেরা এই জয়েন্টে 50 মিলিগ্রামের মত পিসিপির গুঁড়ো মিশিয়ে নেশা চড়ায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দীর্ঘকালীন আসক্তরা কি পরিমাণ সহ্যক্ষমতা গড়ে তোলে। মারিজুয়ানার জয়েন্টে মিশিয়ে খাওয়ার মাদক হিসাবেই পিসিপি-র খ্যাতি (তাই একে 'অসাধারণ ঘাস' বা 'সুপার গ্রাস' বলা হয়) আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাজারে মারিজুয়ানা-মিশ্রিত পিসিপি প্রায় বিক্রি হয় না বললেই চলে। আরেকটি বিচিত্র নেশার পদ্ধতিতে মেন্থলযুক্ত সিগারেট পিসিপি-র তরলে চুবিয়ে 'সুপার কুল' সিগারেট তৈরী করে। তার ধূমপান করা হয়।

পিসিপি-র জাতভাই

পিসিপি-র তিরিশটারও বেশি রাসায়নিক জাতভাই আছে। এগুলির সাথে পিসিপি-র অদ্ভুত রাসায়নিক সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। এদের রাসায়নিক গঠন ও প্রভাব অনেকটা পিসিপি-র মতই। যে পাঁচটি রাসায়নিক বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হচ্ছে কিটামাইন,

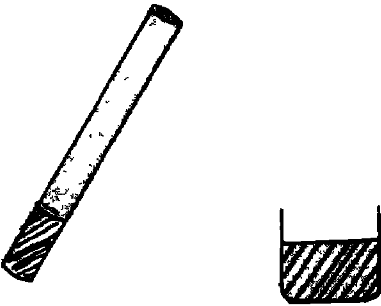
পি এইচ পি, পি সি সি, টি সি পি, এবং পি সি ই।

পিসিপি-র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিটামাইন যৌগটি চেতনানাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি আইনত প্রস্তুত করা পিসিপি-র একমাত্র অনুরূপ যৌগ। বাজারের কিটামাইন হাইড্রোক্লোরাইড ক্যাপসুলাকারে 'গ্রিন' নামে বিক্রি হয়। এটি পিসিপি-র তুলনায় কম ক্ষতিকর।



চিত্র 68 : পিসিপি জয়েন্ট্স।

পি এইচ পি মাদকটি পিসিপি-র মতই শক্তিশালী এবং খুব সস্তায় তৈরী করা যায়। কিন্তু এটির ব্যবহার আসক্তদের মধ্যে বেড়ে গেছে কারণ পেচ্ছাপ পরীক্ষা করে এই ড্রাগের উপস্থিতি ধরা যায় না। ফলে নেশাসক্তেরা সহজেই আইনগত ও চিকিৎসাগত পরীক্ষাগুলিকে ফাঁকি দিতে পারে।



চিত্র 69 : তরল পিসিপি।

পিসিসি একটি অস্থায়ী যৌগ। পিপারিডিন যৌগের প্রভাবে এটি ভেঙে যায়। তাই পিপারিডিনের সাথে বিক্রিয়া করালে এই যৌগ থেকে আঁশটে গন্ধ বেরোয়। তাপ দিলে (বা ধূমপানের সময়) পিসিসি থেকে হাইড্রোজেন সায়ানাইড নামের একটি মারাত্মক রাসায়নিক নির্গত হয় আর তার ফলে অনেক সময় আসক্তরা সায়ানাইডের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

বাজারে সর্বপ্রথম টিসিপি-র উদয় হয় 1972 সালে। এটির প্রভাব অনেকটা পিসিপি-র মতই তবে এর ক্রিয়া অনেক জোরালো আর ক্ষণস্থায়ী হয়।

ষাটের দশকের শেষের দিকে ভেজা-ভেজা হলুদ বাদামী রঙের পিসিই নামের মাদক দ্রব্যের প্রচলন হয়। 1971 সালে সাদা গুঁড়ো-গুঁড়ো পিসিই বাজারে আসে। এটি পিসিপি-র মতই দেখতে কিন্তু অনেক বেশি সক্রিয়। এখনো এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাদক দ্রব্য।

আট

রকমারি হ্যালুসিনোজেন

LSD আর PCP ছাড়াও আসক্তরা আরো অনেকরকমের হ্যালুসিনোজেন সেবন করে। এর মধ্যে কয়েকটি আবার প্রাকৃতিকভাবে নানা ভেষজ থেকে পাওয়া যায়। এগুলির ইতিহাসও বেশ জমকালো। এখানে কয়েকটির বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

মর্নিং গ্লোরি বীজ

দক্ষিণ মেক্সিকো অঞ্চলে ওক্সাকায় ফ্যাকাশে মর্নিং গ্লোরির মত দেখতে একটি লতানে উদ্ভিদ দেখা যায়। এই উদ্ভিদটির সঙ্গে মর্নিং গ্লোরির একটা সম্পর্কও আছে। কিন্তু এটির কাণ্ডটি কাষ্ঠাল হয় আর ক্যাকটাসের ঝোপ বা পুরানো দেওয়াল বেয়ে এটি উঠতে পারে। এটি তার আত্মীয় মর্নিং গ্লোরির চেয়ে অনেক বেশি দিন বাঁচে। উদ্ভিদবিদ্‌রা একে টার্বিনা কোরিম্বোসা (আগেকার নাম রিভিয়া কোরিম্বোসা) নামে ডাকে।

মর্নিং গ্লোরির মত এটিরও হৃদ্‌পিণ্ডের আকৃতির ছুঁচালো পাতা থাকে কিন্তু সাদা ফানেল বা কুপির আকারের ফুলগুলি তিন সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা হয় না। এর শাঁসালো ফলটি কোন কাজে লাগে না কিন্তু এতে একটিমাত্র কালো মুসুর ডালের মতো বীজ থাকে। এই বীজ থেকে লাইসারজিক অ্যাসিড অ্যামিড আর আইসো লাইসারজিক অ্যাসিড অ্যামিড থাকে। আবহমান কাল থেকে মেক্সিকোর পুরোহিতরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই বীজ খেয়ে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। এই উদ্ভিদের স্থানীয় নাম ওলোলিউকুই। মেক্সিকোর প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ঝরনা, নদী, পাহাড় সবকিছুরই আলাদা আলাদা দেবতা আছে। এই ওলোলিউকুইয়ের সম্বন্ধে মানুষ এতটাই পবিত্র ধারণা পোষণ করে যে এই উদ্ভিদটিরও একটি পৃথক দেবতা আছে। ঐশ্বরীয় কাজকর্মে যে শুধু এটি লাগে তা নয়, এটির স্থানীয় বাসিন্দারা মাদক দ্রব্য হিসাবেও ব্যবহার করে থাকে। কোন কোন

স্থানীয় চিকিৎসাকরা এটিকে ওষুধ হিসাবেও প্রয়োগ করে। মর্নিং গ্লোরির প্রজাতির আরেকটি বীজও ঠিক একই প্রভাব ফেলে। এর বিজ্ঞানভিত্তিক নাম আইপোমিয়া ভায়োলেসি আর স্থানীয় নাম বাড়ো নিগ্রো। দক্ষিণ মেক্সিকোর ওক্সাকা অঞ্চলের বাসিন্দা জ্যাপোটেক উপজাতির মানুষদের মধ্যে এটি খুবই জনপ্রিয়।

এই দুটি উদ্ভিদের বীজে একই ধরনের রাসায়নিক থাকে কিন্তু টার্বিনা কোরিম্বোসায় উপক্ষার থাকে 0·012 শতাংশ আর ইপোমিয়া ভায়োলেসিতে থাকে 0·06 শতাংশ। তাই উপজাতিরা দ্বিতীয় উদ্ভিদের বীজগুলি তাদের আচার অনুষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার করে। বীজগুলিকে প্রথমে গুঁড়িয়ে ঠাণ্ডা জলে ভেজানো হয়। এবার দ্রবণটিকে কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়ে তরলটিকে পান করা হয়। এর নেশার ফলে উৎপন্ন লক্ষণগুলির সাথে LSD নেশার লক্ষণগুলির মিল আছে। তরলটি রাতের দিকে একা একা বসে পান করা হয়।

LSD-র আবিষ্কর্তা হফম্যান সাহেব 1960 সাল নাগাদ সর্বপ্রথম LSD-র মূল কার্যপ্রক্রিয়াটির বর্ণনা দেন। মার্কিন দেশে বেআইনিভাবে দোকানে বিক্রি হয় এই মাদক। ভারতেও কিছু কিছু চোরাচালান হয়।

হ্যালুসিনেশন উৎপন্নকারী ক্যাকটাস

শুনলে অবাক হবেন যে এমন কিছু ক্যাকটাস আছে যেগুলি হ্যালুসিনেশন বা ভ্রম সৃষ্টি করতে পারে। এমন একটি ক্যাকটাসের নাম পিয়োট যার বিজ্ঞানভিত্তিক নাম লোফোফোরা উইলিয়ামসি। উত্তর মেক্সিকো আর দক্ষিণ টেক্সাসের মরুভূমিপ্রায় অঞ্চলে ছোট্ট-ছোট্ট এই ক্যাকটাস দেখা যায়। এই ক্যাকটাসের মোট দৈর্ঘ্যের আট ভাগের সাত ভাগ মাটিতে পোঁতা থাকে। ক্যাকটাসটির নরম চ্যাপটা গোলাকার অংশটিতে একটিও কাঁটা থাকে না। এর পেলব ছাই ছাই সবুজ গায়ে ছোট ছোট সাদা রঙের রোম থাকে। ক্যাকটাসের 'মাথাটা' অদ্ভুতভাবে শালগম আকৃতির মূলের উপর বসানো থাকে। ক্যাকটাসের প্রধান অংশ তার গলা—যেখান থেকে মূলটি কাণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। থালার মত কাণ্ডে কিছু বোতাম আকৃতির উঁচু অংশ থাকে যাকে বলে মেস্কাল বোতাম। এই বোতামগুলিকে কেটে ফেলে কাণ্ডটিকে শুকোতে দেওয়া হয়। এই বোতামে প্রায় গোটা তিরিশ এমন সব উপক্ষার থাকে যা মানুষের মনস্তত্ত্বে প্রচার ফেলতে পারে। অবশ্য মেস্কালিন নামক উপক্ষারটিই সর্বাপেক্ষা সক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ। মেস্কাল বোতামগুলির মোট উপক্ষারের প্রায় তিরিশ শতাংশ ভাগ মেস্কালিন থাকে। আসক্ত ব্যক্তি প্রতিদিন প্রায় একাধাক্কায় গোটা তিরিশ বোতাম সাবাড় করে দিতে পারে। বোতামগুলি চিবিয়ে খাওয়া হয় আর এর স্বাদ খুব বিশ্রী, তেতো, বালি বালি হয় আর খেলে পর বমি-বমি ভাব আসে। এইজন্য মদ, গরম কোকো, কমলালেবুর রস কিংবা অন্য কোন সুগন্ধী

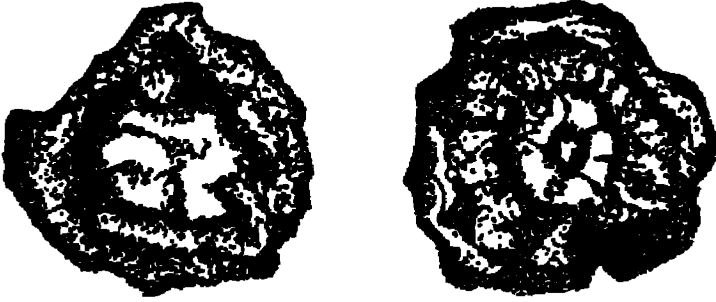


চিত্র 70 : পিয়োট ক্যাকটাস।

পানীয়তে মিশিয়ে এই বোতামগুলির জঘন্য স্বাদকে চাপা দেওয়া হয়। ফলে মদ খেলে নেশা একটু বেশি চড়ে। জার্মানরা এই ক্যাকটাসকে স্ন্যাপ্সকফ বা 'ব্র্যান্ডির মাথা' বলে ডাকে।

মর্নিং গ্লোরি বীজের মতই পিয়োটও উপজাতিদের নানা আচার অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই নেশা হলে চোখের সামনে নানা উজ্জ্বল রঙের দৃশ্য ভেসে ওঠে আর ক্রমাগতভাবে বদলে গিয়ে নতুন-নতুন নকশার উদয় হয়—ঠিক যেন ক্যালাইডোস্কোপের ছবি। এই দৃষ্টিভ্রম একটি জ্যামিতিক ক্রম অনুসরণ করে পাল্টে যেতে থাকে। প্রথমে পরিচিত দৃশ্য আর মুখ আসে আর তারপর কোন বিচিত্র দৃশ্য আর অপরিচিত মুখ ভেসে ওঠে। আরো নানাধরনের ভ্রম, যেমন ধ্বনিভ্রমও, ঘটতে পারে। আসক্ত-ব্যক্তি এমন অনেক শব্দ শুনতে পারে যার কোন অস্তিত্বই নেই। এই প্রভাব নেশা উবে যাওয়ার দু তিন দিন আগে পর্যন্ত থাকে। অদ্ভুত দৃষ্টিভ্রমের ফলে নেশাখোর ভাবতে থাকে সে বুঝি কোন আধ্যাত্মিক জগতে গিয়ে পৌঁছেছে যেখান থেকে অসুস্থতা ও মৃত্যু আসে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে উপজাতিদের ওঝা নানা রোগ নির্ণয় করে আর তার ওষুধও বাতলে দেয়। অবশ্য পশ্চিমী চিকিৎসাশাস্ত্রেও পিয়োটের গুরুত্ব আছে কারণ এর কিছু জীবানুনাশক ধর্ম জানা গেছে।

পিয়োটের আনুষ্ঠানিক ব্যবহারবিধির ইতিহাস কয়েক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে। প্রায় 8000 বছরেরও বেশি পুরনো গুহাচিত্রে পিয়োট ও তার নানা অংশের চিত্র পাওয়া গেছে। কাণ্ডে অসংখ্য বোতাম থাকে বলে মাঝে মাঝে এটিকে একটি বিশেষ ধরনের মাশরুমের মত দেখায়। সত্যি সত্যি ভ্রম উৎপন্নকারী কিছু মাশরুম আছে (মেক্সিকোতে) যা হুবহু পিয়োটের মত দেখায়। স্পেন যখন মেক্সিকো দখল করে তখন পিয়োটকে 'পবিত্র মাশরুম' নামে অভিহিত



চিত্র 71 : মেস্কাল বোতাম।



চিত্র 72 : পিয়োট ধর্মানুষ্ঠান।

করা হয়। প্রখ্যাত বহু ব্যক্তি জীবনের কোন না কোন সময়ে পিয়োট চেখে দেখেছেন। এদের মধ্যে আছেন আইরিশ নাট্যকার ডব্লু. বি. ইয়েট্স (1865-1939), ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ হ্যাভলক এলিস (1859-1939) আর ইংরেজ ঔপন্যাসিক

অ্যালডাস হাক্সলি (1894-1963)। শেষোক্ত জন পিয়োট-এর উপর "দ্য ডোর্স অব পারসেপশন" নামের একটি বই লিখে গেছেন। 'মেস্ক' ও 'চিফ্' নামে পরিচিত এই ড্রাগগুলি ওষুধ হিসাবেই খাওয়া হয় তবে বিদ্‌ঘুটে স্বাদ এড়ানোর জন্য মাঝে-মাঝে ইঞ্জেকশন করাও হয়ে থাকে। দৃষ্টিভ্রম ছাড়াও এই ড্রাগ নিলে চোখের মণিও সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। বমি বমি ভাব, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ বা যন্ত্রণা আর বুকে ব্যথাও হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাকটাস হচ্ছে স্যান পেড্রো অথবা আগুয়াকোলা ক্যাকটাস। এর বিজ্ঞানভিত্তিক নাম ট্রাইকোসেরিয়াস পাচানোই। আন্দিজ পর্বতের কেন্দ্রে বলিভিয়া, ইকুয়েডর ও পেরু দেশগুলিতে এটি পাওয়া যায়। 1300 খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে এটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। স্প্যানিশরা এর নাম দেয় স্যান পেড্রো (সেন্ট পিটারের স্পেনীয় ভাষার নাম) কারণ মনে করা হত যে এটিই স্বর্গের চাবিকাঠি। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যেমন পিয়োট খাওয়া হয় তেমনই স্যান পেড্রোও খায় লোকে। এই অনুষ্ঠানগুলির বেশির ভাগই চাঁদকে ঘিরে গড়ে উঠেছে আর এটি মাদকাশক্তি থেকে পাগলামি—নানা রোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি ডাকিনী ও যাদুবিদ্যাতেও প্রয়োজন হয়। উপজাতিদের বাজারে এই ক্যাকটাসের ছোট ছোট কাণ্ড বিক্রি করা হয়। প্রায় ঘণ্টা সাতেক আরো নানা ভেষজের সাথে ফুটিয়ে এই কাণ্ড খাওয়া হয়। পানীয়টির নাম সিমোরা। নানা ভেষজের মধ্যে থাকে আরেকটি ক্যাকটাস যার নাম নিওরাইমোন্ডিয়া মার্ক্রস্টিবাস যাতে মানসিক পরিবর্তন আনবার রসদ আছে। যাদুবিদ্যায়, হাড়ের গুঁড়ো আর কবরখানার মাটিও এই পানীয়ে মেশাবার প্রয়োজন হয়।

দক্ষিণ আমেরিকায় ট্রাইকোসিরাসের প্রায় 40 টি প্রজাতি পাওয়া যায়। এর মধ্যে 25 টিতে হ্যালুসিনেশন উৎপন্ন করার রাসায়নিক থাকে আর কয়েকটিতে থাকে মেস্কালিন। স্যান পেড্রো ক্যাকটাস পাওয়া যায় 800 থেকে 2300 মিটার উচ্চতায়। এতে মেস্কালিনের মাত্রা খুব বেশি থাকে (শুকনো উদ্ভিদের কমপক্ষে 2 শতাংশ)। এছাড়া আরো সাতটি উপক্ষার থাকে। এগুলি পিয়োটের মতই সক্রিয় হয়।

ভ্রম উৎপন্নকারী মাশরুম

ব্যাঙের ছাতা বা অনেক মাশরুম আছে যা হ্যালুসিনেশন সৃষ্টি করতে পারে। দক্ষিণ মেক্সিকোয় অন্তত বারোটি মাশরুমের প্রজাতি আছে যা যাদুবিদ্যা ও ধার্মিক আচার অনুষ্ঠানে কাজে লাগে। এগুলি নানা নিকটসম্বন্ধী প্রজাতি—প্যানিলাস, সিলোসাইব ও স্ট্রোফ্যারিয়ার সদস্য। প্রতিটিতেই সক্রিয় উপক্ষার হিসাবে সিলোসাইবিন ও সিলোসিন (এটি খুবই অস্থায়ী যৌগ) থাকে। মানসিক রোগের চিকিৎসায় সিলোসাইবিন কাজে লাগে।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নেশার উৎপাদনকারী মাশরুমের ব্যবহার প্রাচীন কাল

থেকেই চলে আসছে। 300 খ্রীস্টাব্দের মেক্সিকান গুহাচিত্রে মাশরুম পূজার নানা ছবি পাওয়া গেছে। তার থেকেও বেশি চোখে পড়ে প্রাচীনতর 'মাশরুম প্রস্তর' যা মায়া সভ্যতার কেন্দ্র গুয়াটেমালা থেকে খনন করে উদ্ধার করা হয়েছে। এই নিদর্শনগুলি 1000 খ্রীস্টপূর্বাব্দের। এতে একটি মানুষ অথবা কোন পশুকে মাথায় ছাতার মত কিছু জিনিসকে মাথায় ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

মেক্সিকোর অ্যাজটেকদের কাছেও মাশরুম অত্যন্ত পবিত্র ছিল আর তারা একে টিওনানাকাট্‌ল বলে ডাকত। এর আক্ষরিক অর্থ হল 'ঈশ্বরের মাংস'। স্প্যানিশ আক্রমণকারীরা অবশ্য একে 'শয়তানের মাংস' বলত কারণ এটি খেলে ভয়ঙ্কর হ্যালুসিনেশন হয়। সামাজিক, ধার্মিক আর চিকিৎসা সংক্রান্ত সব আচার-অনুষ্ঠানে ডাক্তার বা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টারা এটি খেত। ভেলাদা নামের এই অনুষ্ঠানে মাশরুমগুলি কাঁচা চিবিয়ে খাওয়া হত। ভেলাদা নির্জন স্থানে অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হত।

হ্যালুসিনেশন ছাড়া এইসব মেক্সিকান মাশরুম খেলে পেশী প্রসারিত হয়ে কোমল হয়ে যায় আর নেশা চড়ার সাথে সাথে চোখের মণি সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। এরপর মনে দারুণ উল্লাস ও মানসিক চাঞ্চল্য আসে। মনঃসংযোগ করা অসম্ভব



চিত্র 73 : হ্যালুসিনেশন উৎপন্নকারী ছাতা-এখানে সিলোসাইবের তিনটি প্রজাতি দেখানো হয়েছে।

হয়। ঠিক এই সময় দৃষ্টি ও শব্দভ্রম আসে। মানসিক ও শারীরিক অবসাদ গ্রাস করে, হতাশা আসে আর সময় ও স্থানের ধারণা লোপ পায়। পরীক্ষামূলক মনোরোগবিদ্যায় এই রোগের একটি বিচিত্র লক্ষণ খুব আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। লক্ষণটি হল যে রোগী তার চারপাশের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তার সম্পূর্ণ চেতনা থাকে কিন্তু তিনি পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি উদাসীন হয়ে যান। তার স্বপ্নের জগৎ বাস্তব মনে হয় আর বাস্তবিক ঘটনা অলীক ঠেকতে থাকে। এই মাশরুম খেলে যে নেশা হয় তা অনেকটা LSD-র নেশার মতই হয়।

হার্মালা উপক্ষার

আমাজন নদীর অববাহিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের (বলিভিয়া, ব্রাজিল-কলম্বিয়া-ইকুয়েডর-পেরু) ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী (ইকুয়েডর-কলম্বিয়া) উপজাতি ইন্ডিয়ানরা, গাছের ছাল দিয়ে একটি মানসিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম (সাইকোঅ্যাক্টিভ) পানীয় তৈরী করে। গাছটির নাম ব্যানিস্টেরিওপসিস কাপি। শুধু এই ছাল দিয়েই পানীয়টি তৈরী করা যায় কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝে আরো অন্যান্য গাছ-গাছড়াও মেশানো হয়। যদিও কুড়িটিরও বেশি এই উদ্ভিদের প্রজাতি আছে যা মূল পানীয়ে মেশানো যায়, তবে ডিপ্লোপটেরিস ক্যাব্রেরানা আর সাইকোট্রিয়া ভিরিডিস সবচেয়ে ভাল মিশ খায়।

শুধুমাত্র ব্যানিস্টেরিওপ্সিস কাপির ছাল দিয়েই সাইকোঅ্যাক্টিভ পানীয় তৈরী করা যায়। এতে ভ্রমউৎপাদনকারী উপক্ষার—হার্মিন, হার্মালিন আর টেট্রাহাইড্রোহার্মাইন থাকে। এর ওপর যদি ডিপ্লোপ্টেরিস কিংবা সাইকোট্রিয়ার পাতা যোগ করা হয়, নেশা বেশি চড়ে আর দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। দুটি উদ্ভিদেই ট্রিপ্টামাইন বলে একটি যৌগ থাকে যা হার্মালা উপক্ষারের ক্রিয়াকে জোরদার করে।

এই পানীয়ের নেশাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমে বমি, পেটখারাপ, ঘামের সাথে শরীর হালকা হয়ে যাওয়ার অনুভূতি আসে। এর সঙ্গে উজ্জ্বল রঙ চোখের সামনে ভাসতে থাকে আর তারপর নানা জ্যামিতিক নকশা চোখের সামনে নেচে যায় (ক্যালাইডোস্কোপের মত)। দ্বিতীয় দশায় জ্যামিতিক নক্শা উধাও হয়ে যায় আর আসে বিচিত্র এক ওড়ার অনুভূতি। মনে হয় উড়ে চলেছি, মহাকাশে বিলীন হয়ে যাচ্ছি আর আমার সাথে ভেসে বেড়াচ্ছে ত্রিমাত্রিক জন্তু-জানোয়ার আর বিকট সব দত্যি দানো। এই ধাপে দৃষ্টি ও ধ্বনিভ্রম দুটিই দেখা যায়। শেষ ধাপে উজ্জ্বল বর্ণের জায়গায় অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল-ফিকে-নীল বা সবুজ রঙের উদয় হয়। সেই সঙ্গে আসে এক পরম শান্তি নিস্তব্ধতা—সঙ্গীতের তালে তালে নিয়ে যায় এক স্বপ্নের দেশে।



চিত্র 74 : ভিরোলা ও তার প্রয়োগ।

কোহোবা নস্যি

তীব্র হ্যালুসিনেশন উৎপন্নকারী এক ধরনের নস্যি তৈরী করা হয় পিপ্টাডেনিয়া পেরেগ্রিনার বীজ থেকে। এটি প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকার উপজাতিদের মধ্যেই প্রচলিত। অবশ্য অনেক দেশে অত্যুৎসাহী ছেলে ছোকরারাও এই নস্যি নিয়ে থাকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে এটি কোহোবা নস্যি নামে পরিচিত।

এই গুঁড়ো নস্যির গন্ধ উগ্র তামাকের মত আর এটি তৈরী করার পদ্ধতিটিও খুবই বিচিত্র। প্রথমে বেশ কিছু বড়-বড় শামুকের খোলা আগুনে ফেলে চুন তৈরী করা হয়। এই মিশ্রণে পিপ্টাডেনিয়ার বীজ গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই মিশ্রণটিকে আবার মিহি করে গুঁড়িয়ে নেওয়া হয়। আঙুলের উপর রেখে এই গুঁড়ো

বেশ জোরে নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেওয়া হয়। এই নেশার ধাক্কা এতই জোরদার হয় যে মাঝে-মাঝে নেশাতুর ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অল্প মাত্রায় নিলে বিচিত্র দৃষ্টিভ্রম দেখা যায়। এই নস্যির সক্রিয় রাসায়নিকগুলি হল ট্রিপটামাইন উৎপন্ন কিছু রাসায়নিক আর বুফোটেনিন। বুফোটেনিন একটি হ্যালুসিনোজেন যা সর্বপ্রথম কুনোব্যাঙের (বুফোভালগারিস) চামড়া আর প্যারোটিড গ্রন্থি থেকে পাওয়া যায়। এটি আমানিতা ফাঙ্গাস বলে একটি ছত্রাকেও পাওয়া যায়।

যোদ্ধারা কোহোবার নেশা করে নির্ভয়ে ব্যথা বেদনার অনুভূতিকে বশ করে যুদ্ধযাত্রা করত। গবেষণাগারেও কোহোবা তৈরী করা যায়। 1496 সাল নাগাদ তার দ্বিতীয় আমেরিকা অভিযাত্রার সময় কলম্বাস এই ড্রাগটির কথা জেনেছিলেন।

ইয়াকি

এটি দক্ষিণ আমেরিকার আরেকটি জনপ্রিয় হ্যালুসিনেশন উৎপন্নকারী নস্যি। এটি ভিরোলা জাতীয় (ভিরোলা ক্যালোফাইলা বা ইলঙ্গেটা) নানা প্রজাতির উদ্ভিদের ছাল থেকে তৈরী করা হয়। এই উদ্ভিদের ছাল থেঁতো করে একটি মাটির পাত্রে জলের সাথে মিশিয়ে সেদ্ধ করা হয়। জল সম্পূর্ণভাবে ফুটে বাষ্পে পরিণত হলে পাত্রের তলায় কিছু অদ্রাব্য বস্তু থিতিয়ে পড়ে। এই বস্তুটিকে হালকা আঁচে বসিয়ে এই পাত্রটিতেই সেঁকে নেওয়া হয়। এরপর ছুরি দিয়ে বস্তুটিকে গুঁড়ো করা হয়। এই গুঁড়োটিকে ফাঁপা নল দিয়ে নাকে টানা হয় (চিত্র দ্রষ্টব্য)। নস্যির গুঁড়ো নাকে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র ভ্রম সৃষ্টি করে। হ্যালুসিনেশনের চোটে নেশাড়ু চিৎকার করে গান গাইতে থাকে। এই নস্যিকে এপেনা, ন্যাকওয়ানা বা পারিকাও বলে। এটির প্রধান উপাদান হল ট্রিপ্টামাইন। ভিরোলা নস্যি হিসাবে না নিয়ে আরেকটি পদ্ধতিতে গুঁড়ো ছাল দিয়ে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে, নুন (অন্যান্য কয়েকটি গাছের ছাল পুড়িয়ে তৈরী করা ছাই) মাখিয়ে গিলে খাওয়া হয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে নেশা ধরে যায়।

জায়ফল আর জৈত্রী

রান্নাঘরে অপরিহার্য এই মশলাগুলি মাইরিস্টিকা ফ্র্যাগরান্স উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। ফলের বীজ থেকে পাওয়া যায় জায়ফল আর শুকনো বীজ ত্বক থেকে আসে জৈত্রী। এই ফলে মাইরিস্টিসিন নামের একটি রাসায়নিক থাকে। প্রচুর পরিমাণে জায়ফল জৈত্রী মারিজুয়ানার মত মনোগত পরিবর্তন আসে। অন্তুতপক্ষে দুটি জায়ফল গুঁড়িয়ে খেয়ে ফেললে এই ঘটনা ঘটে। নেশাখোরেরা খুব একটা বিপদে না পড়লে সচরাচর এই ফল খায় না কারণ এটি মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এটি খেলে মুখ শুকিয়ে যায়, মারাত্মক জলতেষ্টা পায়, বুক ধড়ফড় করে, তলপেটে

ব্যথা করে, বমি-বমি ভাব আসে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে আর শরীর আনচান করতে থাকে। জায়ফলকে 'কয়েদীদের মাদক দ্রব্য' বলে কারণ কয়েদীরা সহজে এবং সস্তায় কারাগারেই এই ড্রাগ যোগাড় করে নেশা করে।

কাভা

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এই মাদকটির নেশা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। পাইপার মেথিস্টিকাম নামক একটি স্থানীয় উদ্ভিদের শিকড় থেকে এই মাদক তৈরী করা হয়। এই শেকড়ের চাহিদা এত বেশি ছিল যে প্রাচীনকালে এই উদ্ভিদের চাষ করা হত। শিকড় থেকে মাদকটি থেঁতো করে নির্যাস বের করে নেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়ার প্রথাটিই বেশি প্রচলিত। মাদকটি খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মাত্রাছাড়া আনন্দের অনুভূতি আসে আর তারপর ঘুম এসে যায়।

খাত ঃ

কাথা এডুলিস নামের একটি উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য অংশ থেকে এই উপক্ষারটি পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এটি 'বুশম্যান উপজাতির চা' নামেই বেশি পরিচিত। প্রাগৈতিহাসিক কালে এটি ইথিওপিয়ায় ব্যবহৃত হত। আফ্রিকায় বনে বাদাড়ে খাত উদ্ভিদ গজিয়ে ওঠে। অবশ্য ইথিওপিয়ার হারার আর কেনিয়ার মেরু এটির প্রধান উৎপত্তিস্থল। এটি পাহাড়ের ধাপকাটা ঢালে 1500 থেকে 2000 মিটার উচ্চতায় উৎপন্ন হয়। একেকটি বাগানে আট থেকে বারোটি গাছ থাকে। মিনিট দশেক উদ্ভিদটির পাতা বা কাণ্ড চিবিয়ে খেলে নেশা চড়ে যায়। মাদকটি চিবোতে চিবোতে ধূমপান আর প্রচুর জলপান করার রেওয়াজ আছে। মাঝে মাঝে এটি থেঁতো করে মধু মিশিয়েও খাওয়া হয়। আরবদেশে শুকনো পাতাগুলিকে তামাকের মত ধূমপানে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সামাজিক মেলামেশার সময় আনন্দের অনুভূতি আনার জন্য এই মাদক সেবন করা হয়। অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে মানসিক পরিবর্তন আর হ্যালুসিনেশন দেখা যায়।

সোমরস

এই প্রাচীন মাদক রসের কথা কে না জানে। ঋগ্‌বেদে 'ঈশ্বরের প্রিয় পানীয়' নামে একে অভিহিত করা হয়। 'সোম' কথাটি গ্রীক, এর অর্থ হল 'দেহ'; অপরদিকে 'সাইক' কথার অর্থ "মন"। বর্তমান আফগানিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমাবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী আর্য ও ইন্দো-পারসিক জাতির মানুষেরা তাদের নানা আচার অনুষ্ঠানে সোমরস পান করত। আর্যদের বর্ণনায় যে সোমগাছের উল্লেখ পাওয়া গেছে তার সঠিক পরিচিতি আজও রহস্য হয়ে আছে। ঋগ্‌বেদের

বর্ণনা অনুসরণ করে আন্দাজ করা হয়েছে যে ডায়োস্কোরিয়া, বুল্‌বিফেরা কিংবা সেরোপেগিয়া বালবোসা হল সোমগাছ। সোমরস এক অত্যন্ত চড়া মাদক যার সাথে ভাঙের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সাইকোটোমাইমেটিক অ্যাম্ফিটামাইন্‌স

রাসায়নিকভাবে এই ড্রাগগুলি অ্যাম্ফিটামাইনের মতই হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও হ্যালুসিনেশন উৎপন্ন করে (পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাবেন)। এখনো পর্যন্ত 28 টি এই ধরনের হ্যালুসিনেশন উৎপন্নকারী ড্রাগ পাওয়া গেছে। এগুলিকে এদের রাসায়নিক নামের সংক্ষিপ্ত আকারে চিহ্নিত করা হয়।

DOM (2-5 ডাইমিথক্সি -4- মিথাইল অ্যাম্ফিটামাইন) কে STP (S- সেরিনিটি বা প্রশান্তি, T- ট্রাঙ্কুইলিটি বা স্থিরতা আর P- পিস বা শান্তি) নামেও ডাকা হয়। DOM এটি কৃত্রিম ড্রাগ। 1967 সালের প্রথমদিকে এটি মাদকের জগতে পদার্পণ করে। 1964 সালে ড. আলেকজান্ডার টি শুলগিন ডাও কেমিক্যাল কোম্পানির হয়ে মেথক্সিলেটেড অ্যাম্ফিটামাইন গোষ্ঠীর কিছু মাদকের উন্নতিসাধনে রত ছিলেন। সেইসময় তিনি DOM তৈরী করেন। এটি মেস্কালিনের চেয়ে প্রায় 100 গুণ বেশি সক্রিয় অথচ LSD-র চেয়ে অন্তত 30 থেকে 50 গুণ কম ক্রিয়াশীল। এটি সেবন করলে অসাড়তা, অস্থিরতা, কাঁপুনি এবং ক্লান্তি আসে। শরীরে প্রচুর ঘাম হতে থাকে। উচ্চ মাত্রায় নেশা করলে LSD-র মত মানসিক ক্রিয়া হয়। অন্তত পাঁচ মিলিগ্রাম মাদকের নেশা হ্যালুসিনেশন উৎপন্ন করে।

3,4 মিথিলিন ডাইঅক্সি অ্যাম্ফিটামাইনের সংক্ষিপ্ত নাম MDA। নেশাড়ুরা এই সংক্ষিপ্ত নামের একটি মজাদার প্রতিশব্দ তৈরী করেছে—মেলো (অর্ধ-প্রমত্ত) ড্রাগ অব আমেরিকা। একে ভালবাসার মাদকও বলা হয়। বহুকাল এটির সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে এটি কোন হ্যালুসিনেশন বা ভ্রম উৎপন্ন করে না। আসলে কিন্তু এটি LSD-র মতই সক্রিয় নেশার দ্রব্য।

DMT

এটি ডাইমিথাইল ট্রিপ্টামাইনের সংক্ষিপ্ত নাম। এটি হয় ঘ্রাণের মাধ্যমে অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে সেবন করা হয়। 60 থেকে 150 মিলিগ্রামের একটি মাত্র মাত্রার নেশা অন্ততপক্ষে 45 থেকে 60 মিনিট থাকে। তাই একে মজা করে 'ব্যবসায়ীর সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ' বা 'দ্বিপ্রাহরিক আহারকালীন সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ' বলা হয়। এর নেশাতেও হ্যালুসিনেশন আসে। এটি সেবন করতে থাকলে মাদকটির প্রতি কোন শারীরিক নির্ভরশীলতা আসে না বটে কিন্তু এটি মানসিক অবলম্বন হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটি কমলা রঙের তরল বা কেলাসের আকারে কিনতে পাওয়া যায়।

DET

ডাইইথাইল ট্রিপ্টামাইন বা ডেট একটি অত্যাধুনিক মাদক। সম্প্রতি এটির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এটি DMT সদৃশ এক ড্রাগ আর এর ক্রিয়া হয় অত্যন্ত দ্রুত বেগে। মাত্র 50 থেকে 60 মিলিগ্রাম DET দৃষ্টিবিকৃতি, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ ভাব আর ভ্রান্ত সময়ের ধারণা জাগায়। দুই থেকে তিন ঘণ্টা এর নেশা থাকে।

নয়

অ্যাম্ফিটামাইন্‌স ঃ মাদক দ্রব্যের অতিমানব

অ্যাম্ফিটামাইন নামটি তার রাসায়নিক নাম—আলফামিথাইল-ফেনিথাইলামিনের সংক্ষিপ্ত রূপ। আজকাল অবশ্য অ্যাম্ফিটামাইন বলতে এই জাতীয় অনেকগুলি যৌগকে বোঝায়। এই শ্রেণীর মাদক উদ্দীপক নামে পরিচিত আর এগুলি মানুষকে আরো বেশি সক্রিয় করে তোলে। উদ্দীপক এমন এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে আর দেহের কার্যপ্রক্রিয়াগুলিকে দ্রুততর করে। মনে হয় যেন সীমাহীন শক্তি ভর করেছে। কেউ কেউ উদ্দীপকের প্রভাবে অস্থির ও প্রগলভ হয়, আর অনিদ্রা রোগে ভুগতে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য মনটা খুশিতে ভরে ওঠে, আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় আর দেহমন সজাগ হয়ে থাকে। আসক্ত ব্যক্তি বহুক্ষণ জেগে থাকতে পারে আর প্রবল উৎসাহে কাজকর্ম করে যায়। তাই এই মাদক-দ্রব্যটিকে'অতিমানব' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আসলে এই উদ্দীপক মাদক-দ্রব্যগুলি কিন্তু কখনই বেশি শক্তি যোগায় না। এরা শক্তির দ্রুততর প্রয়োগে সাহায্য করে। যেমন অবসন্ন ঘোড়াকে চাবকে আরো বেশি পরিশ্রম করার জন্য বাধ্য করা হয়। তেমনই অ্যাম্ফিটামাইন খেলে দীর্ঘক্ষণ ঘুম কাটিয়ে যেমন বেশি কাজ করা যায়। শেষে আসক্ত ব্যক্তি অতিমানব থেকে মনুষ্যেতর জীবে পরিণত হয়। এই জন্যই চিকিৎসকেরা কখনই ক্লান্তি, খিদে বা মানসিক হতাশা কাটানোর জন্য এই ড্রাগ নেওয়ার পরামর্শ দেন না।

চা ও কফির মত মৃদু উদ্দীপকের কথা কে না জানে? এই পানীয়গুলি অবশ্য ক্ষতিকর নয়। অ্যাম্ফিটামাইনের মত যৌগগুলি খুবই ক্ষতিকারক উদ্দীপক। ড্রাগ চোরাচালানকারী এগুলিকে 'আপার্‌স' বা 'পেপ পিল্‌স' নামে ডাকে যার অর্থ 'উৎসাহবর্ধক ওষুধ'। এগুলি হৃদ্‌স্পন্দন বাড়িয়ে দেয় আর রক্তচাপেরও বৃদ্ধি ঘটায়। এই পরিবর্তনগুলি হেমারেজ বা অন্তঃরক্তক্ষরণের মাধ্যমে মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। আজকাল বাজারে নানা অ্যাম্ফিটামাইন সদৃশ রাসায়নিক যৌগ পাওয়া যায়। যে তিনটি মাদক আজকাল আসক্তরা বেশি ব্যবহার করে, সেগুলি হচ্ছে বেঞ্জিড্রিন, ডেক্সিড্রিন আর মেথিড্রিন। বেঞ্জিড্রিন অ্যাম্ফিটামাইন সালফেটের

ব্যবসায়িক নাম। স্মিথক্লাইন ফ্রেঞ্চ লেবরেটরিজ নামের বহুজাতিক একটি কোম্পানি এটি দুটি বিশিষ্ট আকারে বাজারে বিক্রি করে। জামরঙা, তিনটি তলবিশিষ্ট খাঁজকাটা ট্যাবলেট হিসাবে 5 মিলিগ্রামের ওষুধ আছে আর 15 মিলিগ্রাম ওজনের ওষুধটি বাদামী আর স্বচ্ছ রঙের ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায়। স্বচ্ছ দিকটিতে গোলাপী দানা দেখা যায় আর খোলের উপর 'SKF' লেখা থাকে।

ড্রাগকারবারীদের জগতে নানা আকারের অ্যাম্ফিটামাইন সালফেট আছে। যেমন গোলাপ বা জামরঙা বড়ি। এগুলির আকার অনেক সময় হৃদ্‌পিণ্ডের মত হয় আর এগুলিকে পিচ, রোজ, হার্ট্‌স বা বেনিজ্‌ নামে ডাকা হয়। অন্যান্য ড্রাগের মতই আকার-আকৃতি বা রং থেকেই ড্রাগগুলির বাজার চলতি নাম আসে। কোন কোন অ্যাম্ফিটামাইন সালফেট গোলাকার, সাদা, দুটি খাঁজকাটা ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়। একে কার্টহুইল্‌স, কোয়াইট্‌স বা বেনিস বলে (দ্রষ্টব্য সারণি-3)

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অ্যাম্ফিটামাইন শ্রেণীর ওষুধ হল ডেক্সিড্রিন যার মূল রাসায়নিক নাম ডেক্সট্রো অ্যাম্ফিটামাইন সালফেট। স্মিথক্লাইন ফ্রেঞ্চ লেবরেটরিজ এটি তিনটি বিভিন্ন রূপে বাজারে ছাড়ে—তরল, ক্যাপসুল আর ট্যাবলেট। ক্যাপসুলগুলো সেই বেঞ্জিড্রিনের মত একদিকে বাদামী আর নীচের দিকে স্বচ্ছ হয়; স্বচ্ছ দিকটিতে সাদা-কমলা দানা দেখা যায়। চোরাকারবারীরা একে 'ব্রাউনিজ' বলে। এর গায়েও SKF ছাপ মারা থাকে। ছাপটির পাশে দুটি ফোঁটা আঁকা থাকলে বুঝতে হবে 15 মিগ্রার ক্যাপসুল; একটি থাকলে 10 মিগ্রা আর ফোঁটা না থাকলে 5 মিগ্রা ধরে নিতে হবে। 5 মিগ্রার ট্যাবলেটগুলি হালকা কমলা রঙের হয় আর এগুলি চ্যাপ্‌টা, তিনটি ধার বিশিষ্ট, খাঁজকাটা হয়। এদের চল্‌তি নাম 'অরেঞ্জ হার্ট্‌স্‌', 'অরেঞ্জেস' বা 'ডেক্সিস'।

মেথিড্রিনের সম্পূর্ণ রাসায়নিক নাম মিথামফেটামাইন হাইড্রোক্লোরাইড। এই ড্রাগের সাদা ট্যাবলেটগুলির চলতি নাম হল 'মেথ', 'স্পিড', 'ক্রিস্টাল' অথবা হোয়াইট্‌স। মেথিড্রিনের প্রধান প্রয়োগ হয় ইঞ্জেকশন হিসাবে।

এছাড়াও নানা অদ্ভুত মিশ্রণ আকারে এই ড্রাগগুলি পাওয়া যায়। সর্বাধিক প্রচলিত মিশ্রণটি হল বাইফেটামাইন যা সাদা ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায় (হোয়াইট্‌স নামেই বেশি পরিচিত)। এটি সমপরিমাণ বেঞ্জিড্রিন আর ডেক্সিড্রিনের মিশ্রণ। ডেক্সিড্রিন অ্যামোবার্বিটেলের (একটি ঘুমের ওষুধ) সাথে মিশ্রণে সবুজ রঙের, হৃদপিণ্ড আকৃতির সবুজ ট্যাবলেটের আকারেও পাওয়া যায়। এটির নাম ডেক্সামিল।

সারণি 3 : অ্যাম্ফিটাইমাইনের ব্যবহার ও অপব্যবহার

ক্যাপসুল বা ট্যাবলেটের রঙ ও আকৃতি	ব্যবসায়িক বা ট্রেড নাম	চলতি নাম
লাল-নীল	বেঞ্জিড্রিন (স্প্যানসুল ক্যাপসুল)	বেনিস
গোলাপী	বেঞ্জিড্রিন (ট্যাবলেট)	বেনিস
কমলা	ডেক্সিড্রিন (স্প্যানসুল ক্যাপসুল)	ডেক্সিস
কমলা	ডেক্সিড্রিন (ট্যাবলেট)	ডেক্সিস
সবুজ	ডেক্সিমিল (ট্যাবলেট)। এতে ডক্সিড্রিন আর অ্যামোবার্বিটল আছে।	
সাদা	এড্রিসাল (ট্যাবলেট): বেঞ্জিড্রিন, অ্যাসপিরিন আর ফেনাসেটিন আছে।	
সাদা	বাইফেটামাইন (ক্যাপসুল)	হোয়াইট্‌স
সাদা	মেথিড্রিন (ট্যাবলেট)	মেথ, স্পিড, ক্রিস্টল্‌স, হোয়াইট্‌স

অ্যাম্ফিটামাইনের গল্প

গল্পের শুরু 1887 সালে যখন ড্রাগটি সর্বপ্রথম হাঁপানি রোগের একটি সস্তা বিকল্প হিসাবে কৃত্রিমভাবে তৈরী করা হয়। ঠিক চল্লিশ বছর পর আবিষ্কার করা হয় যে ড্রাগটি, একটি শক্তিশালী উদ্দীপক যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। 1932 সালে ওষুধটি নাকের বদ্ধভাব কাটানোর জন্য বেঞ্জিড্রিন ইনহেলার (নিঃশ্বাসের সাথে টানার ওষুধ) হিসাবে বাজারে আসে। 1937 সালে ট্যাবলেট আকারে এটি নার্কোলেপ্সির (অস্বাভাবিক ঘুমের ইচ্ছা) ওষুধ হিসাবে প্রচলিত হয়। এরপর এটি নানা রোগের (সিজোফ্রিনিয়া, সেরিব্রাল প্যাল্‌সি, আফিম-আসক্তি, নিকোটিনের নেশা, হৃদ্‌পিণ্ডের আটকে যাওয়া, পায়ের অস্থিরতা, মদের নেশা, পার্কিনসন্‌স ডিমিস, মৃদু হতাশা, মৃগী আর অস্থিরমতি শিশু) ওষুধ হিসাবে কাজে লাগানো হয়। অস্থিরমতি বা অস্বাভাবিক চঞ্চল শিশুরা হাইপারকাইমেটিক সিন্‌ড্রোম রোগে ভোগে। যদিও অ্যাম্ফিটামাইন একটি উদ্দীপক, এটি এই ধরনের শিশুকে শান্ত করে দেয়। ওষুধটির এই ক্রিয়ার কারণটি কিন্তু এখনো বোঝা যায় নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অ্যাম্ফিটামাইনের উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। এটি যোদ্ধাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য যেমন ব্যবহৃত হত তেমন কলকারখানায় শ্রমিকদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খাওয়ানো হত। তাই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জাপান, সুইডেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামারী আকারে অ্যাম্ফিটামাইনের আসক্তি দেখা যায়। 1945 সালে জাপানে প্রথম মহামারীটি দেখা যায় যা 1954 সাল নাগাদ

চরম হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের পর মিলিটারি কর্তৃপক্ষেরা অ্যাম্ফিটামাইন কেনা বন্ধ করে দেয়, ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছে প্রচুর পরিমাণে এই রাসায়নিক উদ্বৃত্ত থেকে যায়। তখন তারা ব্যাপক হারে বিজ্ঞাপন দিয়ে খোলা বাজারে অ্যাম্ফিটামাইন বিক্রি করতে থাকে। জাপানে সাধারণত ড্রাগের আসক্তি দেখা যেত না কিন্তু এই সময়ে প্রায় কুড়ি লক্ষ অ্যাম্ফিটামাইন সেবনকারীর উদয় হয়। অধিকাংশ নেশাতুরই ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগটি গ্রহণ করত। দ্বিতীয় মহামারীটি দেখা দেয় সুইডেনে যা 1950 সালে তুঙ্গে ওঠে। সে দেশে অ্যাম্ফিটামাইন গোষ্ঠীর ড্রাগ ফেন্‌মেট্রাজিন (ব্যবসায়িক নাম প্রিলুডিন) ইঞ্জেকশন করে শিরায় ব্যবহৃত হত।

1950-এর গোড়ার দিকে খাওয়ার ওষুধ হিসাবে আমেরিকায় অ্যাম্ফিটামাইন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরীক্ষার আগে ছাত্র-ছাত্রীরা আর দূরপাল্লার ট্রাক-ড্রাইভাররা ব্যাপক হারে এটির ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু 1950-এর শেষের দিকে মার্কিন মুলুকের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে এই ড্রাগ-আসক্তি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। খুব সম্ভবত হেরোইনের অভাব দেখা দিয়েছিল বলেই এই নেশার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ষাট সালের গোড়ায় সানফ্রান্সিস্‌কো উপকূলে এই নেশা ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আসক্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহু 'কেতাবি ডাক্তারের' বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল আর বাজার থেকে মেথামফিটামাইনের অ্যাম্পুল তুলে নেওয়া হয়েছিল। এর কয়েক বছর আগে ইন্‌হেলার হিসাবে বেঞ্জিড্রিন আর হেক্সিড্রিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ইনহেলার ব্যবহৃত 350 মিগ্রা অ্যাম্ফিটামাইন বেসের বিকল্প হিসেবে প্রোপাইলহেক্সিড্রিন চালু করা হয়েছিল। এই যৌগটির রাসায়নিক গঠন মিথামফেটামাইনের মত ছিল।

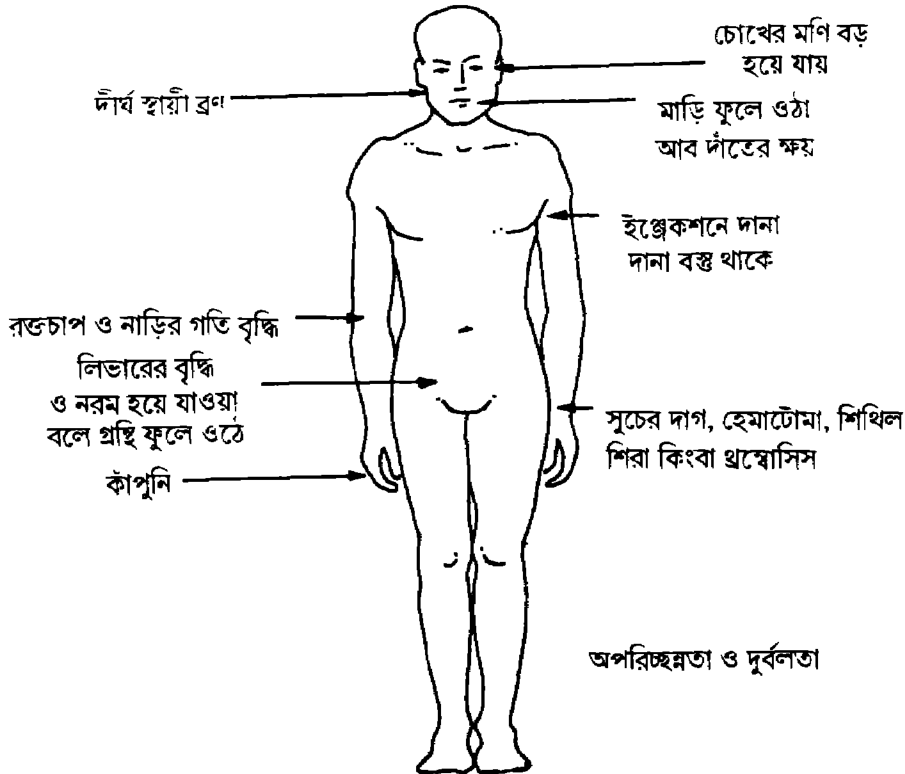
আইনের নিষেধ আরোপিত হওয়ার পর থেকে বহু বেআইনি 'স্পিড ল্যাব' গড়ে উঠেছিল। 1960 সাল নাগাদ এই লেবরেটরিগুলি ব্যাপক হারে উৎপাদন শুরু করে। এই সব বেআইনি গবেষণাগারে বাজার থেকে সস্তায় কেনা রাসায়নিক প্রয়োগ করে খুব সহজেই অ্যাম্ফিটামাইন তৈরী করা হত। এই সব গবেষণাগারের 'রাঁধুনিরা' 50 থেকে 150 ডলার খরচ করে আধ কেজি মাদক তৈরী করত আর 15 গ্রাম ভেজাল-মিশ্রিত মাদক 85 ডলারে বাজারে ছাড়ত।

কখনো-কখনো 90 শতাংশ অনুমোদিত অ্যাম্ফিটামাইনও বেআইনি বাজারে পাচার করা হয়েছে। 1971 সাল পর্যন্ত মার্কিন দেশে আইনগত ভাবে প্রায় 1·2 কোটি অ্যাম্ফিটামাইনের ট্যাবলেট প্রতিবছরে তৈরী হত। 1960 সালের শেষে এ দেশে অ্যাম্ফিটামাইনের নেশা মহামারী আকারে দেখা যায়। এর মধ্যে অধিকাংশ ব্যবহারকারীই অবশ্য নিজেদের অজান্তেই নানা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে এই মাদক খেয়ে যাচ্ছিলেন। বহু বছর পূর্বে অ্যাম্ফিটামাইনকে অনেকে অনেকগুলি মারাত্মক রোগের ওষুধ ভেবে নিয়েছিলেন। আজকাল শুধু নারকোলেপ্সি

আর শিশুদের হাইপারকাইনেটিক সিনড্রোমে অ্যাম্ফিটামাইন প্রয়োগ করা হয়।

অ্যাম্ফিটামাইনের নেশা

রাস্তায় নেশাড়ুরা তাদের নিজস্ব ভাষায় এটিকে 'স্পিড ফ্রিক' বা ঝটপট মস্তি নামে ডাকে। এটি খেলে চট করে উত্তেজনা এসে যায়। এটি খাওয়ামাত্র একঝলক আনন্দের অনুভূতি আসে (ফ্ল্যাশ বা রাশ)। যদিও এই অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী হয়, এই স্বল্পায়ু আনন্দের লোভেই ছেলে ছোকরারা এই ড্রাগের নেশা করে। এই 'একঝলক' আনন্দের পরেই আরেকটু দীর্ঘস্থায়ী প্রাণবন্তকর উত্তেজনা আসে। আর আসে স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা, আড্ডা মারার ইচ্ছা, আত্মবিশ্বাস আর মনে হতে থাকে যেন শরীর মন অভেদ্য-অপরাজেয় হয়ে গেছে। ক্লান্তি আর হতাশা সঙ্গে-সঙ্গে কেটে যায়। প্রথম প্রথম প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ দফায় 2-40 মিগ্রা. মাত্রায় এই মাদক ইঞ্জেকশন করে শিরায় প্রবেশ করানো হয়। ধীরে ধীরে সহ্যক্ষমতা বেড়ে গেলে ঘোর নেশাড়ু 800-2400 মিগ্রা মাত্রা ওষুধে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একজন নেশাড়ু সর্বোচ্চ মাত্রা



চিত্র 75 : অ্যাম্ফিটামাইনের নেশার চিহ্ন ও উপসর্গ।

15000 মিগ্রা ড্রাগ নিয়েছিল। এই বিশাল মাত্রায় নেশা করলে নানা অবাঞ্ছনীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রথমত বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা লোপ পায় আর মনে হয় সবাই বুঝি তার সাথে শত্রুতা করছে। ফলে অকারণে মানুষকে আক্রমণ করার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এর থেকে প্যারানোয়া বলে একটি মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে যেন সবাই তার ক্ষতি করতে চাইছে।

দ্রুতগতির নেশা

অ্যাম্ফিটামাইনের নেশার সাথে চক্রাকার আসক্তির ব্যাপারটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একে দ্রুতগতির নেশা, 'রান' অথবা 'স্টিড-বিঞ্জ' নামেও অভিহিত করা হয়। নেশার জন্য তিন-চার দিনে (কখনো বা বারো দিনে) রোজ দশবার করে শিরায় অ্যাম্ফিটামাইন ইঞ্জেকশন করে প্রবেশ করানো হয়। দ্রুতগতির নেশাড়ু বা স্পিড ফ্রিক যতক্ষণ না নেশা শেষ হয়, আহারনিদ্রা ত্যাগ করে বসে থাকে। নেশা একসময় শেষ হয় আর প্রচণ্ড ক্লান্তি এসে দেহমনকে গ্রাস করে। এই ক্লান্তি কাটাতে পরের পাঁচ দিন নেশাড়ু 24 থেকে 28 ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়। এই দীর্ঘ ঘুমের পর তার প্রবল খিদে পায়। তারপর নিদারুণ হতাশা আসে আর তখন আবার শিরায় অ্যাম্ফিটামাইন পাঠিয়ে সেই অনুভূতিকে চাপা দেওয়া হয়। এইভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে নেশা। কোন কোন আসক্ত ব্যক্তি ঘুমের ওষুধ খেয়ে অ্যাম্ফিটামাইনের নেশা থামাতে চায় (পরের অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আবার কেউ বা আফিম ধরে। এদিকে ঘুমের ওষুধ আর আফিম জাতীয় ড্রাগগুলি অ্যাম্ফিটামাইনের ঠিক বিপরীত ধর্মী হয়। এগুলিকে সিডেটিভ বলে। নেশার এই অভ্যাসকে 'উষ্ণ বা শীতল' হয়ে যাওয়া বলে। দ্রুতগতির নেশাড়ুদের সজাগ করতে ড্রাগ-নিষিদ্ধকরণ কর্তৃপক্ষ একটি মজাদার স্লোগান চালু করেছিল: 'নেশা দ্রুতগতি/আনে ফুর্তি/আর গঙ্গাপ্রাপ্তি।' দ্রুতগতির নেশাড়ু বিশ্বাস করে যে সে তার নেশার 'সীমারেখা' সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে আর কখনই তা অতিক্রম করে না। অবশ্য কিছু কিছু নেশাখোর প্রায়শই এই গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়। একজন আসক্তের 'স্ট্যাটাস' বা 'ড্রাগসমাজে তার স্থান' নির্ধারিত হয় তার নেশার গতি, বিচিত্র পোশাক, আচার-আচরণ আর তার মাদক সংক্রান্ত জ্ঞান-গম্যি অনুসারে।

হেরোইনের আকাল দেখা দিলে হেরোইনখোরেরা অ্যাম্ফিটামাইন ধরে। 1972 সালে ওয়াশিংটন ডি.সি. শহরে হেরোইনের অভাব দেখা দেয় তার ফলে খাঁটি হেরোইন পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। তাই নেশাড়ুরা অ্যাম্ফিটামাইন নিতে শুরু করে আর এই নেশা একটা ছোটখাটো মহামারীর চেহারা নেয়। হেরোইন আর কোকেনের মিশ্রণ 'স্পিডবলে' অনেক সময় কোকেনের পরিবর্তে অ্যাম্ফিটামাইন ব্যবহার করা হয়।

আজকাল বাজারে অ্যাম্ফিটামাইন বা 'স্পিড' নামে পরিচিত যেসব ড্রাগ পাওয়া যায়, তাতে ক্যাফিন আর অন্য কয়েকটি ড্রাগের মিশ্রণ থাকে। এই ড্রাগগুলির সঙ্গে অ্যাম্ফিটামাইনের রাসায়নিক সাদৃশ্য থাকে। এই ধরনের দুটি ড্রাগ হল ফিনাইলপ্রোপানোলামাইন আর এফিড্রি-। ফেন্‌ফ্লুরামাইন হল অ্যাম্ফিটামাইনেরই আরেক দোসর। এটি অবশ্য উদ্দীপন র বদলে হতাশা আনে।

উপসর্গ এবং কার্যপ্রক্রিয়া

বিষক্রিয়ার উপসর্গগুলি চারটি ধাপে বর্ণনা করা হয়। প্রথম ধাপে অস্থিরতা, বিরক্তি, অনিদ্রা রোগ, কাঁপুনি, অতিরিক্ত ঘাম নিঃসরণ, চোখের মণির প্রসারণ আর চোখ মুখ লাল হয়ে যাওয়ার মত বিচিত্র লক্ষণ দেখা যায়। দ্বিতীয় ধাপে, অতিরিক্ত সক্রিয়তা, বিভ্রান্তি, উচ্চ রক্তচাপ, আর তাপমাত্রা-শ্বাসপ্রশ্বাসের হ্রাসবৃদ্ধি পায়। তৃতীয় ধাপে, ভুল বকা, বাতিকগ্রস্ততা, নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা দেখা যায়। এছাড়া রক্তচাপ, দেহের তাপমাত্রা আর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিও অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। শেষ ধাপে, পেশীর আক্ষেপ, কোমা, সংবহনতন্ত্রের গোলযোগ এবং অবশেষে মৃত্যু আসে।

অ্যাম্ফিটামাইনের সাথে দেহের প্রাকৃতিক হরমোন (গ্রন্থিরস) এপিনেফ্রিন আর নরএপিনেফ্রিনের মিল আছে। এই মিলের জন্য অ্যাম্ফিটামাইন শ্রেণীভুক্ত মাদকগুলি হর্মোনের নকলনবিশি করতে পারে আর সরাসরি মানবদেহে ক্রিয়া করতে পারে। উল্লিখিত দুটি হর্মোন সাধারণত মানসিক চাপের সময় আমাদের দেহে নিঃসরিত হয়। তাই অ্যাম্ফিটামাইন সেবন করার পর মারাত্মক মানসিক চাপ আসে। চাপ এতটাই তীব্র হয় যে মনে হতে থাকে এই বুঝি সর্বনাশ হয়ে গেল অথবা কোন হিংস্র মারণ যুদ্ধ শুরু হল বলে। অ্যাম্ফিটামাইনের নেশার এটিই মূল প্রকৃতি।

অন্যান্য অনেক ড্রাগ-আসক্তির মত অ্যাম্ফিটামাইনের নেশার থেকেও কিছু বিচিত্র মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। সাধারণত দীর্ঘদিন নেশা করলে এই পরিবর্তনগুলি আসে। অবশ্য কখনও প্রথম মাত্রাতেই নানা পরিবর্তন দেখা দিতে পারে যদি ডোজটা একটু কড়া হয়। অ্যাম্ফিটামাইন সেবনের ফলে যে মানসিক বিকৃতি দেখা দেয় আর সাথে প্যারানয়েড সিজোফ্রিনিয়া নামের একটি মানসিক ব্যাধির খুব মিল আছে। এই ব্যাধিটিতে প্রধানত সন্দেহবাতিকতা আসে আর সর্বক্ষণ মনে হয় যেন রোগী প্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তাছাড়া দুশ্চিন্তা, ভীতি, এলোমেলো চিন্তা, মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, ভ্রান্ত ধারণা ইত্যাদি তো আছেই। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে রোগী ভাবতে থাকে এই বুঝি কেউ তাকে খুন করতে ছুটে আসছে। কখনো কখনো সুস্থ মানুষের মনেও এই ধরনের চিন্তা আসে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সে যুক্তির সাহায্যে এই ভুল ধারণাকে দূর করে। কিন্তু এক্ষেত্রে যুক্তির কোন গুরুত্বই

থাকে না। সে তার ভ্রান্ত ধারণায় অটল হয়ে থাকে সে কোন যুক্তিবাদিতার ধার ধারে না।

এক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন হয় দৃষ্টির, অর্থাৎ ভুক্তভোগী অধিকাংশ সময়ে যা নেই, তাই-ই দেখতে পায়। কিন্তু সিজোফ্রিনিয়া হলে শ্রবণশক্তির হ্যালুসিনেশন দেখা যায়। এক্ষেত্রে রোগী অবাস্তব আওয়াজ শুনতে থাকে। ঘ্রাণ ও স্পর্শানুভূতির হ্যালুসিনেশনও হয়। ভ্রান্ত স্পর্শানুভূতি আসলে উদ্ভট স্পর্শের অনুভূতি আনে। যেমন মনে হতে পারে যেন সারাদেহে পোকামাকড় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। ভ্রান্ত ঘ্রাণের অনুভূতি আসলে রোগী অস্তিত্বহীন ঘ্রাণ পেতে থাকে।

অ্যাম্ফিটামাইনের আসক্তির ফলে আরেকটি বিচিত্র মানসিক ব্যাধি দেখা যায়। রোগী শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে একই ধরনের অপ্রয়োজনীয় কাজ বার বার করে চলে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ঘন ঘন মালা জপতে থাকে, বার-বার নেল পালিশ লাগায়, ঘড়ি, টেলিভিশন সেট বা রেডিও-র অংশগুলিকে ঘন ঘন আলাদা করে নিয়ে মোছামুছি করতে থাকে। গাড়ি থাকলে বার-বার সেটিকে ধুয়ে ফেলে। অনেকে সারাদিন জুতোপালিশ করে কাটায়। একটি মোটর সাইকেলবাহিনীকে পুলিশ 200 বার পরপর একই পথ পরিক্রমার জন্য ধরেছিল। এই একঘেয়ে আচরণ অ্যাম্ফিটামাইন আসক্তকে তৃপ্তি দেয়। পরীক্ষামূলকভাবে জন্তুজানোয়ারকে অ্যাম্ফিটামাইন খাওয়ালে তারা ঠিক এই ধরনের আচরণই করে যায়।

বহু ওজন কমানোর ওষুধে অ্যাম্ফিটামাইন থাকে কারণ এই ড্রাগটি ক্ষুধামান্দ্য সৃষ্টি করতে পারে। ডাক্তাররা কিন্তু কখনই ওজন কমানোর জন্য এই ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন না কারণ দেখা গেছে যে এই ড্রাগ কিছু দিনের মধ্যেই অকার্যকর হয়ে দাঁড়ায় আর রোগী পুনরায় অতিভোজের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই ধরনের ওষুধ যারা খান তারা অনেকেই অ্যাম্ফিটামাইন জনিত মানসিক বিকৃতির শিকার হন। বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা নারীর ক্ষেত্রে অ্যাম্ফিটামাইন মারাত্মক ক্ষতি করে। এই ড্রাগ নবজাতকের অঙ্গবিকৃতির কারণ হতে পারে।

অ্যাম্ফিটামাইন সেবন করার ফলেও ড্রাগের প্রতি সহ্যক্ষমতা আর ড্রাগ-নির্ভরতা গড়ে ওঠে। কিন্তু হেরোইনের মত অবদমকের তুলনায় এক্ষেত্রে উইথড্রয়াল সিম্পটম বা প্রত্যাহরণের লক্ষণ অনেক মৃদু হয়। পেশীর আক্ষেপ জনিত সমস্যাও দেখা যায় না। তবে হতাশা আর তন্দ্রাচ্ছন্নভাব আসে। ড্রাগটি সেবন থেকে বিরত হওয়ার দুদিনের মধ্যে হতাশা চরম অবস্থায় পৌছয়। এই প্রবল হতাশা অনেক সময় রোগীকে আবার পুনরায় নেশা ধরতে বাধ্য করে।

অন্যান্য নানা মাদক দ্রব্যের মত অ্যাম্ফিটামাইন সম্পর্কেও কামোদ্দীপনা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। বলা হয় অ্যাম্ফিটামাইন খেলে নাকি বীর্যস্খলন দীর্ঘায়িত হয়, যার ফলে কামক্রিয়া বহুক্ষণ ধরে উপভোগ করা যায়। এই দীর্ঘ

কামের পর যখন চরম উত্তেজনার মুহূর্তটি আসে তা নাকি সাধারণ উত্তেজনার চেয়ে বহুগুণ বেশি সুখানুভূতি আনে। কিন্তু এই ধারণাগুলির স্বপক্ষে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় নি। আসলে পুরো কামোদ্দীপনার ব্যাপারটাই এক্ষেত্রে মানসিক স্তরে আবদ্ধ থাকে—শারীরিক ক্ষেত্রে এর কোন প্রভাবই লক্ষ করা যায় না। বিপরীত দিকে কিছু গবেষণার ফল থেকে দেখা যাচ্ছে, অ্যাম্ফিটামাইন অবদমিত যৌনতাকে আরো দমিয়ে দেয়।

অ্যাম্ফিটামাইন সেবন করে অ্যাথলেটরা তাদের খেলাধুলোয় বেআইনিভাবে দারুণ সাফল্য পায়। তাই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা তাদের প্রতিযোগিতাগুলিতে এই ড্রাগ সেবন করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অ্যাম্ফিটামাইন সেবনকারী কোন অ্যাথলেট ধরা পড়লে তাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

প্রিলুডিন

প্রিলুডিন হল ফেন্‌মেট্রাজাইন হাইড্রোক্লোরাইডের ব্যবসায়িক নাম। এই রাসায়নিকটি অ্যাম্ফিটামাইনের সমগোত্রীয়। এই ড্রাগ 1950 সালের সুইডিশ মহামারী ঘটিয়েছিল। ঔষধতত্ত্ব অনুসারে এটি একটি মৃদু উদ্দীপক যা ক্যাফিনের চেয়ে শক্তিশালী কিন্তু অ্যাম্ফিটামাইনের চেয়ে দুর্বলতর। অ্যাম্ফিটামাইনের মতই এটিও ওজন-হ্রাস ঘটাতে পারে। এটি সেবন করলে উদ্দীপনা আর ভালো লাগার এক অনুভূতি আসে। এই গুণটি এবং তথাকথিক 'কামোদ্দীপক' হিসাবে এটির অপব্যবহার দেখা যায়। এই ওষুধের উপর নির্ভর করতে থাকা বা এটি সেবন করতে-করতে ছেড়ে দিলে যে প্রত্যাহরণ লক্ষণ দেখা দেওয়ার উপসর্গগুলি অ্যাম্ফিটামাইন সেবনের উপসর্গের মতই হয়। প্রিলুডিন তৈরী করে গাইগি ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স নামের একটি ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থা। এটি সাধারণত গোলাপী, চৌকোণা খাঁজকাটা 25 মিগ্রার ট্যাবলেট হিসাবে বিক্রি হয়। গোলাপী রঙের গোল 75 মিলিগ্রামের ট্যাবলেটগুলি 'এন্ডুরেট' নামে বিক্রি হয়। এগুলি খেলে দীর্ঘকালীন ক্রিয়া হয়।

অ্যাম্ফিটামাইন-বিহীন উদ্দীপক

আজকাল অ্যাম্ফিটামাইন শ্রেণী বহির্ভূত খুব কম উদ্দীপকই বাজারে বিক্রি হয়। এই উদ্দীপকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিথাইলফেনিডেট হাইড্রোক্লোরাইড যার ব্যবসায়িক নাম রিটালিন। এটি খেলে খোশমেজাজ আসে আর কর্মক্ষমতাও বেড়ে যায় কিন্তু উত্তেজনা কখনই মাত্রা ছাড়ায় না বা নেশা পরবর্তী সময়ে হতাশা এসে গ্রাস করে না। এই ড্রাগের প্রতি আসক্তের নির্ভরশীলতা বা প্রত্যাহরণ লক্ষণের গতিপ্রকৃতি অ্যাম্ফিটামাইনের সদৃশ হয়। এটি তৈরী করে ঔষধ প্রস্তুতকারক

কোম্পানি সিবা ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স। 5 মিগ্রার ফ্যাকাশে হলুদরঙা, 10 মিগ্রার আকাশিরঙা আর 20 মিগ্রার জামরঙা রিটালিনের ট্যাবলেট ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। ট্যাবলেটগুলির আকার গোল হয় আর ওপরে CIBA ছাপ মারা থাকে।

দশ

বার্বিচুরেট ঃ পরম নিদ্রার হাতিয়ার

বার্বিচুরেট একটি অবদমক বা ডিপ্রেসান্ট শ্রেণীর মাদক। ডিপ্রেসান্ট শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ড্রাগগুলির মধ্যে আফিমের পপি নিঃসৃত নানা মাদক দ্রব্য আছে। এছাড়া কৃত্রিমভাবে তৈরী হেরোইন, মরফিন, ডিমেরোল আর মিথাডোনও এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। সেইসব রাসায়নিক যৌগগুলিকে ডিপ্রেসান্ট বলা হয় যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজকর্মকে ধীরগতি করে দিতে পারে। এগুলি, উদ্দীপকগুলির (যেমন অ্যাম্ফিটামাইন) ঠিক বিপরীত কাজ করে। এই দুই শ্রেণীর ড্রাগের কাজ করার পদ্ধতিতে আকাশ-পাতাল ফারাক থাকা সত্ত্বেও মানুষ ডিপ্রেসান্ট ও স্টিমুলান্ট (উদ্দীপক) দুটির নেশাতেই চুর হয়।

ডিপ্রেসান্টগুলিকে তাদের ক্রিয়াশক্তির মাত্রা অনুসারে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল মাদকগুলি নিদ্রা নিয়ে আসে আর এদের সম্মোহক বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে প্রশান্তিদায়ক বা সিডেটিভ্স। এগুলি মানুষকে মানসিকভাবে শ্লথ করে দেয় আর তারপর ধীরে ধীরে নিদ্রা আনে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে ট্রান্‌কুইলাইজার যা মনকে দুশ্চিন্তামুক্ত করে, পেশীগুলিকে শিথিল করে আর একধরনের স্থির প্রশান্তি আনে। এরা কিন্তু ঝিমুনি বা ঘুম আনে না।

বার্বিচুরেট সম্মোহক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই ড্রাগগুলিকেই আমরা সাধারণভাবে ঘুমের ওষুধ বলে থাকি। ড্রাগের চোরাকারবারীরা এগুলিকে 'বার্ব' 'গুফ্‌বল্‌স' 'ক্যান্ডি', 'ডাউনার্স' প্রভৃতি নামে ডাকে। বার্বিচুরেটগুলির প্রধান উপাদান হল বার্বিচুরিক অ্যাসিড যা কৃত্রিমভাবে 1863 সালে সর্বপ্রথম তৈরী করেন জার্মান রসায়নবিদ্ অ্যাডল্ফ ভন বায়ার। এই বার্বিচুরিক অ্যাসিড থেকেই পরে বার্বিচুরেট তৈরী করা হয়। বার্বিচুরিক অ্যাসিডের নামকরণটির আড়ালে একটি মজার ঘটনা আছে। ভন্ বায়ার যখন এই রাসায়নিকটির উপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল মিউনিখের এক কাফের একজন ওয়েট্রেস বা সেবিকা। এই মহিলা বায়ারকে তার মূত্রের নমুনা দিয়ে সাহায্য করত। এই মহিলার নাম ছিল বারবারা। এই সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞতা

জানাতে বায়ার সাহেব ড্রাগটি প্রস্তুত করার পর সেই মহিলার নামানুসারে সেটির নাম দেন বার্বিচুরিক অ্যাসিড।

বছর চল্লিশেক পরে এই ভাবেই ডাইইথাইল বার্বিচুরিক অ্যাসিডের নামকরণ করা হয়। 1903 সালে দুজন জার্মান রসায়নবিদ্ জোসেফ ভন মেরিঙ এবং এমিল ফিশার বার্বিচুরিক অ্যাসিডের সমগোত্রীয় আরেকটি সম্মোহক কৃত্রিমভাবে তৈরী করেছিলেন। ভন মেরিঙের অত্যন্ত প্রিয় শহর ছিল ইটালীর 'ভেরোনা'। তাই তিনি নব আবিষ্কৃত ড্রাগটির নাম দেন 'ভেরোনাল'। এই রসায়নবিদ্ শহরটির শান্ত সমাহিত রূপে আকৃষ্ট হয়ে প্রায়ই ভেরোনায় যেতেন। তিনি এই শহরটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশান্তিদায়ক স্থান মনে করতেন। যেহেতু নব আবিষ্কৃত ড্রাগটিও মনে দারুণ প্রশান্তি এনে দেয় তাই নামটি যথাযথ মনে হয়। অবশ্য 1918 সালে ভেরোনাল নামটি পাল্টে বার্বিটোন নাম রাখা হয়।



চিত্র 76: জার্মান রসায়নবিদ্ বায়ার সর্বপ্রথম বার্বিচুরিক অ্যাসিড তৈরী করেন।

নানা ধরনের বার্বিচুরেট

বার্বিচুরিক অ্যাসিড থেকে প্রায় 2500 বার্বিচুরেট সংশ্লেষিত হয়েছে। এগুলিকে ক্রিয়ার স্থায়িত্বের ভিত্তিতে প্রধানত চারটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যেসব বার্বিচুরেট দীর্ঘকাল ধরে ক্রিয়া করে সেগুলি আট ঘণ্টা বা তার কিছু বেশি সময় পর্যন্ত কাজ করতে পারে। এই শ্রেণীর অন্যান্য প্রধান ড্রাগগুলি হল অ্যামোবার্বিটল, বিউটোবার্বিটোন, সাইক্লোবার্বিটোন আর পেন্টোবার্বিটোন। যেসব বার্বিচুরেটের ক্রিয়া স্বল্পকাল স্থায়ী হয়, যেগুলির প্রভাব ঘণ্টা চারেকেরও কম থাকে। এই ধরনের দুটি বার্বিচুরেট হল সেকোবার্বিটোন আর হেক্সোবার্বিটোন। এছাড়া এমন কিছু ড্রাগ আছে যাদের ক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। এগুলি খাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। এগুলি সাধারণত ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শিরায় পাঠানো হয়। থায়োপেন্টোন আর থায়াল বার্বিটোন, এই ড্রাগগুলির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বার্বিচুরেটের নেশা ছাড়ার পর উৎপন্ন প্রতিক্রিয়ার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জার্মানিতে 1905 সাল নাগাদ। এরপরে বছর তিরিশ ধরে নানা ঘটনা থেকে জানা যাচ্ছিল যে বার্বিচুরেট শারীরিক নির্ভরশীলতা আনতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারটাকে তখন খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মনে করা হত যে বার্বিচুরেট শারীরিক নয়, মানসিক নির্ভরশীলতা গড়ে তোলে। 1950 সাল নাগাদ এটির ক্ষতিকর দিকটির কথা স্বীকৃত হয়। বিশেষজ্ঞরা তখন মেনে নেন যে এটি আসক্তি আনতে পারে আর সেটি সম্পূর্ণভাবে শারীরিক প্রতিক্রিয়ার অঙ্গ।

আজকাল বহু বার্বিচুরেটের নেশার চল হয়েছে। অ্যামোবার্বিটালের ব্যবসায়িক নাম অ্যামাইটাল। এটি তৈরী করে এলি লিলি এন্ড কোং নামক একটি ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থা। এটি আধঘণ্টার মধ্যে কাজ শুরু করে আর এর ক্রিয়াশীলতা তিন থেকে ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই ওষুধটি 65 মিগ্রা আর 200 মিগ্রা ওজনের হয়। ওষুধটি হালকা নীলচে সবুজ ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায়। ক্যাপসুলের দুটি ভাগ যেখানে জোড়া লাগে সেখানে গাঢ় নীল রঙের কয়েকটি দাগ থাকে। দুই অংশেই 'লিলি' ছাপ মারা থাকে। এগুলিকে অনেকে 'ব্লু ড্রাগনস্', 'ব্লু হেভেনস্' 'ব্লু ডেভিল্‌স' ইত্যাদি নামে ডাকে। এলি লিলি 'সেকোনাল' নামের আরেকটি ওষুধ তৈরী করে যার রাসায়নিক নাম সেকোবার্বিটল। এগুলি 30, 50 আর 100 মিগ্রার ক্যাপসুল আকারে বিক্রি হয়। ক্যাপসুলটির রঙ উজ্জ্বল লাল আর এর খোলে গোলাপী রঙে 'লিলি' ছাপ মারা থাকে। এগুলিকে 'পিঙ্কস' 'রেডস' ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা উল্লিখিত এই দুটি ওষুধকে মিশিয়ে একটি লাল-নীল রঙের ওষুধ তৈরী করে। এটির নাম টুইনাল। ওষুধটিকে ড্রাগের চোরাকারবারীরা 'রেইনবো' 'ক্রিস্থাস ট্রি' কিংবা 'রেড্স এন্ড ব্লুজ' নামে ডাকে (সারণি-4)।

নেম্বুটাল, পেন্টোবার্বিটল নামের একটি ওষুধের ব্যবসায়িক নাম। এটি তৈরী করে অ্যাবট লেবরেটরিজ। চলতি ভাষায় একে 'ইয়েলো-জ্যাকেট', 'ইয়েলো বার্ড্স' ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। জ্যাকলিন সুসানের 'ভ্যালি অব দ্য ডল্‌স' উপন্যাসের 'ডল্‌স' হচ্ছে এই নেম্বুটাল। এই নামটা অবশ্য খানিকটা ধন্দ সৃষ্টি করে কারণ ড্রাগের জগতে 'ডল্‌স' বা 'ডলিস' বলতে ডলোফিনকে (মিথাডোন) বোঝায়। এটি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত আফিমজাতীয় ড্রাগ। এটি কোন বার্বিচুরেট নয়।

সারণি 4 : সাধারণত যেসব বার্বিচুরেটের নেশা করা হয়

ক্যাপসুলের রঙ ও তার আকৃতি	ব্যবসায়িক (এবং জেনেরিক) নাম	প্রচলিত নাম	প্রধান চিকিৎসাগত প্রয়োগ	ক্রিয়াশীলতার স্থায়িত্বকাল
নীল-সুবজ	অ্যামাইটাল (অ্যামোবার্বিটল)	ব্লু ড্রাগন্‌স	প্রশান্তিদায়ক ও সম্মোহক	মাঝারি
লাল	সেকোনাল (সেকোবার্বিটল)	রেড্‌স, রেড বার্ড্‌স, রেড ডেভিল্‌স	সম্মোহক	স্বল্পকাল
লাল-নীল	টুইনাল (অ্যামোবার্বিটল আর সেকোবার্বিটলের মিশ্রণ)	রেইনবোস্‌	সম্মোহক	মাঝারি
হলুদ	নেম্ বুটাল (পেন্টোবার্বিটল)	ইয়েলো জ্যাকেট্‌স	সম্মোহক প্রশান্তিদায়ক এবং আক্ষেপ নিবারক	স্বল্পকাল
সবুজ	লুমিনাল (ফেনোবার্বিটল)	পার্পল হার্ট্‌স বার্ব্‌স্	সম্মোহক	দীর্ঘ

ফেনোবার্বিটলের ব্যবসায়িক নাম লুমিনাল। এগুলি সবুজ রঙের ক্যাপসুলের আকারে পাওয়া যায়। এটির প্রচলিত নাম 'পার্পল হার্ট্‌স,' 'বার্ব্‌স' বা 'ইডিয়ট পিল্‌স'।

ডাক্তার এবং ড্রাগ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের এই ওষুধগুলির আকার ও রঙ জেনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ক্যাপসুলগুলির সঠিক পরিচয় জানা না থাকলে তারা প্রয়োজনের সময় এগুলিকে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন না। ডাক্তারেরা বেশিমাত্রায় বার্বিচুরেট সেবনের জন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যুর ময়নাতদন্তের সময়েও, ওষুধগুলির সম্বন্ধে জানা থাকলে সহজে মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে পারবেন। মৃতদেহের পেটের ক্যাপসুলের অবশেষ তাদের বার্বিচুরেটটি সনাক্ত করতে সাহায্য করবে।

বার্বিচুরেটগুলির অবদমন (ডিপ্রেসান্ট) ক্রিয়া

চিকিৎসার জগতে বার্বিচুরেটের স্থান দখল করে নিয়েছে অনেক বেশি নিরাপদ আর কার্যকর বেন্‌জোডায়াজিপাইন (এই শ্রেণীতেই আছে বিখ্যাত কামপোজ নামের ঘুমের ওষুধটি)। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বার্বিচুরেট আজও অপরিহার্য থেকে গেছে।

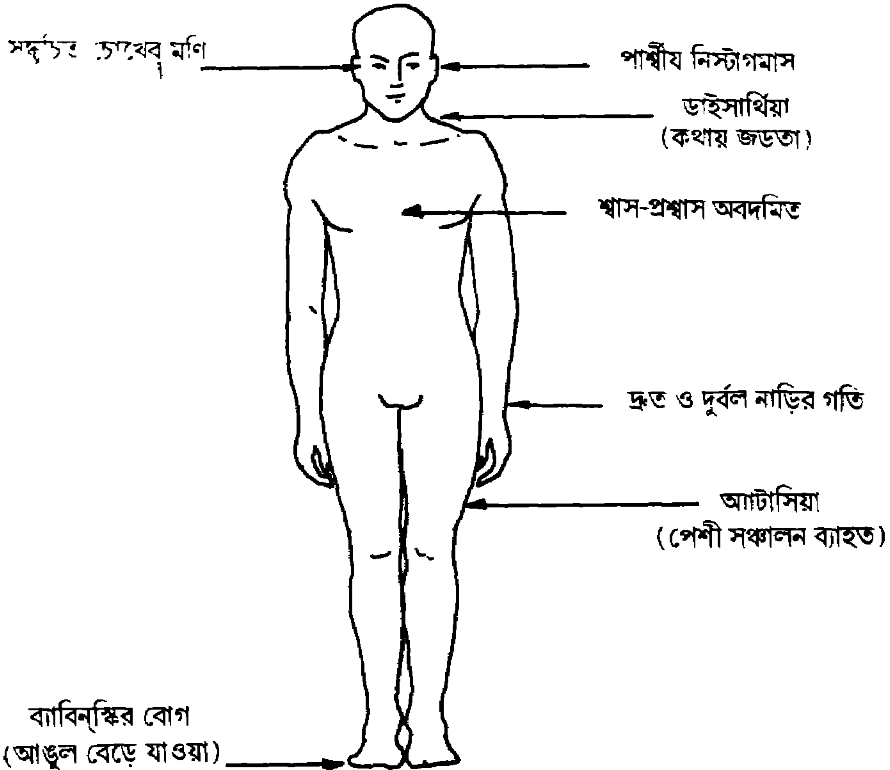
আন্ত্রিক, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, করোনারি ধমনীর অসুখ এবং আক্ষেপ-জনিত (কনভালসান) ব্যাধিতে এখনো বার্বিচুরেট প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও মস্তিষ্কের নানা অসুখেও (যেমন মারাত্মক আঘাত) এটি ব্যবহার করা হয়। বার্বিচুরেটগুলির নিরাপদ মাত্রা খুব সামান্য হয়। ধরা যাক কোন বার্বিচুরেটের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ঘুম আনতে পারে। সেই মাত্রার পাঁচগুণ ওষুধ খেলেই ব্যক্তি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে (চিকিৎসাশাস্ত্রে একেই কোমা বা সংজ্ঞাচ্ছন্নতা বলে) আর দশগুণ মাত্রা মৃত্যু আনবে। তাই কোন ব্যক্তি ঘুমের জন্য যদি একটি ক্যাপসুল খায়, দশটি খেলে তার মৃত্যু হবে। তাই এই ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলা উচিত। অল্প মাত্রায় খেলেই মৃত্যু হয় বলেই প্রায়শই বার্বিচুরেট খেয়ে আত্মহত্যার কথা শোনা যায়। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বেশি মাত্রায় বার্বিচুরেট খেয়ে যত লোক আত্মহত্যা করে, সম্ভবত আর কোন বিষাক্ত বস্তু খেয়ে তত লোক মরে না। এছাড়া এই ওষুধগুলি অনেক 'অনিচ্ছাকৃত' বা 'আকস্মিক' মৃত্যুর সাথেও জড়িয়ে আছে কারণ এগুলি 'ড্রাগ অটোমেটিজম' বা 'স্বয়ংক্রিয় ঔষধ-ক্রিয়া' তৈরী করতে পারে।

এই প্রক্রিয়ার ফলে কোন রোগী ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রয়োজন মত ওষুধ খেয়েও বেমালুম ভুলে যেতে পারে। ওষুধটি মস্তিষ্কে এমন ক্রিয়া করে যে রোগী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সে ভুলে গিয়ে আবার ওষুধ খেয়ে ফেলে। এইভাবে চক্রাকারে এই ভুল চলতে থাকে আর শেষে দুর্ভাগা রোগী ওষুধের বিপজ্জনক মাত্রা ছাড়িয়ে যায় আর অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর শিকার হয়। এই ওষুধগুলির এই স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়াকেই ড্রাগ অটোমেটিজ্‌ম বলে। কোন কোন রোগী আবার ওষুধের বিলম্বিত ক্রিয়ায় অধৈর্য হয়ে ক্রমাগত ওষুধ খেয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনে। আসলে এই ওষুধগুলি একটু আস্তে আস্তে শোষিত হয় আর তারপর এদের অবদমন ক্রিয়া শুরু হয়।

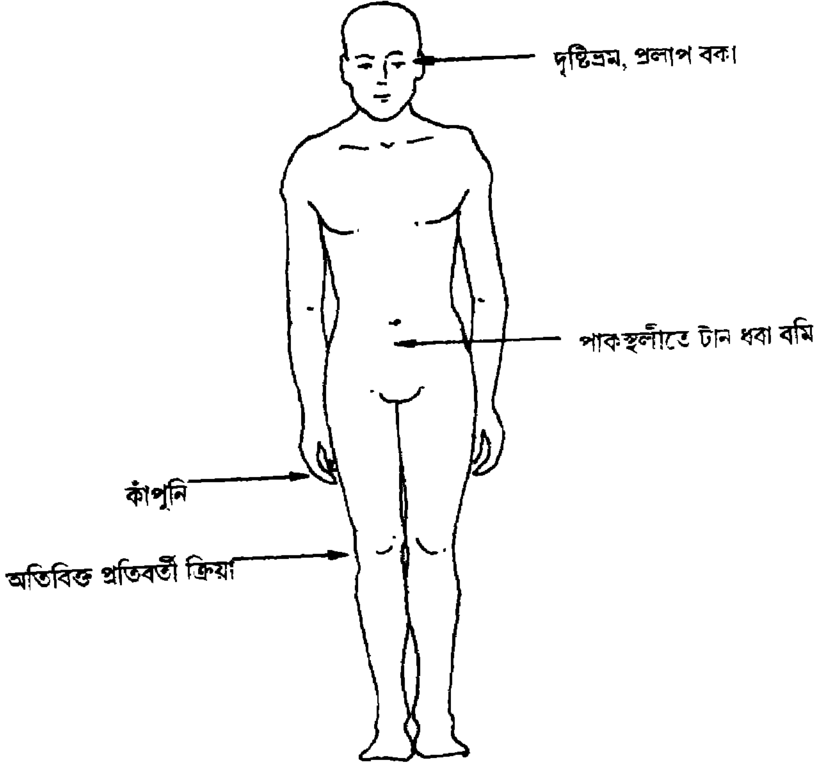
অনেকে বার্বিচুরেটের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে কারণ এটি খেলে মাত্রাছাড়া আনন্দের অনুভূতি আসে। বার্বিচুরেট যেমন খাওয়া যায় তেমনই ইঞ্জেকশন বা মলদ্বারের মাধ্যমেও প্রবেশ করানো যায়। বার্বিচুরেটের প্রতি নির্ভরশীলতা আর সহ্যক্ষমতা গড়ে উঠতে সময় লাগে না। বার্বিচুরেট হেরোইনের চেয়েও মারাত্মক শারীরিক নির্ভরশীলতা গড়ে তোলে। উত্তেজনা আর নেশায় চুর হবার জন্য নেশাড়ুরা অনেক সময় অন্যান্য নানা মাদকের সাথে (প্রধানত মদ ও আফিম জাতীয় ড্রাগের সঙ্গে) বার্বিচুরেট সেবন করে থাকে। এই ধরনের পরীক্ষামূলক মাদক-মিশ্রণ সেবন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ মস্তিষ্কের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রকে আক্রান্ত করে। এর ফলে মারাত্মক নেশা কিংবা মৃত্যু হয়। এমন অনেক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে যেখানে ডাক্তারেরা মৃতদেহে খুব সামান্য পরিমাণ

অ্যালকোহল (মদ) এবং বার্বিচুরেট খুঁজে পেয়েছেন। দুটি মাদক দ্রব্যের পরিমাণই অত্যন্ত নগণ্য ছিল। পৃথকভাবে এগুলি খেলে কোন বিপদই হয়ত হত না কিন্তু একত্রে দুটি মাদক একটি মারাত্মক ক্রিয়া করেছে। এক্ষেত্রে জেস্টাল্টের মনোবিদ্‌দের বিখ্যাত উক্তি—'অংশগুলি অপেক্ষা যোগফল অতি মারাত্মক'—উল্লেখ করা যেতে পারে।

বার্বিচুরেট সেবনের প্রধান লক্ষণ হল মাতাল মাতাল ভাব কিন্তু কোন মদের গন্ধ পাওয়া যাবে না। ঝিমুনি ভাব আসবে আর পা টলমল করবে। বার্বিচুরেট সেবনকারী চেয়ারে বসেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে পারে। মানুষটার আচরণে অদ্ভুত উদাসীনতা দেখা যাবে আর কোন কিছুর প্রতিই কোন আগ্রহ দেখাবে না। সে তার পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে আর তার আচরণও দারুণভাবে পাল্টে যাবে। আসক্ত ব্যক্তি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সে তার পেশীর ক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, হতাশ, বিরক্ত আর কলহপ্রবণ হয়ে যায়।



চিত্র 77 : বার্বিচুরেট — নেশার চিহ্ন ও লক্ষণ।



চিত্র 78 : বার্বিচুরেটের প্রত্যাহরণ লক্ষণ।

প্রত্যাহরণের লক্ষণ

প্রত্যাহরণের লক্ষণ অনেকগুলি ঘটনার ওপর নির্ভর করে যেমন মাদকের পরিমাণ তার মাত্রা, বার্বিচুরেটের শ্রেণী আর প্রত্যাহরণের গতি-প্রকৃতি। যাদের বার্বিচুরেটের প্রতি গভীর নির্ভরশীলতা থাকে না, তাদের প্রত্যাহরণের লক্ষণগুলিও অপেক্ষাকৃত মৃদু হয়। এসবক্ষেত্রে প্রত্যাহরণ লক্ষণ অনিদ্রারোগে, কাঁপুনি, দুশ্চিন্তা আর দুর্বলতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তবে যারা দীর্ঘদিন ধরে বেশি মাত্রায় বার্বিচুরেট সেবন করেন তাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি করুণ হয়। প্রথমে প্রত্যাহরণের লক্ষণ খুব মৃদু মনে হয়। রক্তে বার্বিচুরেটের ঘনত্ব কমে গিয়ে নেশার ভাব কমে যাওয়ার প্রথম 12 থেকে 16 ঘণ্টা নেশাড়ু খুব একটা অস্বস্তি বোধ করে না। এরপরই কিন্তু আপাতভাবে ভাল লাগার অনুভূতি চলে যায় আর দারুণ অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, কাঁপুনি আর দুর্বলতা আসে। মাংসপেশীতে খিল ধরে যায়, বমি বমি ভাবে আসে আর তারপর বমি হতে থাকে। রক্তের চাপ কমে যাওয়ার জন্য অনেকে দাঁড়াবার সময়

অজ্ঞান হয়ে যায়।

তিন দিনের মধ্যে লক্ষণগুলি চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছয়। এই সময় দেখা যায় মাংসপেশীর প্রবল আক্ষেপ বা কন্‌ভালসান। এটিই সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর লক্ষণ। ফেনোবার্বিটলের মত দীর্ঘ সময় ধরে ক্রিয়া করে যেসব বার্বিচুরেট, সেগুলির ক্ষেত্রে, প্রত্যাহরণ 'চূড়ান্ত' অবস্থায় পৌঁছতে অনেক বেশি সময় নেয়। এক্ষেত্রে নেশা প্রত্যাহরণের সপ্তম বা অষ্টম দিনে খিঁচুনি দেখা যায়। এই সময়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে, হ্যালুসিনেশন আসে, সময় বা স্থানের আন্দাজ থাকে না আর কখনো-কখনো বিকার দেখা যায়।

বার্বিচুরেট আসক্ত বহু ব্যক্তি প্রবল আক্ষেপের ফলে সাধারণত চতুর্থ থেকে সপ্তম দিনে মারা যায়। এই আক্ষেপ সাধারণ ওষুধে সারে না। এই আক্ষেপ থামাতে হলে সেই বার্বিচুরেট খাইয়েই চিকিৎসা করতে হয়। আসক্ত ব্যক্তি এক বা দুই সপ্তাহের ঝক্কি পোহাতে পারলে দু মাসের মধ্যে আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

বার্বিচুরেটের প্রত্যাহরণ লক্ষণ হেরোইনের প্রত্যাহরণ লক্ষণের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক হয়। আক্ষেপ বা খিঁচুনি বার্বিচুরেটের সবচেয়ে কষ্টদায়ক লক্ষণ। এটি হেরোইন বা আফিম জাতীয় অন্য কোন মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। অবশ্য হেরোইনের নেশায় চোখ দিয়ে জল গড়ায়, পেটের পেশীতে খিল ধরে যায় আর মারাত্মক পেট খারাপ হয়। প্রত্যাহরণের এই সব লক্ষণ বার্বিচুরেট নেশার পর দেখা যায় না। বার্বিচুরেট আর হেরোইনের নেশার প্রত্যাহরণের এগুলিই হল প্রধান লক্ষণ। হেরোইন আসক্তদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বার্বিচুরেটেরও নেশা করে। ডাক্তাররা এদের হেরোইনের বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত করার পরেও সহজে বার্বিচুরেটের বিষ ছাড়াতে পারেন না।

উপসংহার

বৈচিত্র্যপূর্ণ ড্রাগের বিবরণ শেষ হল। এই ড্রাগগুলি আসক্তি সৃষ্টি করে। আজ ড্রাগের নেশা সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। এই মারাত্মক সমস্যাটির প্রতি সজাগ হয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ তার সপ্তদশ সভাটিতে ঘোষণা করে যে 1991-2000-এর দশকটি হবে 'রাষ্ট্রসংঘের ড্রাগ-আসক্তি বিরোধী দশক'। ভারতে ড্রাগ-আসক্তির অবস্থাটি আজ খুবই শোচনীয়। দেশের প্রধান শহর এবং শহরতলীতে আজ 'ব্রাউন সুগারের' আসক্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামে-গঞ্জে অবশ্য আফিম, চরস এবং ভাঙের নেশা চিরাচরিতভাবে চলে আসছে। এই পরিস্থিতি দেখে নিশ্চিত হয়ে থাকা যায় না। অবস্থাটিকে আরো জটিল করেছে ড্রাগ চোরাচালানের দুই আখড়া—সোনালী ত্রিভুজ আর সোনালী বাঁকাচাঁদের—মাঝে ভারতের অবস্থান। এই ভয়াল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকার 1985 সালে একটি আইন প্রবর্তন করে আইন নির্বহন কর্তৃপক্ষের হাতে বেশি ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। এই পদক্ষেপটি নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কারণ এর ফলে আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ড্রাগের চোরাচালান করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। নারকোটিক ড্রাগ্স এন্ড সাইকোট্রোপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, 1985 (সংক্ষেপে এন ডি পি এস অ্যাক্ট) নামে পরিচিত এই আইনটিতে ড্রাগ-আসক্তি রোধ করার নানা ব্যবস্থা আছে। এই আইনের প্রধান একটি ধারা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি মাদক নিয়ে চলাফেরা করলে তা জামিন-অযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। প্রথম বার ড্রাগ চালানের দায়ে ধরা পড়লে ন্যূনতম শাস্তি হচ্ছে দশ বছরের কারাদণ্ড আর 1·5 লাখ টাকা জরিমানা। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে 20 বছরের কারাদণ্ড আর তিন লাখ টাকা জরিমানা হয়। এই আইন নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো বা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা গঠনের আদেশ দিয়েছে আর বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, যোধপুর আর বারাণসীতে এর শাখা খোলার নির্দেশ দিয়েছে। এই সংস্থাকে ইম্ফলেও একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র খুলতে বলা হয়েছে। সংস্থার প্রধান কেন্দ্র গঠন করতে বলা হয়েছিল দিল্লীতে। এই নতুন সংস্থার উদ্যোগে নতুন আইনকে হাতিয়ার করে ড্রাগ নিয়ন্ত্রণকারী নানা সংস্থা ড্রাগ চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। 1985 সালে এন ডি পি এস অ্যাক্টটি কার্যকর হওয়ার পর ভারতের পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রচুর মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই মাদক দ্রব্যের

গন্তব্য-স্থল ছিল পশ্চিমের নানা দেশ। সারা ভারতে 1985 সালে 761 কিলোগ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই পরিমাণ 1986 সালে বেড়ে 2,621 কেজি হয় আর 1988 সালে এই পরিমাণ 3,029 কেজিতে এসে দাঁড়ায়। 1992 সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাই পুলিশের মাদক বিভাগ 350 কেজিরও বেশি পরিমাণ হেরোইন বাজেয়াপ্ত করে। এটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ পরিমাণে বাজেয়াপ্ত মাদক।

কিন্তু তবুও এই আইনটি, কিছু প্রণালীগত ভুলভ্রান্তির জন্য আশামত ফল দিতে পারে নি। তাই 1988 সালের জুলাই মাসে সরকার একটি অর্ডিনান্সের মাধ্যমে আইন নির্বহনকারী কর্তৃপক্ষকে, কোন ব্যক্তিকে সন্দেহজনক কারণে দুবছর পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে আটক করে রাখার ক্ষমতা দিয়েছে। এটি আইনটিকে আরো শক্তিশালী করেছে। তবে দেশকে সম্পূর্ণভাবে ড্রাগ মুক্ত করতে হলে এখনো আরো অনেক কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে।

জানলে অবাক হবেন এককভাবেও আপনি ড্রাগ-আসক্তি রোধ করার জন্য অনেক কিছু করতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে সরকারী সংস্থার ওপরে খুব একটা নির্ভর করতে হবে না। কম বয়সী ছেলে ছোকরারা খুব সহজে বলতে পারে, "আরে একবার মাদক সেবন করলে কিচ্ছু হবে না। পরে ইচ্ছেমত ছেড়ে দেব।" কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হল যে ব্যাপারটা এমন সরলরেখায় চলে না। তরুণদের এই অভিজ্ঞতা একটা উপমা দিলে স্পষ্ট বোঝা যাবে। ধরুন আপনি পাহাড়ের উপর থেকে নীচের অতল খাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আপাতভাবে খাদের গভীরতা অনুভব করতে পারছেন না কিন্তু একবার ওই খাদে পড়ে গেলে আবার উঠে আসা প্রায় অসম্ভব। ড্রাগের নেশার ব্যাপারটা অনেকটা এরকম হয়। বেশির ভাগ উল্লিখিত ড্রাগের আসক্তি গড়ে তোলার ক্ষমতা অপরিসীম। একবার সেটা চাখতে গেলে তার নেশার গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসা মুশকিল। জীবনে এমন অনেক টানা পোড়েন আসে যখন মাদক সেবন করে মানুষ সাময়িকভাবে স্বস্তি পেতে চায়। কিন্তু সে স্বস্তি এক আপাত অনুভূতি মাত্র। দীর্ঘ দিন পরে বোঝা যায় এ নেশা কতটা সর্বনাশা। কেউ মানসিক চাপে পড়লে সেরা সমাধান হচ্ছে সমস্যার কথাটা কাউকে না কাউকে খুলে বলা। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, শিক্ষক, স্বামী অথবা স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি আলোচনা করলে চাপ অনেকটা কেটে যাবে আর ড্রাগের শরণাপন্ন হতে হবে না।

দেখা গেছে অনেকেই ড্রাগের হাত থেকে দূরে সরে থাকতে চায় কিন্তু তাদের বন্ধু-বান্ধবরা তাদেরকে এই মারণ খাদে 'ঠেলে' দেয়। অসহায় এই সব মানুষরা ভেড়ার পালে গিয়ে মেশে। একেই ইংরাজিতে বলে 'পিয়ার প্রেসার'।

সবাই বন্ধু-বান্ধবের একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চায়। কিন্তু ড্রাগ সেবনের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দৃঢ়ভাবে

"ধন্যবাদ, আমি ওটা নিতে পারব না" বলাটাই শ্রেয়। চুপচাপ সরে পড়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ। এই ধরনের বিরূপ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার উপায় হল, নিজেকে খেলাধুলো, গানবাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কাজকর্মে লিপ্ত রাখা। তাহলে একাকিত্ব, হতাশা ও মানসিক চাপ ভুলে থাকা যাবে। এই ভুলে থাকার ব্যাপারে বাবা-মা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। বহু তরুণ-তরুণী মনে করে যে তারা অবহেলার শিকার। এই মানসিক বঞ্চনা কাটাতে তারা মাদক দ্রব্য সেবন করতে শুরু করে। পরিবারের বন্ধন সুদৃঢ় হলে শিশুরা সবাইকে ভালবাসতে শেখে আর তারা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়। 

আরও তথ্য

অ্যাবেল, আর্নেস্ট এল (1980) ঃ মারিজুয়ানা—দ্য ফার্স্ট টুয়েল্‌ভ, থাউজেন্দ ইয়ারস্‌, প্লেনাম প্রেস, ন্যু ইয়র্ক, 289 পৃষ্ঠা।

মারিজুয়ানার ইতিহাস সংবলিত বেশ ভালো বই। যাঁরা মারিজুয়ানা সম্বন্ধে অনেক গভীরতা সহকারে জানতে ইচ্ছুক, তাঁরা বইটি দেখতে পারেন।

অগ্রবাল, অনিল (1992) ঃ 1000 ক্রাইম ক্যুইজ, রুপা এন্ড কোং, 180 পৃষ্ঠা।

প্রশ্ন-উত্তর ভিত্তিতে মাদক-দ্রব্য সম্পর্কে এক ছোট বিভাগ।

ব্রাউন, লেফটেন্যান্ট টি. টি. (1961) ঃ দি এনিগ্‌মা অভ ড্রাগ অ্যাডিকশন, চার্লস সি টমাস, ইউ. এস এ; 350 পৃষ্ঠা।

আফিমের উপর, বিশেষ করে আফিমের ধূমপান সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যের সংকলন।

কোলম্যান জেম্‌স্‌ সি (1972) ঃ অ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি এন্ড মডার্ন লাইফ, স্কট, ফোরেসম্যান এন্ড কোং, ইউ. এস. এ; 798 পৃষ্ঠা।

ফিশার এস রক্লিন A ঃ উলেনহার্থ ই. এইচ. (1987) ঃ কোকেন-ক্লিনিকাল এন্ড বায়োবিহেভিয়ারাল আসপেক্‌ট্‌ ও ইউ পি, অক্সফোর্ড, ইউ কে; 249 পৃষ্ঠা।

কোকেনের উপর সবিশেষ তথ্য। তবে শেষের অধ্যায়ে নানা ভ্রম-উৎপাদনকারী গাছ সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্য।

গ্লেসার, হিউগো (1888) ঃ দ্যা ড্রামা অভ মেডিসিন, বার্টারওয়ার্থ প্রেস, লন্ডন।

নারকোটিক ড্রাগের উপর চমকপ্রদ গল্প ব্যাখ্যা করা আছে।

গ্লোডফ্রাঙ্ক লিউস আর (1986) ঃ টক্সিকোলোজিক এমার্জেন্সিজ, অ্যাপেলটন সেনচুরি ক্রফ্‌ট্‌স্‌, ইউ এস এ; 929 পৃষ্ঠা।

ডাক্তারদের জন্য মাদক-চিকিৎসার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

গুডম্যান এল এস, গিলম্যান এ জি (1985) ঃ দ্য ফার্মাকোলজিকাল বেসিস অভ থেরাপিউটিকস্‌ (সেভেনথ্‌ এডিশন) ম্যাকমিলান পাবলিশিং কোং, নিউ ইয়র্ক; 1839 পৃষ্ঠা।

শুধু মাদকদ্রব্যই নয়, অন্যান্য ড্রাগ সম্বন্ধেও বিশদ তথ্যের ভাঁড়ার। ড্রাগের রাসায়নিক গঠন, ধর্ম ও মানবশরীরে ড্রাগের প্রভাব—বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আছে।

গ্রীন এইচ. আই. লেভি এম এইচ (1976) ঃ ড্রাগ মিস্যুউজ-হিউম্যান অ্যাবিউস, মার্সেল ডেকার ইঙ্ক, 270 ম্যাডিসন অ্যাভেনিউ, ন্যু ইয়র্ক, 566 পৃষ্ঠা।

একটু পুরনো ধাঁচের, কিন্তু প্রয়োজনীয়। মাদ্রকদ্রব্য ব্যাখ্যা করতে প্রশ্ন-উত্তর ধাঁচে লিখিত।

কর্নেটস্কি, কোনান (1976) ঃ ফার্মাকোলজি ঃ ড্রাগ্স্ আফেকটিং বিহেভিয়ার, জন উইলি এন্ড সন্স্, 275 পৃষ্ঠা।

মাদকদ্রব্যের উপর অতি মূল্যবান বই। যে কোন সাধারণ মানুষও উপভোগ করবেন।

ক্রান্জ জন সি (1974) ঃ হিস্টোরিক্যাল মেডিক্যাল ক্ল্যাসিক্স্ ইনভলভিং নিউ ড্রাগ্স্, উইলিয়ামস্ এন্ড উইলকিন্স্ কোং বাল্টিমোর , 129 পৃষ্ঠা।

এল এস ডি ও মরফিন আবিষ্কারের চমকপ্রদ ইতিহাস।

লিউইন, লুইস (1964) ঃ ফ্যানটাসটিকা নারকোটিক এন্ড স্টিমুলেটিং ড্রাগ্স্ ঃ দেয়ার ইউজ এন্ড অ্যাবিউজ, রুটলেজ এন্ড কেগান পল, লন্ডন; 335 পৃষ্ঠা।

নানা মাদকদ্রব্যের উপর পঠন যোগ্য বই। চমকপ্রদ পুরান কাহিনী দিয়ে ঠাসা।

পোডাজস্কা, জেঙ্কা (1990) ঃ দি অ্যামেজিং ওয়ার্ল্ড অভ প্ল্যান্টস্, হ্যামলিন, লন্ডন, 160 পৃষ্ঠা।

মাদক-উৎপাদনকারী গাছ—ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পলসন সি. জে. গ্রীন এম. এ. লী. এম. আর (1983) ঃ ক্লিনিকাল টক্সিকোলজি, পিটম্যান, লন্ডন, 670 পৃষ্ঠা।

থম্পসন, সি. জে. এস (1931) ঃ পয়জন এন্ড পয়জনার, হ্যারল্ড শেলর, লন্ডন, 391 পৃষ্ঠা।

পুরনো বই; অবশ্য পাঠ্য। মাদক-সম্পর্কে প্রচুর কাহিনী বর্ণিত।

থম্পসন মেরিটা এস (1991) ঃ গ্রোইং আপ ড্রাগ ফ্রি; স্কট, ফোরেসমেন্ট এন্ড কোং, ইউ. এস. এ, 80 পৃষ্ঠা।

বাচ্চাদের জন্য মনোরম বই। স্বচ্ছ ও সঠিক সূত্র সংবলিত। আরম্ভ করার জন্য চমৎকার।

ওয়ালেচিন্স্কি ডি. ওয়ালেস আই, ওয়ালেস এ (1980) ঃ দ্যা বুক অভ লিস্টস্, ব্যানটাম বুক্স্, ইউ. এস. এ, 519 পৃষ্ঠা।

এই বইটিতে মাদক সেবনকারী বিখ্যাত লোকদের বিবরণ আছে।

ওয়ালিস টি ই (1960) ঃ টেক্সট বুক অভ ফার্মাকোগনসি, জে এন্ড এ চার্চিল লি. লন্ডন, 640 পৃষ্ঠা।

পপি, ভারতীয় হেম্প ও কোকো গাছ চিনিবার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে।

উইনচেস্টার; হ্যাডেড (1983) ক্লিনিকাল ম্যানেজমেন্ট অভ পয়জনিং এন্ড ড্রাগ ওভারডোজ, ডবলিউ. বি সর্ন্ডাস এন্ড কোং, ইউ এস এ, 1012 পৃষ্ঠা।

বিষ-বিশারদ-এর জন্য মূল্যবান বই। মাদক সম্পর্কে নানা তথ্যে ভরপুর।

